রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

বৌদি

শ্রীমতী সুধারাণী দাস

করকমলেষু

অধ্যায়সূচী

ভূমিকা

১

গ্রন্থখানি মুখ্যত সজনীকান্তের কবিজীবনী। রবীন্দ্রনিষ্ঠ কবি হিসাবে সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে বৎসর কয়েক শত্রুভাবে উপাসনার পর কিভাবে পুনরায় রবীন্দ্রনিষ্ঠায় ফিরে গেলেন তারই আলোচনা এই গ্রন্থে। বলাই বাহুল্য, আমরা ইতিহাসের অনুসরণ করেছি, কাব্যবিচার এখানে গৌণ। সজনীকান্তের সারস্বত জীবনকে তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম যুগে তাঁর মন্ত্র ছিল অশিববিনাশ। দ্বিতীয় যুগে তাঁর স্বপ্ন ছিল নবসৃষ্টি। তৃতীয় যুগে তাঁর লক্ষ্য হয়েছিল ইতিহাসের অবলুপ্ত কক্ষে সত্যের অনুসন্ধান; কালজয়ী সাহিত্যসাধকগণের কীর্তিরক্ষা। [দ্রষ্টব্য : পৃ. ১৫১]

স্বভাবতই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, যদি সজনীকান্তের সারস্বত জীবনের ইতিহাস-রচনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর নামকরণ কেন হল 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত'। এই প্রশ্নের উত্তর গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাঠক অবশ্যই বুঝতে পারবেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই এই গ্রন্থের নেতৃপুরুষ। মূলত রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ বিকর্ষণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই সজনীকান্তের সারস্বত জীবন আন্দোলিত ও বিবর্তিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় এই প্রতিপাদ্যই আভাসিত এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই বক্তব্যই বিশ্লেষিত হয়েছে।

গুরুশিষ্যের এই ব্যক্তিসম্পর্কের প্রেক্ষাপটে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের একটি যুগের ইতিহাস। বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের আধুনিক নবীন সাহিত্য নিয়ে যে তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে সজনীকান্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সেদিনকার প্রখ্যাতনামা কবি ও কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ'-এ নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের স্বপ্ন ও সাধনার কাহিনী বিবৃত করেছেন। তাঁর কবিকল্পনা ও শিল্পিত ভাষার মণিকাঞ্চনযোগে গ্রন্থখানি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। তবু ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতেই হবে যে, ওতে একপক্ষের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। যে তরুণ সাহিত্যিকগণ প্রচলিত

রীতিনীতি এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে সাহিত্যে নবযুগারম্ভের বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তাঁদেরই বক্তব্য ভাষা পেয়েছে 'কল্লোল যুগ'-এ। কিন্তু সেদিন অন্যপক্ষের বক্তব্য কি ছিল তারও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। বস্তুত, শুধু 'অস্তি' নয়, শুধু 'নাস্তি'ও নয়— 'তদুভয়'কে নিয়েই জীবনের অগ্রগতি। তাই সেদিনকার সাহিত্যালোকে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির অনিবার্য পরিপূরক ছিল শনিবারের চিঠি। খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখলে এরা পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু অস্তি ও নাস্তিকে তদুভয়ে মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে এরা পরস্পর পরস্পরের শুধু পরিপূরকই নয়, পরস্পরের পক্ষে অত্যাবশ্যকও বটে। [দ্রষ্টব্য : পৃ. ৩৪]

তাছাড়া, নবযুগের এই সাহিত্য সম্পর্কে কবিগুরুর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিই বা কী ছিল তাও বিশেষভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থরচনায় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সবার উপরে বড়ো করে দেখা হয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পরম রহস্যময়তাকে। সজনীকান্ত একসময় রবীন্দ্রবিদূষণে শালীনতার সমস্ত সীমানা লঙ্ঘন করেছিলেন। সারস্বত জীবনের উত্তরপর্বে কবিগুরু মর্মান্তিক দুঃখ ও আঘাত পেয়েছিলেন সজনীকান্তের কাছেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরিসীম স্নেহে ও ক্ষমায় শেষ পর্যন্ত এই গুরুদ্রোহী শিষ্যের চিত্ত সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন। শেষপর্যায়ে উভয়ের অন্তরঙ্গতা অকৃত্রিম আন্তরিকতায় হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল। সজনীকান্তের শেষ চব্বিশ বৎসরের সাহিত্যজীবনের অন্যতম প্রধান দিক ছিল রবীন্দ্রানুশীলন।

এই গ্রন্থের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে প্রধানত সজনীকান্তের 'আত্মস্মৃতি' এবং প্রসঙ্গত প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্রজীবনী' এবং রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনাবলী থেকে। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পঁয়তাল্লিশখানি চিঠি হয় সম্পূর্ণ নয় আংশিক ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। সজনীকান্তকে লেখা চিঠির সংখ্যা তেত্রিশ। 'সত্যবাণী দেবীর দৌত্য' শীর্ষক নবম অধ্যায়ে ১১৮ থেকে ১২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ সজনীকান্তের 'আত্মস্মৃতি' থেকে উৎকলিত হয়েছে। 'চিঠিপত্র' নবম খণ্ডের যথাক্রমে ৯৩, ৯৫, ৯৮, ১০১ এবং ১৮৭ সংখ্যক চিঠিতে এই অংশগুলি পাওয়া যাবে।

এগারো

'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত'র প্রস্তাবনা-অধ্যায় সজনীকান্তের তিরোধানের পরে 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলি ধারাবাহিকভাবে শনিবারের চিঠিতেই প্রকাশিত হবার পর ১৩৭০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়। প্রায় দশ বৎসর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কিছু-কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি চোখে পড়ছে এবং দু-এক জায়গায় কিছু-কিছু সংশোধনেরও প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আপাতত দুটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হল। গ্রন্থের ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত দিলীপকুমারকে আশীর্বাদ করে রবীন্দ্রনাথ যে চতুর্দশপদী কবিতাটি লিখেছিলেন গ্রন্থে তার অর্থোদ্ধার যথার্থ হয় নি। কবিতাটি একান্তভাবে দিলীপকুমারকেই লেখা, অর্থব্যাপ্তির সাহায্যে তাকে সাধারণভাবে তরুণ-সমাজের প্রতি কবিগুরুর আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করলে ভুল হবে। কবিতার সপ্তম অষ্টম ও নবম পংক্তি 'ধ্যানমগ্ন গিরি-তপস্বীর / নিরন্তর করুণায় বিগলিত আশীর্বাদ নীর / তোমারে দিতেছে প্রাণধারা'—এই বাক্যটিতে শ্রীঅরবিন্দেরই ইঙ্গিত রয়েছে। কবিতার 'তরুণ নির্ঝর' হলেন দিলীপকুমার, 'ধ্যানমগ্ন গিরি-তপস্বী' শ্রীঅরবিন্দ, আর 'প্রাচীন সরোবর' কবিগুরু নিজে।

৫৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সে-যুগের তরুণ লেখকদের নৈতিক চিত্তবিকারের কথায় চারুশীলন ও শুচিশীলনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। শুচিশীলন সম্পর্কে রাজশেখরের বক্তব্য উদ্ধার করে বলা হয়েছে 'কবি-চর্যার এই আদর্শকে সে-যুগের তরুণ সাহিত্যিকগণ প্রমত্ত তাণ্ডবে পদদলিত করেছেন'। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা উচিত যে, শুচিতা মানুষের আচার-আচরণের মধ্যে খুঁজলে অনেক সময়ই ভুল হবার সম্ভাবনা, শুচিতার সন্ধান করতে হবে তার অন্তরপ্রকৃতিতে। তাছাড়া লেখকের ব্যক্তিজীবন আর সারস্বতজীবন অনেক ক্ষেত্রেই এক নয়। যিনি জীবনশিল্পী তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সারস্বতজীবন একই সূত্রে গ্রথিত। শিল্পক্ষেত্রে এই শুভযোগ সুলভ নয়। যেখানে গরমিল রয়েছে সেখানে শুচিশীলনের সন্ধান করতে হবে শিল্পীর সারস্বত জীবনের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। সে-যুগের তরুণ সাহিত্যিকগণের জীবনচর্যায় যে বেপরোয়া বোহেমিয়ান ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তা শুধু কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। সে-যুগের তরুণ সজনীকান্তের জীবনেও একই বেপরোয়া বোহেমিয়ান ভাব দেখা

দিয়েছিল। জীবনযাত্রায় সজনীকান্ত আধুনিকতার বিষামৃত সমভাবেই আকণ্ঠ পান করেছিলেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হয়েছে সজনীকান্তের সারস্বত জীবনের দুই গুরু: রবীন্দ্রনাথ আর মোহিতলাল। এই দুই গুরুর মধ্যে সাহিত্যের আদর্শগত যে দ্বন্দ্ব তা-ই ছিল তরুণ সজনীকান্তের মানসলোকের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে সজনীকান্ত শেষপর্যন্ত তাঁর অন্তরতর গুরুকে কি-ভাবে বরণ করে নিয়েছিলেন সেই অন্তরঙ্গ আত্মিক ইতিহাসই রচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

মোহিতলাল সজনীকান্তের মানসলোকের এই পরিবর্তন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। জীবনের শেষপর্বে তাঁর মর্মবেদনা নানাভাবে উদ্‌বারিত হয়েছে। 'বিশ্বাসঘাতক' শিষ্যকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন। শেষদিকে উভয়ের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মোহিতলাল-সজনীকান্তের এই মিলন-বিচ্ছেদের কাহিনীও কম চমকপ্রদ নয়। কিন্তু তার রহস্যোদ্ঘাটন স্বতন্ত্র অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে।

৩

গ্রন্থের প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথকৃত যে রেখাচিত্রটি মুদ্রিত হয়েছে তার ইতিহাস এখানে পুনরায় বলা প্রয়োজন। এই রেখাচিত্রটি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কৌতুকচিত্রটি অঙ্কিত হয় ২১।১১।১৯৩৯ তারিখে। নিচে লেখা আছে 'সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি'। শনিবারের চিঠিতে প্রকাশের সময় 'অবচেতনার অবদান' নামে একটি ছড়া মুদ্রিত হয়। তার প্রথম চরণ হল 'গলদা চিংড়ি তিংড়িমিংড়ি, / লম্বা দাঁড়ার করতাল।' উক্ত ছড়াটি কবিগুরুর 'ছড়া' গ্রন্থের শিরোনামহীন সপ্তম কবিতা। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশের সময় তার নাম ছিল 'অবচেতনার অবদান'। কবিতাটির মুখবন্ধ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।'

যে-কৌতুকচিত্রটি রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে এঁকে দিয়েছিলেন তার উপর একটি কবিতাও লিখে দেবেন বলেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুত কবিতাটির

তেরো

প্রথম পংক্তি হচ্ছে 'সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে'। এই কবিতাটি কালিম্পঙে ১৯৪০-এর ১৫ মে তারিখে রচিত। এটিই, ঈষৎ বর্ধিত আকারে, 'ছড়া' গ্রন্থের প্রথম কবিতা। কবিতাটি কবিগুরুর তিরোধানের পরে, ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসের শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ প্রচ্ছদে এই ছড়াটি কবিগুরুর হস্তাক্ষরেই মুদ্রিত হল। এই কৌতুকচিত্র ও ছড়ার বিস্তৃত আলোচনা কৌতূহলী পাঠক এই গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ের নবম অনুচ্ছেদে, ১৯৮-২০২ পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন।

গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হয়েছে শ্রীমতী সুধারাণী দাসকে। সজনীকান্তের সহধর্মিণী, ধরিত্রীর মতোই সর্বংসহা, শ্রীমতী সুধারাণী রবীন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের সম্পর্কের এক সংকটলগ্নে নববর্ষের প্রণামী-পত্রে কবিগুরুর সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে কোমল করে এনে তাঁর দাক্ষিণ্যলাভের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি ১২৬-১৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর প্রায় দশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। গ্রন্থপ্রকাশে এই বিলম্ব গ্রন্থকারের পক্ষে যতই দুঃখের কারণ হোক্ না কেন, একদিক দিয়ে তাতে ভালোই হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা সময় যত এগিয়ে যায় ঐতিহাসিক দৃষ্টি ততই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

গ্রন্থখানি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেছেন রঞ্জন প্রকাশালয়ের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান রঞ্জনকুমার দাস। পিতার প্রতি পিতৃব্যের সারস্বত কৃত্যকে তিনি পরম শ্রদ্ধায় সহৃদয় সামাজিকের কাছে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

জগদীশ ভট্টাচার্য

শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাল্য ও কৈশোরের
বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছেন।
পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমার সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা
"অভিলাষ" তাঁহার অভিনব আবিষ্কার। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে
আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার প্রথম চারটি
নাটকের অধিকাংশ কবিতা এবং গান যে আমারই রচনা তাও সজনীকান্তের
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। হিন্দুমেলায় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে আমার পঠিত
কবিতাটি স্বপ্নময়ী'তে আত্মগোপন করেছিল সেটাও সজনীকান্তের
চোখে ধরা পড়েছে। সজনীকান্ত প্রদত্ত নিম্নলিখিত তালিকাটির
রচনাগুলি নিঃসংশয়রূপে আমার। কিন্তু পরবর্তী তালিকার রচনাগুলি
সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হতে পারি নি। আমি যে দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য
ও অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর ইত্যাদি ছদ্মনামে এককালে অনেক লেখাই
লিখেছি তা ভেবেও বেশ কৌতুক বোধ করছি। এখানে বলা আবশ্যক
শেষোক্ত নামটি কোনো লেখক অন্য কোনো কোনো রচনায়
আত্মসাৎ করেছেন বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

২৭।১১।৩৯

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

সজনীকান্তের সারস্বত সাধনার দুই গুরু :—দেবগুরু বৃহস্পতি আর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। বৃহস্পতিগুরু হলেন রবীন্দ্রনাথ আর শুক্রগুরু মোহিতলাল। এই দুই গুরুর মধ্যে সাহিত্যের আদর্শগত যে দ্বন্দ্ব তাই ছিল তরুণ সজনীকান্তের মানসলোকের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সারস্বত সাধনার প্রথম যুগে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সজনীকান্তের কবিমানসকে কখনো করেছে বিভ্রান্ত, কখনো পথভ্রষ্ট। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে আপন স্বরূপে কবি-সজনীকান্তের আত্মপ্রকাশ শুধু তাঁর ব্যক্তিজীবনেরই ইতিহাস নয়, তা বাংলা সাহিত্যের একটি যুগের ইতিহাসও বটে। তাই সে ইতিহাসকে অনুসরণ করা বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের অপরিহার্য কৃত্য বলেই মনে করি।

মোহিতলালকে একদিন সজনীকান্ত যে গুরুপদে বরণ করেছিলেন তার অভ্রান্ত প্রমাণ রয়েছে তাঁর 'মানস-সরোবরে'র উৎসর্গ-লিপিতে। 'মানস-সরোবর' শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-কাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯। উৎসর্গ-লিপির নীচে রবীন্দ্রনাথের "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র নিম্নলিখিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতিচিহ্নে বিধৃত হয়েছে—

"যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি—
'কে যাবে সাথে ?'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।"

গুরুর প্রতি শিষ্যের আনুগত্য এবং গুরুনির্দেশেই শিষ্যের নিরুদ্দেশের পথে যাত্রার কথা এর চেয়ে সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সজনীকান্ত মোহিতলালের প্রতি তাঁর গুরুভক্তির যোগ্য ভাষা খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথেরই কবিতার মধ্যে। সজনীকান্তের জীবনে কে অন্তরতর ছিলেন তার সংকেত এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

দুই

মোহিতলালের সঙ্গে সজনীকান্তের যখন পরিচয় হল তখন তাঁর বয়স তেইশ বৎসর। সজনীকান্ত তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের এম. এস-সি. ক্লাসের ছাত্র। যদিও সদ্য-বিবাহিত, তবু মেসেরই বাসিন্দা। একাসনী ঘরে পড়ার সুবিধা হবে বলে মেস বদল করে তিনি এলেন ২৭ বাদুড়বাগান লেনের একটি 'সাতমিশালি' মেসে। তেতলার একটি একাসনী প্রকোষ্ঠে আশ্রয় নিলেন ১৯২৩-এর ডিসেম্বর মাসে। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত এই মেসটিকে বলেছেন 'জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে একটি আদর্শ স্থান।' তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতার ভাষাতে মেসটি সাহিত্যের প্রথম শিক্ষার্থীর "হেয়ার হিন্দুস্কুল" বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই মেসেই তাঁর পাশের আরেকটি একাসনী প্রকোষ্ঠে থাকতেন কবি-শিক্ষক মোহিতলাল মজুমদার। সেখানে নিয়মিতভাবে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি জীবনময় রায় আর 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম ত্রিমূর্তির অন্যতম যোগানন্দ দাস। সজনীকান্ত যে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও কবিতা লেখেন সে সংবাদ জীবনময় এবং যোগানন্দের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ধীরে ধীরে মোহিতলালেরও তা কর্ণগোচর হল। তিনি বললেন, "শুনলাম রবীন্দ্রনাথকে নাকি আপনি গুলে খেয়েছেন, এদিকে পড়েন তো এম. এস্-সি.। সামলান কি করে?"

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখছেন, সত্যসত্যই আর তাঁর পক্ষে দুদিক সামলানো সম্ভব হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বকেয়া মাইনে এবং পরীক্ষার ফীর জন্যে মোটা অঙ্কের টাকা চেয়ে পাঠালেন পিতৃদেবের কাছে। তাঁদের সংসারে তখন 'ভায়ার্কি' চলছে। পিতৃদেব পুত্রের আবেদন পাঠালেন জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে। সেখানেও দাক্ষিণ্যের অভাব হল। অর্থাৎ টাকা পাওয়া গেল না। পরীক্ষা না-দেওয়া সম্পর্কে সজনীকান্তের মন প্রস্তুত হয়েই ছিল। অভিভাবকগণের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে পিতৃদেবকে লিখলেন, টাকার

অভাবে এম. এস-সি. পরীক্ষা তাঁর দেওয়া হল না এবং এর পর থেকে তাঁর মাসিক খরচ পাঠাবার দায় থেকে তিনি অভিভাবকগণকে অব্যাহতি দিলেন।

জীবনের এই সংকটলগ্নে বিজ্ঞান-ভারতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সজনীকান্ত প্রবেশ করলেন কাব্যসরস্বতীর কমল-বনে। এই অবস্থাকে তিনি বিমানচালনার পরিভাষায় বলেছেন, তাঁর জীবনের 'নিরুপায় অবতরণ' বা Forced Landing। সজনীকান্ত বলছেন, "এই অসহায় অবস্থায় মনের মধ্যে কি বিপর্যয় ঘটিল জানি না, কলমের ডগায় ব্যঙ্গকবিতার বান ডাকিল। [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ১৩৬]। কামস্কাটকীয় ছন্দ রচনার ছলে কাজি নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী"কে ব্যঙ্গ করে তিনি লিখলেন 'ব্যাঙ' কবিতা। এবং প্রতিদিনই এই-জাতীয় কবিতা একটি করে লেখা হতে লাগল। এইভাবেই প্যারডি-পারংগম কবি সজনীকান্তের জন্ম হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোহিতলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে মোহিতলালের প্রথম কবিশিষ্য নজরুল। দ্বিতীয় সজনীকান্ত। সজনীকান্তের খাতাখানি যতই ব্যঙ্গকবিতায় বোঝাই হতে লাগল, মোহিতলালও ততই খাতা-বগলে এই নবাবিষ্কৃত কবিশিষ্যকে নিয়ে পরিচিত মহলে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সজনীকান্তের জীবনে তৎকালীন পরিবেশের প্রভাব বিচার করলে। সজনীকান্ত যখন ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় হাত পাকাচ্ছিলেন, তখন, ১৩৩১ সালের ১১ই শ্রাবণ [২৭ জুলাই ১৯২৪] 'শনিবারের চিঠি' সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হল। প্রথম সংখ্যাতেই কাজি নজরুল ইসলামকে ব্যঙ্গ করে "গাজী আব্বাস বিটকেল" নামে দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। অষ্টম সংখ্যায় সজনীকান্ত 'আবাহন' নামে একটি কবিতা লিখলেন। সাময়িক পত্রিকায় এটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। নজরুল-ব্যঙ্গই তার লক্ষ্য :—

ওরে ভাই গাজিরে
কোথা তুই আজি রে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা।

ইত্যাদি। 'চিঠি'র একাদশ সংখ্যায় "কামস্কাটকীয় ছন্দে"র শেষ "অসম ছন্দ" ডেকে আনল প্রচণ্ড বিপর্যয়। "বিদ্রোহী"র প্যারডি "ব্যাঙ" প্রকাশিত হল। আবেদন পৌঁছল যথাস্থানে। হাবিলদার কবি নজরুল ইসলাম সম্মুখে কাউকে না পেয়ে ভাবলেন এর পেছনে রয়েছেন মোহিতলাল। গুরুকে লক্ষ্য করে শিষ্য প্রচণ্ড বিক্রমে গদা নিক্ষেপ করলেন। 'কল্লোলে'র দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ

অর্থাৎ আশ্বিন সংখ্যায় নজরুলের "সর্বনাশের ঘণ্টা" প্রকাশিত হল। গুরু-সম্বোধনে মোহিতলালকে রণে আহ্বান করে তিনি শাসালেন, "ভূধরপ্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার।" নজরুলের এই মাত্রাতিরেকী অবিবেচনায় মোহিতলাল হলেন ক্ষিপ্ত। 'দ্রোণ-গুরু' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করলেন। 'শনিবারের চিঠি'র ক্রোড়পত্রে দ্বাদশ অর্থাৎ "বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যায়" তা প্রকাশিত হল। কবিতায় মোহিতলাল হলেন দ্রোণগুরু, সজনীকান্ত অর্জুন আর নজরুল কর্ণ। কর্ণকে অভিশাপ দিয়ে দ্রোণ লিখলেন—

আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
অধঃপাতের দেরি নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর।
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,···

ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতঃপর দু-পক্ষের রণদামামা বেজে উঠল। 'শনিবারের চিঠি'তে মোহিতলালও "চামার খায় আম" বেনামীতে সরাসরি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন। সব্যসাচী সজনীকান্ত 'চিঠি'র পৃষ্ঠায় রঙ্গ-ব্যঙ্গের ফুলঝুরি ছড়াতে লাগলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠে গড়ে-ওঠা তাঁর শৈশব-কৈশোরের সাহিত্য-সংস্কার হল ধূলিলুণ্ঠিত। প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী অস্ত্রে ধরাশায়ী করার প্রচণ্ড উত্তেজনায় তিনি 'দুষ্টা সরস্বতী'র সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথমে নজরুল, পরে কল্লোলগোষ্ঠী হলেন তাঁর আক্রমণের পাত্র, মোহিতলাল হলেন অনুক্ষণ উৎসাহদাতা গুরু, 'শনিবারের চিঠি' হল তাঁর বাহন, ব্যঙ্গরচনাই হল মুখ্য সারস্বতকৃত্য। বৃহস্পতিশিষ্য হলেন প্রতিহিংসাপরায়ণ শুক্রাচার্যের শাণিত হাতিয়ার।

তিন

সংগ্রামে দক্ষ, ব্যঙ্গসুনিপুণ নির্মম সমালোচক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সজনীকান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। দা'ঠাকুরের ভাষায় তিনি হলেন 'নিপাতনে সিদ্ধ'। বড় বড় মহারথীদের নিপাতিত করতে তাঁর সমকালে সজনীকান্ত হলেন অদ্বিতীয়। কিন্তু কী মূল্য দিয়ে তিনি এই কীর্তি বা অপকীর্তির অধিকারী হলেন তা বিশেষ ভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। সারস্বত সত্রে মৌলিক সৃষ্টিকর্মই সর্বোত্তম। সমালোচকের কাজ যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, তা দ্বিতীয় শ্রেণীর। অথচ সজনীকান্ত প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভা নিয়েই

জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সমকালীন পাঠকের রসনারোচন চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টির দ্বারা তিনি যতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে থাকুন না কেন, তাঁর সে প্রতিষ্ঠা ক্ষণকালের। কালান্তরের রুচি ও দৃষ্টি-বদলের দিনে সে প্রতিষ্ঠা অস্পষ্ট হয়ে আসবেই। কিন্তু শুধু যুগের নয়, যুগোত্তর কাব্য-রসিকের চিত্তকে বিস্ময়মুগ্ধ করবার মত শক্তিও তাঁর ছিল। যৌবনারম্ভে বিপথে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁর শক্তির অনেকখানিই অপচিত হয়েছে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, অনেক সংগ্রাম এবং অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ভোগ করে, বিলম্বিত হলেও, অবশেষে একদিন সজনীকান্তের কবি-স্বভাবেরই জয় হল। 'অঙ্গুষ্ঠ' 'মনোদর্পণে'র প্যারডি-পারংগম ব্যঙ্গরসিক হলেন 'রাজহংস', 'মানস-সরোবর', 'পঁচিশে বৈশাখ' ও 'পান্থপাদপে'র কবি। বাল্যকালে কুলুকুলু মহানন্দার কূলে এক বৃষ্টি-থমথম বাদল-সন্ধ্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান' কবিতা পড়ে বালক সজনীকান্তের মনে যে আদি শিহরন সঞ্চারিত হয়েছিল জীবনের ত্রিশ বৎসর পেরিয়ে তারই আনন্দ-স্পন্দন তিনি ফিরে পেলেন তাঁর কবিসত্তায়। ছেলেবেলা গুরুমন্ত্রের মত যে নাম তাঁর জপমন্ত্র ছিল সেই নামেরই জয় হল তাঁর জীবনে।

সজনীকান্তের সেই আত্মোপলব্ধির ইতিহাস ক্রমশ-প্রকাশ্য। আমরা তাঁর প্রথম সিদ্ধির কথাই প্রথমে বলব। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্তের অপকীর্তির সবচেয়ে অমার্জনীয় দৃষ্টান্ত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী [১৯৩১] উপলক্ষে তাঁর দুর্বিনীত রবীন্দ্র-বিদূষণ। গুরুহত্যার অপরাধের মত সজনীকান্তের জীবনের এই কলঙ্ক অনপনেয়। শনিবারের চিঠির সেই কুখ্যাত 'জয়ন্তী-সংখ্যা' [মাঘ ১৩৩৮] সম্পর্কে সজনীকান্ত নিজেও তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে বলেছেন "আমাদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল" [দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ° ১৬৪]।

কিন্তু এই 'ব্যাজস্তুতি'র ছদ্মবেশেই নেমে এল সজনীকান্তের জীবনে তাঁর গুরুর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। 'জয়ন্তী-সংখ্যা'র সর্বশেষে একটি কবিতা মুদ্রিত হল। নাম "রবীন্দ্রনাথ", রচয়িতা সজনীকান্ত স্বয়ং। এই কবিতাই কবিশিষ্যের প্রথম সার্থক গুরুবন্দনা। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের স্কন্ধ থেকে তখন দুষ্টা সরস্বতী বিদায় নিয়েছেন, দেখা দিয়েছে মহানন্দার কূলবর্তী সেই বিস্ময়মুগ্ধ বালকের আদি শিহরনের আনন্দ-স্পন্দ। সজনীকান্ত লিখলেন :

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য-সমাকুল,
যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়,
ব্যাঘ্র হস্তী বরাহ বন্য, ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত,
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায়, তুষারে অসাড় শির।
ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে—
মহিমা বিরাট, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালবাসিবারে যত যাই, তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

সজনীকান্ত লিখছেন, "এই বিচিত্র ছন্দের নির্মল ধারায় স্নান করিয়া যেন আমি পূত-পবিত্র নবজন্মান্তর লাভ করিলাম ; সকল ক্ষোভ, সকল অভিমান, সকল বিদ্বেষ ভাসিয়া গেল" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ১৬৬]। হিমালয়োপম "রবীন্দ্রনাথে"র শেষ স্তবকটিতে সজনীকান্তের মানসলোক নিঃশেষে নির্বারিত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ

হিমালয়--
তুমি হিমে ঢাকা থাকো, নদীরে ক'রো না হিম।
আমার কুটির-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সব্‌জি-ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাকো, নাহি থাকো—
হিসাব তাহার আমি তো রাখিব নাকো ;
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও-নদীজলে—
কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিকথা তার যে পারে রাখুক লিখে।
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

আমরা বলেছি, এই কবিতাই রবীন্দ্রশিষ্য সজনীকান্তের প্রথম সার্থক গুরুবন্দনা। কবি-সজনীকান্তের জীবনে চরম কলঙ্কিত মুহূর্তই পরম শুভমুহূর্ত

হয়ে দেখা দিল। 'আত্মস্মৃতি'তে তিনি লিখছেন, "শুভমুহূর্ত মানুষের জীবনে কখন কোন্‌দিক দিয়া আসে কেহ বলিতে পারে না। বঙ্গভারতীর বরপুত্রকে নির্মম আঘাত হানিবার জন্য যে ক্ষুরধার অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলাম, স্বয়ং বীণাপাণি সকৌতুকে তাহাতেই তন্ত্রী যোজনা করিয়া বিদ্রোহীকেই সুরের ঝঙ্কার তুলিবার আদেশ ও অবকাশ দিলেন, আমার কাব্য-জীবনের ইহাই বিচিত্রতম ইতিহাস" [দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ° ১৬৭]।

এই গুরুবন্দনা করেই 'রাজহংস' 'মানস-সরোবরে'র কবির জয়যাত্রা শুরু হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্‌কথন

সজনীকান্তের জন্ম বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে। পৃথিবীর পটভূমিতে তখন হিংসার উৎসবে অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের ভয়ংকরী উন্মাদ রাগিণী বেজে উঠেছে। বাংলার মাটিতে বসে কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজীবনের সেই সর্বনাশা রূপটিকে কল্পনা করে পরম ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন :

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ;—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি', প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি ;
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

সারা পৃথিবী-জোড়া এই হিংসার উৎসব ভারতের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শাসনের কলুষস্পর্শে বীভৎসতর হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা পঙ্কশয্যা হতে জেগে উঠে ভারতের জীবনকে করেছে বিষজর্জর। কিন্তু তার আঘাত সংঘাত মুখ্যত মহানগরীর বুকেই প্রত্যাহত পরিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। পল্লীগ্রাম এবং মফস্বল শহরে তখন শেষরাত্রির তন্দ্রাচ্ছন্নতা। উনবিংশ শতাব্দীর এই রাত্রিশেষের তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেই সজনীকান্ত চোখ মেললেন বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে মাতুলালয়ে। জন্ম ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৫এ আগস্ট। সজনীকান্তের পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল বর্ধমানের বহরান গ্রামে। তাঁরা উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। পূর্বপুরুষদের মধ্যে দুই-একজন পদকর্তা ও কবিও ছিলেন। সজনীকান্তের কোনো-এক পূর্বপুরুষ বিবাহসূত্রে বর্ধমান ছেড়ে আসেন বীরভূমের রাইপুর গ্রামে। পিতা হরেন্দ্রলাল ছিলেন কানুনগো। পরে পাবনায় সাব-ডেপুটি কালেক্টর হন। অবসরগ্রহণকালে হয়েছিলেন দিনাজপুরে পার্টিশন-ডেপুটি কালেক্টর। সজনীকান্তের পিতৃকুল ঘোর শাক্ত, মাতৃকুল ঘোরতর বৈষ্ণব। প্রত্যহ ভোরবেলা মাতৃকণ্ঠোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামে সজনীকান্তের ঘুম ভাঙত। নয় ভাই-বোনের মধ্যে সজনীকান্ত ছিলেন পঞ্চম। তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ অমরেন্দ্রনাথ যৌবনে স্বদেশী আমলে কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। পিতা সরকারি চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হলেন স্বদেশী যুগের কবি। শৈশবে ও কৈশোরে অগ্রজের দৃষ্টান্ত সজনীকান্তকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত করেছিল।

সজনীকান্তের হাতেখড়ি হয়েছিল স্বগ্রাম রাইপুরে লর্ড সিংহের পিতা সিতিকণ্ঠ সিংহের নামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে। চার-পাঁচ বৎসর বয়সে যখন জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হল তখন সজনীকান্তের পিতা উত্তরবঙ্গে মালদহের বাসিন্দা। মালদহের দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হল। নিম্ন-প্রাইমারি পরীক্ষায় তিনি জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এই দীনু পণ্ডিতকে সজনীকান্ত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুপ্রণাম জানিয়েছেন। শৈশবে তিনি আর একজন আদর্শ শিক্ষাগুরুর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তিনি হলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার। তরুণ বিনয়কুমার ছিলেন সজনীকান্তের গৃহশিক্ষক। আঠারো বৎসর বয়সে দিনাজপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সজনীকান্ত বৃত্তিলাভ করলেন। প্রবেশিকার দেউড়ি পেরিয়ে কলিকাতায় এসে

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরে থাকতেই সর্বাঙ্গে রাজনৈতিক নামাবলীর ছাপ পড়েছিল। সুতরাং সকল বিপ্লব-বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ হল। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বাঁকুড়ার শান্ত পরিবেশে ওয়েসলিয়ান মিশনারি কলেজে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল, এবং কলেজ সংলগ্ন হস্টেলে খাস বিলাতি সাহেবদের তত্ত্বাবধানে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা হল। এই বাধ্যতামূলক পরিবর্তনের ফলে সজনীকান্তের কবিমন হল বিক্ষুব্ধ; পড়াশোনার পাঠ শিকেয় উঠল, সহপাঠী ও সহবাসী বন্ধুদের মোড়লির কাজ গ্রহণ করলেন তিনি। বুনিয়াদ ছিল পাকা, তাই আই. এস-সি. পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগে উচ্চ স্থান অধিকার করেই উত্তীর্ণ হলেন। বাঁকুড়ায় দু-বৎসর নির্বাসনের পর তখন কলিকাতার বাধা অপসারিত হয়েছে। সজনীকান্ত ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এস-সিতে রসায়নে অনার্স নিয়ে। স্থান হল প্রধানত খ্রীশ্চিয়ান-ছাত্র অধ্যুষিত মুসলমান-বাবুর্চি-বয়-সেবিত ডাফ হস্টেলে। সেখানে আহার্য ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব করে তিনি স্থানান্তরিত হলেন অগিল্‌ভি হস্টেলে। সজনীকান্ত বলছেন, "আমার সাহিত্যজীবন গঠনে বাঁকুড়া কলেজ-হস্টেল ও অগিল্‌ভি হস্টেলের স্থান বিস্তৃততরভাবে স্মরণীয়" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ৮]।

বি. এস-সি. পাস করে সজনীকান্ত মেডিক্যাল কলেজে পড়ার জন্যে প্রার্থী হয়েছিলেন। মনোনীতও হয়েছিলেন, কিন্তু এক মামাতো ভাইকে স্থান করে দেবার জন্যে নিজের নাম প্রত্যাহার করে গেলেন কাশী হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। সেখানকার অধ্যক্ষ কিং সাহেবের বাঙালী-প্রীতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সমর্থন পায় নি। এই কলহের যূপকাষ্ঠে প্রথম বলি হলেন সজনীকান্ত। ছাত্রাবাসে মাছ মাংস ও ডিম রান্না ও খাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙালী ছেলেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বলাই বাহুল্য, স্বভাবনেতা সজনীকান্তই গ্রহণ করলেন তাদের নেতৃত্ব; এবং সেই অপরাধে মালব্যজীর আদেশে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হলেন বিতাড়িত। দু মাসের কাশীবাস সমাপ্ত করে তিনি ফিরে এলেন কলিকাতায়। ভর্তি হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগে। পদার্থবিদ্যায় [তাপ] এম. এস-সি. পড়া শুরু হল।

বিজ্ঞানের ছাত্র বটে, কিন্তু কলা ও বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলালক্ষ্মীই হলেন বিজয়িনী। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত বলছেন, "রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চা এবং রবীন্দ্র-সংগীত উপভোগের সঙ্গে পাল্লা করিয়া কয়েকটি কঠিন রোগীর

সেবাই মুখ্য কাজ হইয়া দাঁড়াইল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে এই সময় ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এখানে সেখানে সংকট-ত্রাণের কাজে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া পড়ি" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ৯]। এই সময় কয়েকজন ব্রাহ্ম যুবকবন্ধুর সাহচর্যে সজনীকান্ত ব্রাহ্মসমাজের সান্নিধ্যে এলেন। বাঁকুড়ায় এবং কলিকাতার ডাফ ও অগিল্‌ভি হস্টেলে খ্রীশ্চিয়ান জীবনচর্যায় অভ্যস্ত তরুণ সজনীকান্তের জীবনে নৈষ্ঠিক হিন্দুসংস্কার শিথিল হয়ে এসেছিল। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে গোঁড়ামির কোনো সূত্রই আর অবশিষ্ট রইল না। সামাজিক ও ধর্মনৈতিক আচার-আচরণে সজনীকান্ত হলেন সংস্কারমুক্ত তরুণ বিদ্রোহী।

দুই

বয়স নয় কি দশ বৎসরে বালক সজনীকান্তের জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তখন সজনীকান্ত মালদহ জিলা স্কুলের ছাত্র। গ্রীষ্মাবকাশ কি ভাবে কাটবে তাই ছিল সমস্যা। ছাত্রজীবনে এই গ্রীষ্মাবকাশ মধুরতম কাল। এই সময়টা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছাত্রদের অতিবাহিত হয় অ-পাঠ্য বই পড়ার আনন্দে। তখন সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ছিল কৃপণের দানসত্রের মত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-গৃহে পাঠ্যেতর বইয়ের আমদানি হত কচিৎ-কদাচিৎ। শিশুসাহিত্যের বলতে গেলে একমাত্র পরিবেশক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। সজনীকান্ত এবং তাঁর আড়াই বছরের বড় অগ্রজ সৌরীন্দ্রনাথ এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় পুস্তক সংগ্রহের অভিযানে বেরোতেন। সজনীকান্ত লিখছেন, "যোগীন্দ্রনাথ সরকারেরই সংকলিত একখানি বই সংগৃহীত হইল। গোড়া হইতে বিমুগ্ধ মন লইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সেই বাস্তব জীবনের পটভূমি হইতে এক অজ্ঞাত রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হইলাম। সামান্য একটি কবিতা, ধরণ-ধারণ যে খুব অচেনা তা নয়—কিন্তু মনে কোথা হইতে একটা নূতন রঙ ধরিল, একটা অপরূপ সুরের মূর্ছনা লাগিল। সেই দিন সেই গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে উঠানের ডালিম-গাছতলায় বসিয়া পড়িতে লাগিলাম—

দিনের আলো নিবে এল, সূয্যি ডোবে ডোবে,
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।

মেঘের উপর মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঢঙ ঢঙ।
ওপারেতে বৃষ্টি এল ঝাপসা গাছপালা।
এপারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥”

“এক সঙ্গে দেহ ও মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল, মনের মধ্যে একটা সুগভীর ব্যাকুলতা অনুভব করিলাম। তেমনটি আর কখনও করি নাই। প্রখর রৌদ্রালোকে নিখিল ভুবন পুড়িয়া যাইতেছে, একটা অলস রুক্ষ ঔদাসীন্যে চারিদিক থম্‌থম্‌ করিতেছে। বিরলপথিক পথের দিকে নিবিষ্ট ভাবে চাহিলে মরীচিকাও যেন দেখা যায়। শুধু গৃহপারাবতের উদাস কূজন আর দূরে ক্লান্ত ঘুঘুর একটানা ডাক প্রকৃতির সজীবতার করুণ সাক্ষ্য দিতেছে। কবিতা পড়িতে পড়িতে অবোধ বালকের মনে প্রচণ্ড মধ্যাহ্নেই নিদাঘ-দিবাবসানের রমণীয়তা নামিয়া আসিল, মেদুর মেঘে যেন সারা আকাশটা ছাইয়া গেল, বুঝি এখনি বৃষ্টি নামিবে। পড়া আর অগ্রসর হইল না, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।” [আত্মস্মৃতি-১, পৃ' ১৩-১৪]।

হঠাৎ দাদা এসে ছোঁ মেরে বইখানি কেড়ে নিয়ে গেলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে দাদার হেপাজত থেকে বইখানি পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে গেল। কোলাহল শান্ত হলে খেলতে যাবার ছল করে বালক সজনীকান্ত উপস্থিত হলেন মহানন্দার তীরবর্তী একটি কাঠের গোলার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ির উপর। অসমাপ্ত কবিতাপাঠ সমাপ্ত হল। সজনীকান্ত লিখছেন, “এ যেন একান্ত আমারই কথা। এমন করিয়া আমার মনের কথা এতদিন পর্যন্ত তো আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। তলায় নাম দেখিলাম —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুরুমন্ত্রের মত সেই নাম জপমন্ত্র হইল। কবিতাটিও মুখস্থ হইয়া গেল” [তদেব, পৃ' ১৬]।

সজনীকান্ত বলেছেন, তাঁর জীবনের বাণীসাধনার এখানেই সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের “বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর” সজনীকান্তকে সারস্বত-মন্ত্রে দীক্ষিত করল। এই কবিতা-পাঠের আনন্দই তাঁর জীবনের প্রথম ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর রসাস্বাদ। তিনি বলেছেন, “এই আদি শিহরণই আমার জীবনকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে।”

তিন

ছেলেবেলা সজনীকান্ত বড়দার কাছে উপহার পেয়েছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত একখণ্ড 'সরল কৃত্তিবাস'। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সরল কৃত্তিবাসে'র মধ্যেই এই নামটির সঙ্গে সজনীকান্ত দ্বিতীয়বারের মত পরিচিত হলেন। মেজদা বলেছিলেন, ইনিই স্বদেশী গান লেখেন—এঁরই লেখা "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক"; রাখিবন্ধনের গান "বাংলার মাটি বাংলার জলে"র রচয়িতাও ইনিই। বালকের বিস্মিত মন বিমুগ্ধ হতে বিলম্ব হল না, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাতে পেলেন 'কথা ও কাহিনী'। এই 'কথা ও কাহিনী'কে সজনীকান্ত বলেছেন "বাল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার।" ছেলেবেলা বালক সজনীকান্তের কল্পনার নিত্যসঙ্গী ছিল রামায়ণ ও মহাভারত। আর ছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলনগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' আর 'শিশু'।

বাল্যদশা উত্তীর্ণ হতে না হতেই গ্রন্থপাঠে সজনীকান্ত হলেন সর্বভুক। পাঠ্য-অপাঠ্য নির্বিচারে হাতের নাগালে যে বই পেতেন তাই গলাধঃকরণ করতেন। শৈশবের সেই অভ্যাস তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮, প্রথম মহাযুদ্ধের এই দিনগুলি কিশোর সজনীকান্তের কেটেছিল দিনাজপুরে। তখন তাঁর মনে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন রক্তাক্ত ও বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সজনীকান্ত সেই আন্দোলনের বহির্বৃত্তে স্থান পেলেন। ভোর রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে নিকটস্থ জঙ্গলের এক পোড়ো বাড়িতে লাঠিখেলা ও ছোরাখেলার মহড়া হত। চরিত্রগঠন ও ব্রহ্মচর্য পালনে প্রেরণা আসত স্বামী বিবেকানন্দ ও অশ্বিনীকুমার দত্তের রচনাবলী থেকে। এমনি করে নিষিদ্ধ ও গোপনীয় পথে অজ্ঞেয় "দাদা"রা তাঁকে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তিনি কবিতা লিখতে পারতেন। সুতরাং "দাদা"দের প্রেরণায় স্বদেশ-প্রেমাত্মক কবিতায় তাঁর খাতার পর খাতা পূর্ণ হতে লাগল। কিন্তু সরকারি চাকুরে পিতার পুত্রের পক্ষে স্বদেশপ্রেমের কবিতা লেখা অমার্জনীয় অপরাধের এলাকাভুক্ত। একদিন পিতৃব্যস্থানীয় উচ্চপদস্থ এক রাজকর্মচারীর গৃহে তাঁদেরই বাগানের নিভৃত অংশে সজনীকান্তকে বিবেকানন্দের গ্রন্থগুলির সঙ্গে নিজের কবিতার খাতাগুলিও নিঃশেষে ভস্মীভূত করে আসতে হল। বলাই বাহুল্য, পিতার ইঙ্গিতেই এই অগ্নিশুদ্ধির ব্যবস্থা

হয়েছিল। কিন্তু সজনীকান্ত এই ব্যবস্থাকে শান্তমনে গ্রহণ করতে পারলেন না। খাতায় নিবদ্ধ মতবাদের জন্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়েও বাঁকুড়ায় নির্বাসিত হলেন। বাঁকুড়া কলেজ হস্টেলে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা দেওয়া, মোড়লি করা এবং সুর করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়াই হল তাঁর প্রতিদিনের কর্মসূচি। সাহিত্যচর্চায় পিতার সমর্থন ছিল না। সুতরাং বই কেনারও সংগতি ছিল না। চেয়ে-চিন্তে কিছু কিছু বই সংগৃহীত হত। গ্রন্থচৌর্যেও বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাতেও তরুণ গরুড়ের মহাবুভুক্ষা পরিনিবৃত্ত হত না। বাধ্য হয়ে সজনীকান্ত এক অভিনব পথ আবিষ্কার করলেন। সরকারি কাগজের খাতা বাঁধিয়ে গোটা গোটা বই নিজের হাতে নকল করতে লাগলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথেরই বই। 'গীতাঞ্জলি' ইংরেজি ও বাংলা, 'গোরা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' সম্পূর্ণ নকল করে নিয়েছিলেন। এই ভাবে সবশুদ্ধ সতেরোখানি বই নকল করা হয়েছিল। শুধু নকলই নয়, বইগুলি সজনীকান্তের কণ্ঠস্থও হয়ে গিয়েছিল। কাব্য-কবিতা তো বটেই, 'গোরা'র মত বিপুলায়তন উপন্যাসেরও বহু অংশ পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনি অনায়াসে আবৃত্তি করতে পারতেন। একলব্য-শিষ্যের এই গুরুভক্তি একদিন রবীন্দ্রনাথের চিত্ত জয় করেছিল। ১৯২৪ সনে দৈবযোগে যখন সজনীকান্ত কিছুদিনের জন্যে গুরুদেবের অনুক্ষণ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন তখন সজনীকান্তের মুখে সতেরোখানা বই-নকলের কথা শুনে কবি কৌতুক ও বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেন নি। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখছেন, "নকলগুলি তখন পর্যন্ত আমার নিকটে কলিকাতাতেই ছিল, আমি প্রমাণ দাখিল করিলাম। এতখানি তিনিও আশা করেন নাই। তিনি সেগুলি আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনেককেই সেগুলি দেখাইয়াছেন এবং অনেকের কাছে গল্প করিয়াছেন সে কথা পরে জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বহুমূল্য নকলগুলির কি দশা হইয়াছে তাহা আর জানিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত পরবর্তী যাবতীয় পুস্তকের এক এক খণ্ড আমাকে বিনামূল্যে দিবার হুকুম দিয়াছিলেন, ইহাতেই আমার বাল্য-কৈশোরের শ্রম সার্থক হইয়াছিল" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ১৭৫]।

এই প্রসঙ্গে এ কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত যে, সজনীকান্ত যে-সতেরোখানি গ্রন্থ নিজের হাতে নকল করে নিয়েছিলেন তার প্রত্যেকখানিই রবীন্দ্রনাথের। এ-জাতীয় অনুরক্তির নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে আর আছে

বলে আমাদের জানা নেই। প্রথম-দর্শনে মোহিতলাল সজনীকান্তকে বলেছিলেন, "শুনলাম রবীন্দ্রনাথকে আপনি নাকি গুলে খেয়েছেন।" 'গুলে খাওয়া' ক্রিয়াটি বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ—উভয় অর্থেই সজনীকান্তের জীবনে ছিল একান্ত সত্য ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চার

বাঁকুড়া কলেজ হস্টেলে যে কাব্যগ্রন্থখানি সজনীকান্তের মনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল তা হল রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' [প্রথম প্রকাশ : মে ১৯১৬]। শুধু সজনীকান্তই নয়, সেযুগের তরুণ কবিমানসে 'বলাকা'র কবির প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে নজরুল ইসলাম যে দুরন্ত যৌবনের জয়ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে বিদ্রোহী-কবিরূপে বাংলা-সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন, ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে তার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল 'বলাকা'।

'বলাকা'র প্রেক্ষাপটে রয়েছে বিশ্বজীবন। সেই যুগকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোর।' দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন :

> পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
> আর চলিবে না।
> বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,…

এ ঘোষণা যে কত বড় ভাববিপ্লবের দ্যোতক তা গভীরভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। পুরানো সঞ্চয় যখন দেউলে হয়ে গেছে, সত্যের সমস্ত পুঁজি ফুরিয়েছে এবং বঞ্চনাই শুধু বেড়ে চলেছে, তখন জীবনের নূতন আদর্শের সন্ধানে, নূতন মূল্যবোধ আবিষ্কারের জন্যে মানুষকে বিপ্লবী পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। মহাযুদ্ধের মধ্যে সেই অগ্রগতির ইঙ্গিত পেয়ে কবি বলছেন :

> এসেছে আদেশ—
> বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,

কিন্তু যখন ভূতল-গগন-মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন, তখন সেই মহামৃত্যু ভেদ করে নূতন উষার স্বর্ণদ্বারে পৌঁছতে পারে একমাত্র বিপ্লবী যৌবন। তাই রবীন্দ্রনাথ মানুষের যৌবন-শক্তিকে আহ্বান করে বললেন :

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন দুরন্ত, জীবন্ত, অশান্ত, প্রচণ্ড, প্রমত্ত, প্রমুক্ত ও অমর যৌবনকে। তিনি পরম বিশ্বাসে বললেন ঃ

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।

কবিগুরুর এই আহ্বানেরই প্রত্যুত্তর প্রতিধ্বনিত হল নজরুল ইসলামের কণ্ঠে ঃ

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই
শিখর হিমাদ্রির!

রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্তমেঘে ঝিলিক মারে
বজ্র বাজে গহন পারে,
কোন্ পাগল ওই বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

* * *

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠবে না?

নজরুল যেন এরই প্রতিধ্বনি করে বললেন ঃ

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কালবোশেখী 'পর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।

কালবোশেখী ঝড়ে নূতনের কেতন উড়তে দেখার দৃষ্টি বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই আনলেন 'বলাকা'র কবিতায়। সারস্বত ক্ষেত্রে নবযুগের বোধনমন্ত্র তিনিই উচ্চারণ করলেন। বাংলা-সাহিত্যে বেপরোয়া দুরন্ত যৌবনের প্রাণবিহঙ্গকে উদ্বুদ্ধ করে তিনিই বললেন পুচ্ছটি তার উচ্চে তুলে নাচাতে।

'বলাকা'র রবীন্দ্রনাথের সেই যৌবনমূর্তি তরুণ কবিচিত্তকে যে উদ্দীপিত ও উদ্বেলিত করবে তা বলাই বাহুল্য। 'বলাকা'-কাব্য-পাঠে সজনীকান্তের দীপ্ত প্রাণের হর্ষ দীপক তানে ধ্বনিত হয়ে উঠল। তখন পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলে দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত নরনারীর কণ্ঠে আর্তনাদ উঠেছে। দুর্গত মানুষের দুঃখহরণের ব্যবস্থা করা চাই। সমগ্র ওয়েস্‌লিয়ান মিশনারী কলেজ ভিক্ষায় বেরোবে। গান বেঁধে দিতে হবে। সজনীকান্ত লিখলেন :

ওঠ জাগো ভাই, শোন হাহাকার
ফাটিছে গগন পূব-বাংলার—
ঘরদোর গেছে জোটে না আহার,
ডুবিল তাহারা ডুবিল।
এল কি ঝঞ্ঝা করাল ভীষণ
গৃহহারা হল কত গৃহীজন···

এই গান কণ্ঠে নিয়ে বাঁকুড়া শহরে আর্তত্রাণের জন্যে ভিক্ষায় বেরোল কলেজের ছাত্রবৃন্দ। তাদের পুরোভাগে অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব। বাংলা ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনিও গানের সুরে কণ্ঠ মেলালেন। সদ্য-কলেজ-প্রবিষ্ট সজনীকান্তের তরুণচিত্তের উত্তেজনা সহজেই অনুমেয়। আত্মবিশ্বাসই শুধু তিনি ফিরে পেলেন না, যুগমানসের সঙ্গেও তাঁর কবি-মানসের রাখীবন্ধন হল। কবিগুরু যোগালেন ভাষা :

"দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,

ভূতল-গগন-
মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন…”

ছন্দের এই বন্ধনমুক্তি সজনীকান্তকে আবিষ্ট করল। সজনীকান্ত লিখছেন, “সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর অবগাহন-স্নানান্তে আমি যেন সহসা ছন্দবোধের বরলাভ করিলাম। আমার কাছে—

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ,
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

“অর্থের বা ভাবের দিক দিয়া এই সুবিখ্যাত পংক্তিগুলি সেদিন ততখানি পুলকের সৃষ্টি করিতে পারিল না, যতখানি করিল ছন্দের দিক দিয়া। আমি এক পরম রহস্যের সম্মুখীন হইলাম। অবিলম্বে রহস্য গভীরতর হইল ‘পলাতকা’য়—যখন পড়িলাম ঃ

বয়স ছিল আট
পড়ার ঘরে বসে বসে ভুলে যেতেম পাঠ।
জানলা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্জেদের বাড়ির পাশে
একটুখানি পড়ো জমি, শুকনো শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মত।

“এই আকস্মিক আবিষ্কারই আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত বরলাভের সামিল হইল, যাহার পূর্ণ প্রকাশ ‘রাজহংসে’ ও ‘মানস-সরোবরে’।” [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ৭৮-৭৯]। বস্তুতঃ ‘বলাকা’ ও ‘পলাতকা’র মুক্তবন্ধ ছন্দই হল নবযুগের কবিভাষার মুখ্য বাহন। সজনীকান্তও যেদিন তাঁর সত্যকার কবিসত্তাকে খুঁজে পেলেন সেদিন মুক্তপক্ষ বলাকার মুক্তকছন্দই হয়েছিল তাঁর ‘মানস-সরোবর’-অভিমুখী ‘রাজহংসে’র স্বচ্ছন্দগতি নভোবিহারের বাণী-বাহন।

পাঁচ

বাঁকুড়া কলেজে আই. এস্‌-সি. ক্লাসের ছাত্র হিসাবে তরুণ সজনীকান্ত তাঁর সারস্বত শক্তির একটি নূতন পরিচয় পেলেন। কলেজ-হস্টেলের একটি ভোজে ডাইনিং-হলে অভিনীত হবার জন্যে তিনি লিখেছিলেন একটি ব্যঙ্গ-রসাত্মক গীতিনাট্য। অষ্টআশিজন আবাসিক একসঙ্গে বসে খেতে পারে এত বড় হল। হস্টেলে দুটি দল গড়ে উঠেছিল। এক দল রক্ষণশীল, আর এক দল প্রগতিশীল। রক্ষণশীল দল গোঁড়া ছুঁৎমার্গপন্থী। প্রগতিশীল দল সর্বজনীন পঙ্‌ক্তিভোজের সমর্থক। বলাই বাহুল্য, প্রগতিশীলেরাই ছিল দলে ভারি। সজনীকান্ত হলেন সে দলের কবিভাষ্যকার। রক্ষণশীল অর্থাৎ টিকিওয়ালাদের ব্যঙ্গ করেই রচিত হল তাঁর "টিকি ও টাকা" ব্যঙ্গ গীতিনাট্য। তার বিবৃতি-অংশ বলাকার মুক্তবন্ধ ছন্দে লেখা। বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে গান। গানের সংখ্যাই বেশি, তাই "টিকি ও টাকা" স্বরূপত গীতিনাট্য। কুশীলবগণ সকলেই প্রগতিশীল দলের অন্তর্ভুক্ত। ডাইনিং-হলে ভোজের প্রাক্‌কালে "টিকি ও টাকা" 'মঞ্চস্থ' হল। বলাই বাহুল্য, অভিনয় ও গানের চেয়ে হল্লা এত বেশী হল যে হস্টেল-অধ্যক্ষ স্পুনার সাহেব অবস্থাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে অসমর্থ হলেন। বাধ্য হয়েই ছুটে এলেন কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব। ব্রাউন ছিলেন সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ। তাঁর ধমকে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলের কোন্দল নিস্তব্ধ হয়ে এল। সংগ্রামে জয়-পরাজয় সাব্যস্ত হল না বটে, কিন্তু সজনীকান্ত হাতে পেলেন এক নূতন অস্ত্র। 'আত্মস্মৃতি'তে তিনি লিখছেন, "এই 'টিকি ও টাকা' হইতেই আমি প্রথম অনুভব করিলাম যে, ব্যঙ্গে বা স্যাটায়ারে আমি মর্মান্তিক হইতে পারি।" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ৮১]। তাঁর তূণে এই নবলব্ধ অস্ত্রটি সযত্নে রক্ষিত হল।

এইভাবে বাঁকুড়ায় নেপথ্যবিধান শেষ করে সজনীকান্ত এলেন কলিকাতায়। ১৯২০ সনে স্কটিশে বি. এস্‌-সি. ক্লাসে ভরতি হলেন। প্রথমে বাসস্থান জুটল ডাফ হস্টেলে, সেখান থেকে স্থানান্তরিত হলেন অগিল্‌ভিতে। এই অগিল্‌ভিতেই তরুণ কবির বয়ঃসন্ধির শেষ পর্যায় অতিবাহিত হল। দুষ্টা সরস্বতীর কৃপায় ছাপার অক্ষরের পথে "অনঙ্গ-রঙ্গে" তিনি পারংগম হয়ে উঠলেন। বয়ঃসন্ধির এই উদ্‌ভ্রান্তি থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন রমাঁ রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ। রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ্‌' পড়ে তিনি যেন গঙ্গাস্নান

করে কলুষমুক্ত হলেন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র'ও এ সময়ে তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য অগিল্‌ভি হস্টেলের সাহিত্যপ্রাণ বন্ধুরাও সাহিত্য-তীর্থ পরিক্রমায় সজনীকান্তকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এই সময়কার যে-সব বন্ধুর নাম উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে আছেন গোপাল হালদার। তখন ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনে আসমুদ্র হিমাচল আন্দোলিত। যারা স্বভাবধর্মে স্বদেশপ্রেমিক, অথচ অন্তরে অন্তরে রাবীন্দ্রিক তাদের পক্ষে আন্দোলনের দিনগুলো অস্বস্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। অসহযোগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতাই এই অস্বস্তির কারণ। এই অবস্থায় অগিল্‌ভি হস্টেলের আবাসিকগণ গেল শান্তিনিকেতনে। হস্টেল-ম্যাগাজিনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সম্পাদক গোপাল হালদার একে বললেন 'পিল্‌গ্রিমেজ' বা তীর্থযাত্রা। আসলে হস্টেলের একটি ফুটবল খেলোয়াড় দল গেল শান্তিনিকেতনে খেলতে। সজনীকান্ত দলের দুর্গরক্ষক অর্থাৎ গোলকীপারের পদে নির্বাচিত হয়ে দলের সঙ্গী হলেন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য গুরুদর্শন। কবি তখন থাকতেন 'কোনারকে'। দীর্ঘ প্রবাসের পর তিনি য়ুরোপ থেকে সদ্য প্রত্যাবর্তন করেছেন। প্রসন্ন হাস্যে কলকাতার তরুণ ছাত্রদের স্নেহ-সম্ভাষণ জানালেন। বললেন, "তোমরাই বুঝি অগিল্‌ভি হস্‌টেলের দল। শুনলাম, ডাঙার মাঝখানে বেকায়দায় পেয়ে তোমাদের এঁরা হারিয়ে দিয়েছেন।" ফুটবল খেলায় শান্তিনিকেতনের দলের কাছে অগিল্‌ভি দল দু গোলে হেরেছিল। কিন্তু, সজনীকান্ত মনে মনে বললেন, হার নয়, জিতই হয়েছে। তীর্থদেবতার সাক্ষাৎ পেয়ে পরাজয়ের সমস্ত বেদনা নিঃশেষে মুছে গেছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় এলেন "বর্ষামঙ্গল" করতে। সজনীকান্ত সে সুযোগ হারালেন না। অল্পদিনের ব্যবধানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবিগুরুর ষাট বছরের সম্বর্ধনার আয়োজন হল। তরুণ কবি তাতেও যোগদান করলেন, এবং হস্টেলে প্রত্যাবর্তন করেই একটি "কবিবন্দনা" রচনা করলেন :

ওগো আঁধারের রবি,
ওগো মরতের কবি,
স্বরগে মরতে ঘটালে মিলন
দেবতার কৃপা লভি।

কবিতাটি সঙ্গে সঙ্গে হস্টেল-ম্যাগাজিন-ভুক্ত হল। পরবর্তী ৭ই পৌষের উৎসবে সজনীকান্ত একাই গেলেন শান্তিনিকেতনে। পকেটে রয়েছে কবিতাটি। তীর্থপরিক্রমা হল, রবীন্দ্রাদিত্যের চারপাশে সেদিনকার অনেক গ্রহ-উপগ্রহকেও দেখা হল। কিন্তু কবিতাটি কবিগুরুর কাছে পৌঁছে দেবার সুযোগ কিছুতেই হল না।

সে সুযোগ ঘটল মাস তিনেক পরে। অকারণে কবিতাটি ডাকযোগে পাঠাতে সংকোচ হচ্ছিল। সজনীকান্ত একটি উপলক্ষ তৈরি করে নিলেন। 'গোরা'র একস্থানে কবির অনবধানতাবশত একটি বৈজ্ঞানিক ভুল ছিল। সেই ভুলটির প্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে সজনীকান্ত একখানি চিঠি লিখলেন। সঙ্গে পাঠালেন কবিতাটি।

'গোরা'র ষষ্ঠ অধ্যায়ের একস্থানে ছিল, "ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটা দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।" বলাই বাহুল্য, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে ছায়া দীর্ঘতর হতে পারে না। সজনীকান্ত সবিনয়ে এই ভুলটির দিকে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখলেন। উত্তরে কবি জানালেন :

"কল্যাণীয়েষু,

গোরার কোন জায়গা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছ মনে পড়িতেছে না, বইখানিও হাতের কাছে নাই। যদি মধ্যাহ্ন কালের বর্ণনা হয় তবে ছায়ার দীর্ঘতা অসম্ভব বটে, যদি মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়া থাকে তবে ছায়া দীর্ঘ হওয়ার বাধা নাই বিশেষত ঋতুবিশেষে।

তোমার কবিতাটি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

সজনীকান্তের জীবনে এইটিই কবিগুরুর প্রথম চিঠি। সুতরাং তার মূল্য অপরিসীম। তা ছাড়া তাঁর পত্র বিফলে যায় নি। 'গোরা'র পরবর্তী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘতরকে খর্ব করেছেন। এই উপলক্ষে সজনীকান্ত লিখছেন, "এই দীর্ঘতরকে খর্ব করা—ইহাই বাংলা সাহিত্যে আমার সর্বপ্রথম কীর্তি, * * * কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার জীবনে দীর্ঘতরকে খর্ব করার ইহাই শেষ নয়।" (আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ১০৯]।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য

এক

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই শনিবার [১০ই শ্রাবণ ১৩৩১] সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তার পূর্বেই সজনীকান্ত বিজ্ঞান-সরস্বতীর কাছে বিদায় নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের সঙ্গে অর্ধপথেই সম্পর্ক শেষ হয়েছে। অভিভাবকগণকেও আর্থিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সম্বল ছিল দুটি ট্যুইশানি থেকে পাওয়া মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকা। আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল বলে একটি দিলেন ছেড়ে। সম্বল দাঁড়াল মাসিক পঁচিশ টাকা মাত্র। পূর্বেই বলা হয়েছে, সজনীকান্ত তখন বিবাহিত। কিন্তু পত্নী সুধারাণী তখনও গৃহিণী হন নি, তাঁর অনিঃশেষ সুধাভাণ্ড নিয়ে তখনও থাকেন পিত্রালয়ে। তবু মাসিক পঁচিশ টাকায় মেসের ঘরভাড়া চুকিয়ে দৈনিক খোরাক চলে না। কিছুদিনের মধ্যেই 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় সজনীকান্ত বিশিষ্ট আসন দখল করলেন। তার জন্যে যে সময় দিতে হত তার বহর কম ছিল না। সুতরাং ট্যুইশনির সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয়ে উঠল না। অতএব সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেসের নিকট বিদায় গ্রহণ করতে হল। অগতির গতি জীবনময় রায় সহায় হলেন। সজনীকান্তকে তিনি একরকম হাত ধরেই নিয়ে গেলেন ১০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সদ্য-স্থাপিত বিশ্বভারতীর কার্যালয় ও গ্রন্থালয়। চারতলার একটি অব্যবহৃত ক্ষুদ্র শৌচ-প্রকোষ্ঠে সজনীকান্তের আস্তানা রচিত হল। যৎসামান্য বিছানাপত্র সেখানে ফেলে দিয়ে সজনীকান্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে সস্তা আহার্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। দৈনিক খরচ চার-পাঁচ আনার বেশি ছিল না। বাকিটা ব্যয় হত চায়ের দোকানে।

বিশ্বভারতীর সহকারী-কর্মসচিব তখন কিশোরীমোহন সাঁতরা। তিনি তখন নিদারুণ ফুসফুসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দশ নম্বরেই শয্যাশায়ী ছিলেন। বিশ্বভারতীর স্থানীয় কর্ণধার ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তাঁর অনুমতি ছাড়া সেখানে বসবাস সম্ভব নয়। কাজেই পরদিন জীবনময় রায় সজনীকান্তকে হাজির করলেন অধ্যাপক মহলানবীশের দরবারে।

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখার বিনিময়ে সজনীকান্ত সেখানে থাকার অধিকার লাভ করলেন।

সজনীকান্ত লিখেছেন, বিশ্বভারতী আপিসে আশ্রয় পেয়ে তিনি নানাভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। তাঁর অব্যবস্থিত জীবন প্রথম একটি বাঁধা রুটিনে ধরা পড়ল। দুপুরে 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা'র ধকল সামলানো, সন্ধ্যায় আড্ডা ও আহারের ফাঁকে ফাঁকে 'শনিবারের চিঠি'র কাজ। রাত নটায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ডেরায় ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত কপি মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখা। এই সূত্রেই গ্রন্থ-সম্পাদনায় সজনীকান্তের হাতে খড়ি হল। ১২৯২ সালের 'বালক' থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ মিলিয়ে বিশ্বভারতী সংস্করণ 'রাজর্ষি' [জানুয়ারি ১৯২৫] প্রকাশের কাজে জীবনময় রায়ের সহযোগিতায় তিনি নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা সজনীকান্তের জীবনে বেশীদিন স্থায়ী হল না। 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ" প্রকাশিত হবার পর সবার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। একদিন গভীর রাতে ডাক এল অধ্যাপক মহলানবীশের কাছ থেকে। প্রশান্তচন্দ্রের মুখে প্রথম প্রশ্ন, 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ' তোমার লেখা? সদর্থক উত্তর পেয়ে তিনি বললেন, খুব ভাল লেখা, কিন্তু এসব বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে বিশ্বভারতীর সেবায় পুরোপুরি লেগে গেলে কতকটা স্থায়ী কাজ হতে পারে। সজনীকান্ত বিশ্বভারতীর সেবার চেয়ে শনিবারের চিঠির পরিচর্যাকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, সুতরাং বিশ্বভারতীর আশ্রয় ত্যাগ করতে হল।

এবার সহায় ও সঙ্গী হলেন যোগানন্দ দাস। পিতা স্বনামধন্য ডাক্তার সুন্দরীমোহনের সঙ্গে মতান্তর হওয়ার ফলে যোগানন্দ পিতৃ-আশ্রয় পরিত্যাগ করেছেন। বাস্তুহারা তরুণযুগলের চেষ্টায় রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের উপরে মানিকতলা মেন রোডের ঠিক দক্ষিণে "সায়ান্স কট" নামক মেসে উভয়ের আস্তানা রচিত হল। মেসের নামটি চটকদার বটে, কিন্তু আসলে ওটি নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাস্থ্যকর একটি বাড়ি। ওরই দুটি পাশাপাশি ঘর দুজনে ভাড়া নিলেন। বিপিনবাবুর রেস্তোরাঁয় ধারে কারবার ছিল, তারি সুবাদে আহার্যের কদর্যতা বিস্বাদ লাগত না। রাত্রির ভয়াবহ পরিবেশকে সুবহ করে তুলতেন 'খুদুদা', অর্থাৎ শনিবারের চিঠির ত্রিমূর্তির মুখ্য নায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়। তরুণ অশোক যেমন প্রিয়দর্শী তেমনি শক্তিমান পুরুষ। পাঞ্জা লড়তে ওস্তাদ। বর্মী চুরুট সেবন এবং পাল্লা দিয়ে কবিতা

লেখা ছিল তাঁর প্রিয় ব্যসন। বলাই বাহুল্য মুখে মুখে এই কবিতা-রচনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সজনীকান্তেরও উদ্দীপনা ছিল অপরিসীম। সুতরাং উত্তীর্ণসন্ধ্যার আসর ভালই জমত।

অষ্টম সংখ্যা থেকেই সজনীকান্ত শনিবারের চিঠির লেখকশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সাতাশটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি ৯ই ফাল্গুন ১৩৩১ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল। গোড়ার দিকে শনিবারের চিঠি ছিল মুখ্যত রাজনীতিমূলক ব্যঙ্গ-সাপ্তাহিক। দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের রাজনীতি চট্টোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করেনি। 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু পিতা রামানন্দের শীতল তর্কযুদ্ধে তরুণ অশোক সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর তারুণ্যের দুর্দমনীয় উত্তাপ প্রকাশের বাহন হল শনিবারের চিঠির রঙ্গব্যঙ্গ। অল্প দিনের মধ্যেই প্রবীণ ও নবীন অনেকেই বেনামে ও অনামে শনিবারের চিঠির সত্রতলে এসে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে রাজনীতির বদলে সাহিত্যই প্রাধান্য পেতে লাগল। তার একটা কারণও ছিল। যে স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে এঁদের প্রধান অভিমান ছিল তার নেতা ও কর্মীরা ধৃত ও কারান্তরালে নীত হয়ে দেশের ও দশের চিত্ত জয় করে বসলেন। কাজেই তাঁদের নিয়ে রঙ্গরসিকতা জনচিত্তের সমর্থন হারাতে লাগল। সাহিত্যিক রঙ্গরসিকতায় সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি আসর জমাতে চাইল বটে, কিন্তু তার প্রাণশক্তি ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হয়ে আসছিল। সাতাশ সপ্তাহের পরে তার শিশুমৃত্যু হল।

সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি সজনীকান্তের পক্ষে মর্মান্তিক আঘাত হয়ে দেখা দিল। যে সাহিত্য-সাধনার লোভে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন সেই সাধনার ভিত্তিমূল চোরাবালির মত তাঁর পায়ের তলা থেকে সরে গেল। আত্মীয়স্বজন, পিতামাতা, বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, শ্বশুরবাড়ির স্নেহাশ্রয়, এমন কি সম্ভাব্য উচ্চপদস্থ চাকুরি, কোনও কিছুর প্রতিই সজনীকান্ত ভ্রূক্ষেপ করেন নি। কাজেই শনিবারের চিঠির প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় তিনি মর্মান্তিক আঘাত পেলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর দু-একটি কবিতা ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু 'প্রবাসী'র সঙ্গে সম্পর্ক তখনও অন্তরঙ্গ হয় নি। অর্থাৎ তখনও তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনের প্রুফরীডার মাত্র। তাও মূলত অশোক চট্টোপাধ্যায়েরই দাক্ষিণ্যের ফল।

এই সময়কার একটি কৌতুককর ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য-সেবার দ্বারা লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্যলাভের একটি অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করলেন

যোগানন্দ দাস ও সজনীকান্ত। ত্রয়োবিংশ সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হল :

"Applied Literature Society

—। আর ভাবনা নাই।—

কবিতার ঝরনা আপনার দ্বারে প্রবহমাণা। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সম্বর্ধনা, বিদায় ইত্যাদি সকল বিষয়ের গভীর ভাবযুক্ত কবিতা আপনার জন্য সকল সময় ফরমাস মাফিক তৈয়ার থাকিবে। দক্ষিণার হার—বিদায় ও সম্বর্ধনা কবিতা ১০৲, বিবাহ কবিতা ৮৲, শ্রাদ্ধাদি কবিতা ৪৲, অন্যান্য উৎসব ও পর্বাদি বিষয়ক গাথা ৫৲।

প্রত্যেক কবিতার স্বত্ব ক্রয় করিবার ব্যবস্থা এবং হার স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণের জন্য কার্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখুন। অর্ধমূল্য অগ্রিম দেয়।

ফলিত সাহিত্য কার্যালয়

১০৯, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।"

ঠিকানাটি যোগানন্দের পিতৃগৃহের। বলা বাহুল্য, ততদিনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছেন। সজনীকান্তও 'সায়ান্স-কট' বা বিজ্ঞানকুঞ্জ ছেড়ে আবার উপস্থিত হয়েছেন ২৭ বাদুড়বাগান লেনের মেসে। বলা নিষ্প্রয়োজন, 'ফলিত সাহিত্য' ফলপ্রসূ হল না। চার সপ্তাহ পরে শনিবারের চিঠিও বন্ধ হল।

দুই

সজনীকান্তের জীবনের এই আত্মিক ও আর্থিক সংকটের দিনে তাঁর জীবনে আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ। শিষ্য এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় গুরুর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভের দুর্লভ সুযোগ পেলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরেছেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের তারিখ ৫ই ফাল্গুন ১৩৩১ [১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫]। তাঁর পশ্চিমযাত্রার কাহিনী অগ্রহায়ণ [১৩৩১] থেকেই 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। মাঘ পর্যন্ত বেরিয়ে তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কবি দেশে ফিরবামাত্র তাঁকে 'কপি'র জন্যে জোর সম্পাদকীয় তাগাদা দেওয়া হল। তিনি বলে পাঠালেন, লেখা বীজাকারে তাঁর নোট বইয়ে রয়েছে; কিন্তু নিজের হাতে তাকে প্রকাশযোগ্য রূপ দেবার মত শারীরিক শক্তি ও উৎসাহ তাঁর নেই। তবে উপযুক্ত লেখক পেলে তিনি মুখে মুখে বলে যেতে রাজি আছেন। প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ সজনীকান্তকে এই কর্মে নিযুক্ত করলেন।

লোভনীয় কর্ম সন্দেহ নেই। কিন্তু সজনীকান্ত কেন 'উপযুক্ত লেখক' বলে নির্বাচিত হলেন তার একটি কারণ ছিল। শনিবারের চিঠির জন্মের পূর্ব থেকেই সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯২১ থেকে কয়েকবার শান্তিনিকেতন যাতায়াত এবং সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সভ্য হিসাবে নাম লিখিয়ে তিনি বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ মহলে পরিচিত হন। এই সময় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলিখন-কর্মে তিনি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ১৯২৪ সনের ২১শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ চীন-ভ্রমণে যাত্রা করেন। এই উপলক্ষে আলিপুরের আবহ-দপ্তরে কবির বিদায়-সম্বর্ধনার আয়োজন হয়। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। সেখানকার মাঠে সভার আয়োজন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি ক্ষুদ্র মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে সজনীকান্তও তার অনুলিখন নেন। রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের লেখাটিই পছন্দ করেছিলেন। চীন থেকে কবি প্রত্যাবর্তন করেন ২১শে জুলাই ১৯২৪। সেই দিনই কলিকাতা য়ুনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে তাঁর বিপুল সম্বর্ধনার আয়োজন হয়। সেই সভাতেও সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলিপি গ্রহণের জন্যে আহূত হয়েছিলেন। সভার শেষে অনুলিখিত ভাষণটি নিয়ে সজনীকান্ত কবির নিকট হাজির হলেন। কবি কিঞ্চিৎ পরিশোধন ও পরিমার্জন করে তাতে তাঁর স্বাক্ষর যোজনা করলেন। সজনীকান্ত এই অনুলিখন-দক্ষতার গুণেই কবির কাছ থেকে শুনে শুনে "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি" লেখার গৌরব লাভ করলেন।

প্রবাসী-সম্পাদক তখন শান্তিনিকেতনে। কাজেই নিয়োগকর্মটি সমাধা করলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন। প্রবাসীতে কবির লেখার 'কপি' সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন, এবং সজনীকান্তকে সরাসরি প্রবাসীর কর্মী-শ্রেণীভুক্ত করবার সুযোগ পেলেন। সজনীকান্ত মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে প্রবাসীর প্রুফরীডার নিযুক্ত হলেন। মেশিনে যখন ফর্মা চড়বে সম্পাদকীয় বিভাগের দেখা প্রুফ যথাযথ সংশোধিত হয়েছে কিনা তা মিলিয়ে দেখাই হল তাঁর মুখ্যকৃত্য। অবশ্য গোড়ার কাজ 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র কপি আহরণ। রবীন্দ্রনাথ তখন আলিপুরের আবহ-দপ্তরে অধ্যাপক মহলানবীশের অতিথি। সজনীকান্তকেও সাময়িকভাবে সেখানে ডেরা বাঁধতে হল। অনুলিখনকর্মে পূর্বেই তিনি রবীন্দ্রনাথের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। সুতরাং হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কবির কাছে সস্নেহ ও সাদর আপ্যায়ন লাভ করলেন।

এই উপলক্ষে সজনীকান্ত যে দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন তা যে-কোন সারস্বত সন্তানেরই ঈর্ষার বস্তু। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখছেন : "রবীন্দ্রনাথকে আশৈশব ভালবাসি, ভক্তি করি, তাঁহার সহিত কৌশলে পত্রব্যবহার করিয়াছি, তাঁহার সান্নিধ্যেও আসিয়াছি, কিন্তু এতখানি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের কথা আমার সুদূরবর্তী কল্পনাতেও ছিল না। দিনরাত্রি সর্বদা কয়েকদিন একসঙ্গে থাকিতে হইয়াছিল, এক টেবিলে আহার করিতাম, এক ঘরে শয়ন করিতাম। খেয়াল হইলেই তিনি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া নোট-বইটি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া মুখে মুখে ডায়ারি রচনা করিয়া চলিতেন, আর আমি লিখিয়া যাইতাম। ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ তারিখ হইতে শেষ পর্যন্ত আমার অনুলিখন। মাঝে মাঝে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সুষ্ঠু শব্দ হাতড়াইতেন, আমি সাধ্যমত কথা যোগাইতাম, অনেক শব্দ এবং কিছু কিছু বাক্যও যে আমার রচনা নয় তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারিব না। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁহার বক্তব্যের সম্পূর্ণ মৎকৃত রচনার নীচে স্বাক্ষর করিয়া তিনি আমাকে প্রভূত সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু সেই গোড়ার দিকে নিতান্ত কাঁচা বয়সে এই সম্মানে আমার দেহে রীতিমত স্বেদ-পুলক-কম্প হইত। নিভৃত আলাপের সুযোগে তাঁহার কাছ হইতে বাংলা-সাহিত্য বিষয়ে অনেক অভিমত ও উপদেশ আদায় করিয়া লইয়াছি, তাঁহার সেই সময়কার অনেক ইঙ্গিত আমার জীবনের সাহিত্য-পথের পাথেয় হইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিশ্রাম দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ফলে বিশেষ নজর দিয়া সমসাময়িক বাংলা-সাহিত্যচর্চার অবকাশ তাঁহার ছিল না, কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞ দৃষ্টি এক নজর যাহা দেখিত তাহারই সঠিক মূল্য বিচার করিয়া লইতে পারিত।" [আত্ম-স্মৃতি-১, পৃ° ১৭৫-৭৬]।

সজনীকান্ত এই সময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কবিগুরু সম্পর্কে পুনরায় লিখছেন :

"কবি রবীন্দ্রনাথের খেয়ালের কিছু কিছু পরিচয় পাইতাম। সেদিন দক্ষিণের গাড়ি-বারান্দার উপরে আরাম-কেদারায় কবির আসন পাতা হইয়াছে, আমরা চুপচাপ মেঝেতে বসিয়া আছি। রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। বিজলী আলো জ্বালিবার হুকুম নাই। গুন্ গুন্ করিয়া কবি নিজেরই রচিত গান গাহিতেছেন, সহসা অন্যের কণ্ঠে নিজের গান শুনিবার ঝোঁক চাপিল। চলনসই গোছও কেহ কাছাকাছি ছিল না। সেই নিশীথরাত্রে ডালহৌসি-স্কোয়ারের সেন্‌ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে লোক

ছুটিল শান্তিনিকেতনে জরুরি তার করিতে—রমা মজুমদারের অবিলম্বে আসা চাই। পরদিন রৌদ্র প্রখর হইবার পূর্বেই রমা দেবী উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি না আসা পর্যন্ত কবি শিশুর মত অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রমা দেবী প্রায় ধুলাপায়ে গান ধরিলে তবে তিনি শান্ত হইলেন।" [আত্ম-স্মৃতি-১, পৃ° ১৭৮]।

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র সজনীকান্ত-লিখিত অনুলিখনের পরিমাণ অল্প নয়। 'যাত্রী' গ্রন্থের ১৩৫৩ কার্তিক সংস্করণে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' প্রথম ১৬৯ পৃষ্ঠা দখল করে আছে। সজনীকান্তের অনুলিখিত অংশ প্রায় অর্ধেক; অর্থাৎ ৯১ পৃষ্ঠা থেকে ১৬৯ পৃষ্ঠা। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বার্ধ আরম্ভ হয়েছে ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪, আর শেষ হয়েছে ৭ই অক্টোবর ১৯২৪। ডায়ারির উত্তরার্ধ আরম্ভ হয়েছে তার চার মাস পরে, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ তারিখের ডায়ারি দিয়ে, শেষ হয়েছে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ তারিখে। এই উত্তরার্ধের সমস্তটাই সজনীকান্তের অনুলিখন।

এই উপলক্ষে সজনীকান্ত শুধু কবিগুরুর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যই পেলেন না, তাঁর তরুণ যৌবনের একটি গুরুতর সংকটলগ্নও উত্তীর্ণ হলেন। তিনি বলেছেন, "যখন নিরাশ্রয় হইয়া ভাসিয়া যাইবার কথা, বেকার অবস্থায় বাংলা দেশের আরও হাজার হাজার বেকারের মত জনতার ভিড়ে হারাইয়া যাইবার কথা, তখনই রবীন্দ্রনাথের আহ্বান আমাকে রক্ষা করিল। আমার জীবনে আরও কয়েকবার রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংকটকালে আমার রক্ষার উপলক্ষ হইয়াছেন, শনিগ্রহের তিনি মঙ্গলগ্রহ।" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ১৭৭-৭৮]।

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র অনুলিখন শেষ হলে সজনীকান্ত স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে মর্ত্যের ধরণীতে, অর্থাৎ সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেসে ফিরে এলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

আহ্বান

এক

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বৎসর। তার ঠিক এক যুগ আগে, ১৩২১ সালের রবীন্দ্র-জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছিল বীরবলের 'সবুজপত্র'। সেই পঁচিশে বৈশাখে শুধু

সবুজপত্রেরই জন্ম হয় নি, জন্ম হয়েছিল সবুজ প্রাণের, সবুজ মননের। সেই নবীন আবির্ভাবকে আবাহন করে কবিগুরু বলেছিলেন :

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগ্‌বে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা।

রবীন্দ্রনাথ এই আবাহন-মন্ত্রে যে সবুজকে যে অবুঝকে আহ্বান করলেন তারই যেন আবির্ভাব হল ন বছর পরে 'কল্লোল' পত্রিকার বুকে। 'কল্লোলে'র প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ সালের বৈশাখ মাসে। তখন নবীন কল্লোলগোষ্ঠীর অগ্রজ দলের শৈলজানন্দ-নজরুলের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র উনিশ-কুড়ি, আর বুদ্ধদেব মাত্র পনেরো। পনেরো থেকে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক এই বেপরোয়া বিদ্রোহী তরুণদের জয়যাত্রা শুরু হল কল্লোলে। কল্লোলের কলধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যাবার কুড়ি বৎসর পরে তার ইতিহাস রচনা করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল-যুগে'। তাঁর কণ্ঠে 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র বক্তব্য শোনা যেতে পারে। অচিন্ত্যকুমার বলেছেন :

"'কল্লোল' বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।" [কল্লোল-যুগ, পৃ° ১৮-১৯]

"'কল্লোলে' এই দুইটি বিচ্ছিন্ন ধারা ছিল। একদিকে রুক্ষ-শুষ্ক শহুরে কৃত্রিমতা, অন্যদিকে অনাঢ্য গ্রাম্য জীবনের সারল্য। বস্তি বা ধাওড়া, কুঁড়েঘর বা কারখানা, ধানক্ষেত বা ড্রয়িং রুম। সমস্ত দিক দিয়ে একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ। যতটা শক্তিসাধ্য, শুধু ভবিষ্যতের ফটকের দিকে ঠেলে এগিয়ে দেওয়া।" [পৃ° ১১৩]

"যেমন শোক থেকে শ্লোকের জন্ম, তেমনি তারুণ্য থেকেই 'কল্লোলে'র আবির্ভাব। তারুণ্য যখন বীর্য, বিদ্রোহ ও বলবত্তার উপাধি।" [পৃ° ১৯৩]

"কল্লোল আপিসে একবার একটা খুব গম্ভীর সভা করেছিলাম আমরা। সেই ছোট, ঘন, মায়াময় ঘরটিতে অনেকেই একত্র হয়েছিল সেদিন। কালিদাস

নাগ, নরেন্দ্র দেব, দীনেশরঞ্জন, মুরলীধর, শৈলজা, প্রেমেন, সুবোধ রায়, পবিত্র, নৃপেন, ভূপতি, হরিহর এবং আরও কেউ-কেউ। সেদিন ঠিক হয়েছিল 'কল্লোল'কে ঘিরে একটা বলবান সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। যার মধ্য দিয়ে একটা মহৎ প্রেরণা ও বৃহৎ প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। একটা কিছু বড় রকমের সৃষ্টি, বড় রকমের প্রজ্ঞা। সমস্ত বাধা বিপদ ও ব্যর্থ বিতর্ক উপেক্ষা করে একাগ্রসাধন।"

* * *

"মনে আছে সেদিনের সেই সভার চৌহদ্দিটা মিত্রতার মাঠ থেকে ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গতার অঙ্গনে ছোট করে আনা হয়েছিল। দীনেশদাকে ঘিরে সেদিন বসেছিলাম আমরা কজন। স্থির করেছিলাম, সাহিত্যিক সিদ্ধিও যোগজ সিদ্ধি—কেউ তাই বিয়ে করব না। অনন্যচেতা হয়ে বদ্ধপদ্মাসনে শুধু সাহিত্যেরই ধ্যান করব। শুধু তাই নয়, থাকব একসঙ্গে, এক ব্যারাকে, এক হাঁড়িতে। সকলের আয় একই লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে জড়ো হবে, দর বুঝে নয় দরকার বুঝে হবে তার সমান বাঁটোয়ারা। সুন্দর স্বপ্নের উপনিবেশ স্থাপন করব।" [পৃ° ১৫৫]

কল্লোল যুগের ইতিহাস শেষ করে গ্রন্থের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে অচিন্ত্যকুমার লিখছেন, "'কল্লোল' উঠে যাবার পর কুড়ি বছর চলে গেছে। আরও কত বছর চলে যাবে, কিন্তু ওরকমটি আর "ন ভূতো ন ভাবী।" দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন হবে দিনে দিনে, কিন্তু যে যৌবনদীপ্তিতে বাংলা সাহিত্য একদিন আলোকিত হয়েছিল তার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই—সত্যের মত তা সর্বাবস্থায়ই সত্য থাকবে। যারা একদিন সে আলোক-সভাতলে একত্র হয়েছিল, তারা আজ বিচিত্র জীবনিয়মে পরস্পরবিচ্ছিন্ন—প্রতিপূরণে না হয়ে হয়তো বা প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত—তবু সন্দেহ কি সব তারা এক জপমালার গুটি, এক মহাকাশের গ্রহতারা। যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরছে বটে, কিন্তু সব এক মন্ত্রে বাঁধা, এক ছন্দে অনুবর্তিত। এক তত্ত্বাতীত সত্তা-সমুদ্রের কল্লোল একেক জন।" [পৃ° ২০২-২০৩]

দুই

অচিন্ত্যকুমার কবি। তাই কল্লোল-যুগের ইতিহাস রচনায় তাঁর কবিস্বপ্নই জয়যুক্ত হয়েছে। তবু তাঁকেও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়েছে, "যারা একদিন সে আলোক-সভাতলে একত্র হয়েছিল, তারা আজ বিচিত্র জীবনিয়মে পরস্পর-

বিচ্ছিন্ন—প্রতিপূরণে না হয়ে হয়তো বা প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত"। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত 'জীবনিয়মে'রই জয় হয়েছে—এই তাঁর ক্ষুব্ধ বক্তব্য। অচিন্ত্যকুমার কল্লোল-আপিসে যে 'গম্ভীর সভা'র কথা বলেছেন, তাতে একটা 'বলবান সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরি'র সংকল্প ছিল। একটা মহৎ প্রেরণা ও বৃহৎ প্রচেষ্টা। একটা কিছু বড় রকমের সৃষ্টি, বড় রকমের প্রজ্ঞা। এই সংকল্প সাধনের জন্যে 'একসঙ্গে এক ব্যারাকে এক হাঁড়িতে' থাকার অভিপ্রায়, এবং একই লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে সকলের আয় জড়ো করার অভিলাষ যে নিতান্তই একটি অবাস্তব য়ুটোপিয়া রচনার ব্যর্থ প্রয়াসমাত্রই ছিল তার প্রমাণ কল্লোলের অকাল-মৃত্যু। সাত বৎসর যেতে না যেতেই পত্রিকাখানি উঠে গেল।

সাত বৎসরই বা কেন, চতুর্থ বৎসরেই কল্লোল হল দ্বিধাবিভক্ত। ১৩৩৩ সালের বৈশাখে শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মুরলীধরের সহযোগিতায় প্রকাশ করলেন 'কালিকলম'। অচিন্ত্যকুমার কালিকলমের জন্মপ্রসঙ্গে লিখছেন, "কিন্তু প্রেমেন শৈলজার অর্থের প্রয়োজন তখন অত্যন্ত। তাই তারা ঠিক করলে আলাদা একটা কাগজ বের করবে। সেই কাগজে ব্যবস্থা করবে অশনাচ্ছাদনের। সঙ্গে সুমন্ত্র মুরলীধর বসু। তন্ত্রধারক বরদা এজেন্সির শিশির নিয়োগী।" [পৃ° ১৩০]

কিন্তু কালিকলমও, অচিন্ত্যকুমারই বলছেন, ব্যবসার ক্ষেত্রে ফেল মারল। এক বছর পরেই প্রেমেন্দ্র কালিকলমের সংস্রব ত্যাগ করলেন। দু বছর পরে শৈলজানন্দ। মুরলীধরও আরও বছর তিনেক এক পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু মুরলীধ্বনিও ক্ষীণতর হতে হতে বন্ধ হয়ে গেল। কল্লোল ভেঙে কালিকলমের প্রকাশ, অচিন্ত্যকুমারের মতে, বাইরে থেকে দেখতে গেলে, কল্লোলের সংহতিতে চিড়খাওয়া; কিন্তু আসলে কল্লোল কালিকলমে কোনও দলাদলি বা বিরোধ-বিপক্ষতা ছিল না। "'কল্লোল' আর 'কালিকলম' একই মুক্ত বিহঙ্গের দুই দীপ্ত পাখা।"

বাক্যটিতে কাব্য আছে, কিন্তু সত্য নেই। সত্য কথা বলতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সেদিন বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় যে কচি ও কাঁচা প্রাণবিহঙ্গ পুচ্ছটি তার উচে তুলে নাচাচ্ছিল তার পাখা মাত্র দুটিই ছিল না, সে ছিল বহুপক্ষ। কল্লোল ও কালিকলমের সঙ্গে অন্তত আরো একটি নাম যুক্ত না করলে নিতান্তই অন্যায় হবে। সে নামটি হল 'প্রগতি'। প্রগতি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে। সম্পাদক ছিলেন অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু। নিয়মিত লেখকগণের মধ্যে ছিলেন জীবনানন্দ,

অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রভু গুহঠাকুরতা প্রভৃতি। মোহিতলাল এবং সুশীলকুমারের রচনাও তাতে প্রকাশিত হয়েছে। প্রগতিতেই বুদ্ধদেবের 'সাড়া' ও অচিন্ত্যকুমারের 'আকস্মিক' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'র বহু কবিতাও প্রগতির বুকেই স্থান পেয়েছিল। কিন্তু প্রগতিও ছিল স্বল্পায়ু। আড়াই বছর সে বেঁচেছিল। প্রগতি উঠে যাবে কি যাবে না, এই যখন সমস্যা তখন বুদ্ধদেব অচিন্তকুমারকে লিখছেন, "তোমার কাছে কিছু সাহায্য চাই। পাঁচটা টাকা তুমি সহজেই spare করতে পারো। সম্পূর্ণ নিজেদের একটা কাগজ থাকা—সেটা কি কম সুখের? আধুনিক সাহিত্যের আন্দোলনটা আমরা কয়েক জনে মিলে control করছি, এ কথা ভাবতে পারার luxury কি কম?" [কল্লোল-যুগ, পৃ° ১৪১]

কিন্তু শুধু এই তিনখানি পত্রিকাই নয়, প্রবাসী-বাঙালীদের মুখপত্র 'উত্তরা' বেরিয়েছে 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'র আগে। তা ছাড়া আছে সেই সময়কার 'ধূপছায়া' এবং একটু পরবর্তীকালের পূর্বাশা'। সেদিনকার তরুণের দল সব পত্রিকাতেই লিখতেন। সুতরাং 'কল্লোলগোষ্ঠী' বলে তাদের চিহ্নিত করলে কল্লোলকে নিশ্চয়ই মর্যাদা দেওয়া হবে, কিন্তু অন্যান্য পত্রিকার প্রতি সুবিচার করা হবে না।

তা ছাড়া নজরুল, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব—সবাই কল্লোলে লিখেছেন বটে, কিন্তু কাউকেই বলা যাবে না কল্লোলের সৃষ্টি। নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়েছে অন্যত্র, এবং কল্লোলের জন্মের অনেক আগে। যে 'কয়লা-কুঠী'র জন্যে শৈলজানন্দ নব্যযুগের পথিকৃৎ বলে স্বীকৃত তার প্রকাশও অন্যত্র। প্রেমেন্দ্রের 'শুধু কেরাণী'কেও কল্লোল দাবি করতে পারে না। আর বুদ্ধদেব তো একান্তভাবে প্রগতিরই সৃষ্টি।

কল্লোলের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত অগ্রজদের মধ্যে আছেন সৌরীন্দ্রমোহন, হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও নরেন্দ্র দেব। বলাই বাহুল্য, এঁদের আত্মীয়তা মণিলালের 'ভারতী'র সঙ্গে। মোহিতলাল তো বাংলা সাহিত্যে কল্লোলবিরোধী গোষ্ঠীর পুরোধা বলেই স্বীকৃত। কিন্তু তাঁর পান্থ, প্রেতপুরী, নাগার্জুন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা কল্লোল ও কালিকলমে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, অচিন্ত্যকুমার তাঁকেই বলেছেন 'আধুনিকোত্তম'। বলেছেন, "মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায়, তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, যঙ্গন বাঙ্গনের পাঠ আমরা তাঁর কাছে থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম।

আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কাররাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়।" [পৃ° ৮১] শুধু অচিন্ত্যকুমারই নন, বুদ্ধদেবও এ কথা স্বীকার করেছেন। একবার কল্লোলে শৈলজানন্দের ছবি বেরলো। তা দেখে বুদ্ধদেব অচিন্ত্যকুমার লিখলেন, "এবারকার কল্লোলে শৈলজানন্দের ছবি দিয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। আধুনিকদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান করার সময় বোধ হয় এসেছে। তাহলে কিন্তু এবার মোহিতলালের ছবিও দিতে হয়। কারণ আজকের দিনে কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন শৈলজানন্দ, কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি মোহিতলাল—নয় কি ?" [কল্লোল-যুগ, পৃ° ১৩৬]

অথচ ভাবতে অবাক লাগে, এই মোহিতলাল কৃত্তিবাস ওঝা সেজে 'শনিবারের চিঠি'তে লিখছেন "সরস-সতী"। নব-কৃত্তিবাসের সেই সরস্বতী-বন্দনাটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। কবি লিখছেন :

সারাটা জাতের শির-দাঁড়াটায় ধরেছে ঘুণ—
মা'র জঠরেও কাম-যাতনায় জ্বলিছে ভ্রূণ।
শুকদেব যথা করেছিল বেদ-অধ্যয়ন—
গর্ভে বসেই শেষ করে তারা বাৎস্যায়ন।

বুলি না ফুটিতে চুরি করে চায়—মোহন ঠাম।
ভাষা না শিখিতে লেখে কামায়ন—কামের সাম।
জ্ঞান হলে পরে মায়েরে দেখে যে বারাঙ্গনা।
তার পরে চায় সারা দেশময় অসতীপনা।

এদেরি পূজোয় ধরা দিয়েছ যে সরস্বতী,
চিনিনে তোমায়, কোন বলে তুমি আছিলে, সতী ?
দেখি তুমি শুধু নাচিয়া বেড়াও হাঁস-পা-তালে,—
অঙ্গে ধবল, কুষ্ঠও বুঝি ওষ্ঠে-গালে।

একদিকে কালিকলমের 'নাগার্জুন', অন্যদিকে শনিবারের চিঠির 'সরস-সতী' —স্বনামে ও ছদ্মনামে একই পুরুষের দুই রূপ। কে অধিকতর সত্য, সে প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে অবান্তর। শুধু মোহিতলালেরই নয়, একই পুরুষের মধ্যে এই দুই-'আমি'র লড়াই আরও অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। কারও আগে, কারও পরে। কারও মধ্যে স্বচ্ছ, কারও মধ্যে কুহেলিকাচ্ছন্ন। অন্যে পরে

কা কথা, রবীন্দ্রনাথের মত মহাশিল্পীর মধ্যেও এই দুই-'আমি'র লীলা, নূতন ও পুরাতনের সন্ধিলগ্নের এই মানস-দ্বন্দ্বের ইতিহাস পরিলক্ষণীয়। সে কাহিনী যথাসময়ে আলোচিত হবে।

কল্লোল-যুগ সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, "ওরকমটি আর ন ভূতো ন ভাবী।" এই উক্তিও তাঁর কবিপ্রাণের আত্মসন্তুষ্ট ভাবোচ্ছ্বাসমাত্র। বস্তুত, জীবনেই হোক, আর সাহিত্যেই হোক, নূতন যুগ মাত্রেরই ওটি সামান্য-লক্ষণ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথাতেই সীমাবদ্ধ থেকে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলও ওই একই কথা বলেছিল, ওরকমটি আর ন ভূতো ন ভাবী। আর একদিন জোড়াসাঁকোর ভারতী-গোষ্ঠীও কি ওই একই কথা বলে নি? তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠী, বীরবলের সবুজপত্র-গোষ্ঠী, সুধীন্দ্রনাথের পরিচয়-গোষ্ঠী—সবারই কি ওই এক কথা নয়—ওরকমটি আর ন ভূতো ন ভাবী?

বস্তুত, জীবনসাধনা এবং শিল্পসাধনায় এমন এক-একটি যুগ আসে যখন 'পুঁথিপোড়োর কাছে' 'পথে-চলার বিধি-বিধান যাচা' ঘুচিয়ে দিয়ে নূতন পথের সন্ধানে অজানার উদ্দেশে মানুষকে দুঃসাহসের সঙ্গে যাত্রা করতে হয়। ইংরেজ সমালোচক I. M. Parsons ভারি সুন্দর করে কথাটি বলেছেন। 'কাব্যের অগ্রগতি', "The Progress of poetry'-র ভূমিকায় তিনি লিখছেন:

"Every age, it has been said, is an age of transition, and in one sense this is a truism of literature as well as of life. Yet it is atleast equally true that in certain periods literature, and more particularly poetry, finds itself canalised in a particular mode, and that in other periods the need to escape a particular mode is the chief pre-occupation of those artists who are most alive in their day. There are times, in fact, when it seems impossible to write well in any but the accepted convention, and other times when it is vitally important that an outworn convention should be superseded."

প্রথম-সমরোত্তর বাংলাদেশে এই নবযুগারম্ভের লক্ষণ জীবনে ও সাহিত্যে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। জীবনবোধে এসেছিল নবীনতা; ভঙ্গি ও আঙ্গিকে তাই দেখা দিয়েছিল পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু

তারুণ্যের ভাবাবেগে দুর্নিবার বেগে এগিয়ে যাওয়াই সব সময় অগ্রগতি নয়। গাড়ির গতিবেগ যতই দ্রুত হোক না কেন, 'ব্রেক' কষার শক্তিও তার থাকা চাই। শুধু 'অস্তি' নয়, শুধু 'নাস্তি'ও নয়—'তদুভয়'কে নিয়েই জীবনের অগ্রগতি। তাই কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির অনিবার্য পরিপূরক হল শনিবারের চিঠি। খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখলে এরা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু অস্তি ও নাস্তিকে তদুভয়ে মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে এরা পরস্পর পরস্পরের শুধু পরিপূরকই নয়. পরস্পরের পক্ষে অত্যাবশ্যকও বটে। বস্তুত, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে মানুষের জীবনকে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রতি লগ্নই এক অর্থে রূপান্তর লগ্ন। সেই রূপান্তরের মধ্যে নূতনও আছে, পুরাতনও আছে। তাই প্রত্যিটি যুগেই সমাজমানসে যেমন নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব আছে, তেমনি আছে ব্যক্তিমানসে। সেই জন্যেই যিনি নবনবীনের আবাহনে 'সবুজের অভিযান' লেখেন তাঁকেই আবার লিখতে হয় 'সাহিত্যধর্ম'।

তিন

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের গুরুত্বের উল্লেখ করেছি প্রথমেই। ওই সালে দুই শিবিরের যুদ্ধে যে রৌদ্ররসাত্মক নাটক অভিনীত হল তার পূর্বরঙ্গ রচিত হয়েছিল কল্লোলে বুদ্ধদেব বসুর "রজনী হল উতলা" গল্পে। পরের মাসের কল্লোলেই ছাপা হল অচিন্ত্যকুমারের "গাব আজ আনন্দের গান" কবিতাটি। মৃন্ময় দেহের পাত্রে মিথুনলীলার আনন্দই কবিতাটির আলম্বন। কবি বললেন :

> যে আনন্দে সতেজ প্রফুল্ল নর দম্ভদৃপ্ত নির্ভীক বর্বর
> ব্যাকুল বাহুর বন্ধে কুন্দকান্তি সুন্দরীরে করিছে জর্জর,
> শক্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্নায়ুতে শিরায়
> যে আনন্দ সম্ভোগস্পৃহায়—
> যে আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে গড়িছে সন্তান
> গাব সেই আনন্দের গান।

তার পরের মাসেই বেরলো যুবনাশ্ব-ছদ্মনামা মণীশ ঘটকের "পটলডাঙার পাঁচালি"। পটলডাঙার ভিখিরি পাড়ার প্যাচপেচে পাঁকের মধ্যে হোগলার কুঁড়েঘরে কথাসরস্বতীর কমলাসন পড়ল। বাণীর দেউলে প্রবেশাধিকার পেল কুঠে বুড়ি, নফর, ফকরে, সদি, গুবরে, নুলো আর খেঁদি পিসি।

আর ওদেরই প্রতিদিনকার ব্যবহৃত অন্ত্যজ বুলিই হল ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত সংলাপের ভাষা। অন্ত্যজ জীবনের চিত্র বাংলা সাহিত্যে কবে কার হাতে প্রথম অঙ্কিত হয়েছিল সে ইতিহাস এখানে টেনে লাভ নেই। কিন্তু কল্লোল-প্রকাশের সমকালেই মেহনতি মানুষের প্রথম মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক 'সংহতি' পত্রিকা [বৈশাখ, ১৩৩০]। সংহতিরই উত্তরসূরি হল 'লাঙল', 'গণবাণী' ও 'গণশক্তি'। দিনমজুরদের নিয়ে এই যুগের প্রথম গল্প 'দিনমজুর' লিখেছিলেন নারায়ণ ভট্টাচার্য সংহতির পৃষ্ঠাতেই। অবশ্য বস্তিজীবন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য প্রথম রচনা করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'পাঁক' উপন্যাসে।

আমরা 'রজনী হল উতলা', 'গাব আজ আনন্দের গান', আর 'পটলডাঙার পাঁচালি'র কথা বলছিলাম। কালিকলম প্রকাশিত হল নজরুল ইসলামের "মাধবী প্রলাপ" কবিতা নিয়ে। বসন্ত-বনভূমিতে সুরত-কেলির বর্ণনাই কবিতাটির আলম্বন। "হল অশোক শিমুলে বন পুষ্পরজা।" অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন "চূড়া স্পর্শ করল বুদ্ধদেবের কবিতা, 'বন্দীর বন্দনা'—ফাল্গুনের কল্লোলে প্রকাশিত :

বাসনার বক্ষমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্তলাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গারের হিয়া
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি।"

স্বভাবতই নরক গুলজার হয়ে উঠল। অর্থাৎ সত্য ও সুন্দরের সীমানা নিয়ে চিরকালের সংগ্রাম নূতন করে শুরু হল। অশ্লীলতাই হল প্রধান আপত্তি। কিন্তু কোন্ রচনা শ্লীল আর কোন্‌টি অশ্লীল—এ বিচার কে করবে? স্বভাবতই দেখা দিল মতভেদ। কালিকলমে প্রকাশিত শৈলজানন্দের গল্প "দিদিমণি" আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প "পোনাঘাট পেরিয়ে" সম্বন্ধে কল্লোল-গোষ্ঠীরই একজন চিন্তাশীল লেখক, কাশীর মহেন্দ্র রায়, অশ্লীলতার অভিযোগ উত্থাপন করলেন। নজরুলের 'মাধবী প্রলাপ' এবং মোহিতলালের 'নাগার্জুনে'র বিরুদ্ধেও তাঁর একই অভিযোগ। মহেন্দ্র রায় নিজের বক্তব্যের সমর্থনে প্রবন্ধ লিখলেন। পাল্টা জবাব দিলেন সত্যসন্ধ সিংহ ছদ্মনামে ডক্টর নরেশ সেনগুপ্ত।

অথচ মজা হল, কালিকলম যখন অশ্লীলতার দায়ে আইনের কবলে পড়ল তখন মহেন্দ্র রায়ের রচনাই হল তার অন্যতর কারণ। নিরুপম গুপ্ত

ছদ্মনামে তিনি লিখেছিলেন "শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে" নামে একটি গল্প।

সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চিত্রবহা'র "যৌবনবেদনা" ও "নরকের দ্বার" এই দুইটি অধ্যায় এবং "শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে"র গোটাটাই অশ্লীল বলে অভিযুক্ত হল। আদালতের বিচারে কালিকলম-সম্পাদক মুরলীধর আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না, বললেন, "আমাদের পক্ষে কোন উকিল নেই, একমাত্র ভবিষ্যৎই আমাদের উকিল।" আইনের দৃষ্টিতে অভিযোগ অবশ্য টিকল না। ম্যাজিস্ট্রেট 'বেনিফিট অব ডাউট' দিয়ে আসামীদের মুক্তি দিলেন।

আদালতের এই বিচার নিয়ে অনেক লেখালেখি হল। নতুন লেখকদের পক্ষ থেকে 'জবানবন্দি' লিখলেন কল্লোলে কৃত্তিবাস ভদ্র ছদ্মনামে প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাতে তিনি বললেন; "নতুন লেখকেরা নাকি অশ্লীল।...

"তারা নাকি আবিষ্কার করেছে—পাপী পাপ করে না। পাপ করে মানুষ, বা আরো স্পষ্ট করে বললে মানুষের সামান্য ভগ্নাংশ; মানুষের মনুষ্যত্ব দুনিয়ার সমস্ত পাপের পাওনা অনায়াসে চুকিয়েও দেউলে হয় না!...

"মানুষের একটা দেহ আছে এই অশ্লীল কিংবদন্তীতে তারা নাকি বিশ্বাস করে এবং তাদের নাকি ধারণা যে, এই পরম রহস্যময় অপরূপ দেহে অশ্লীল যদি কিছু থাকে তো সে তাকে অতিরিক্ত আবরণে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেবার প্রবৃত্তি।" [দ্র° 'কল্লোল-যুগ', পৃ° ১৬৬-৬৭।]

অন্নদাশঙ্কর অচিন্ত্যকুমারকে এক পত্রে লিখলেন, "আমার মনে হয় মিথুনাসক্তি নিয়ে আরেকটু ব্যাপক ভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। হঠাৎ একই যুগে এতগুলো ছোট-বড়-মাঝারি লেখক মিথুনাসক্তিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিতে গেল কেন? দেখে শুনে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর লেখক-মাত্রই যেন Keats-এর মত বলতে চায়, 'I felt like some watcher of the skies when a new planet swims into his Ken.' আলিবাবার সামনে যেন পাতালপুরীর দ্বার খুলে গেছে। 'শোনো শোনো অমৃতের পুত্রগণ, আমি জেনেছি সেই দুর্বার প্রবৃত্তিকে, যে প্রবৃত্তি সকল কিছুকে জন্ম দেয়, সে প্রবৃত্তিকে স্বীকার করলে মরণ সত্ত্বেও তোমরা বাঁচবে—তোমাদের থেকে যারা জন্মাবে তাদেরি মধ্যে বাঁচবে। অসার এই সংসারে কেবল সেই প্রবৃত্তিই সার, অনিত্য এই জগতে কেবল সেই প্রবৃত্তিই নিত্য।'—এ যুগের ঋষিরা যেন এই তত্ত্বই ঘোষণা করেছেন। * * * Sexকে আমরা বিস্ময়সহকারে প্রণাম করবো, আদিম মানব যেমন করে সূর্যদেবতাকে প্রণাম করতো।" ['কল্লোল-যুগ', পৃ° ১৬৯-৭০]

বলা বাহুল্য, প্রশ্নটি নূতনও নয়, একটি বিশেষ যুগের বিশিষ্ট চেতনামাত্রও নয়। প্রশ্নটি শিল্পসৃষ্টির আদিযুগ থেকেই আছে। শুধু শিল্পসৃষ্টিই বা বলি কেন, সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই ওটি মানুষের সহযাত্রী। যুগে যুগে দৃষ্টিভঙ্গি পালটায়। এ সম্পর্কে সমাজমানস কখনও রক্ষণশীল, কখনও প্রগতিশীল। এবং এ বিষয়ে দেহধর্ম ও নীতিধর্মের মীমাংসাহীন সংগ্রামের ফলশ্রুতি হল এই যে, সুস্থ যৌনবোধ জীবনবোধেরই সহোদর। যেখানে বিকার, যেখানে উৎকেন্দ্রিকতা সেখানেই আপত্তি। বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী ভগবানের কান্না যদি শিল্পী সত্যসত্যই নিজের কানে শুনতে পান, আর যদি তাঁর সুস্থ ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তাহলে তাঁর চেতনায় মিথুনাসক্তি জীবনীশক্তিরই মূলীভূত প্রেরণা বলে স্বীকৃত হবে। আমাদের তন্ত্রসাধনায় এই শক্তিই আদ্যাশক্তি বলে পূজিতা। যে দেশের মন্দিরে মন্দিরে যোনিপট্ট-ভেদকারী শিবলিঙ্গ বিরাজমান সে দেশের ঋষিরা সৃষ্টির এই সত্যকে পরমতত্ত্বরূপেই যে গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। তাঁরা সৃষ্টির এই মূল সত্যকে শুধু স্বীকার করেই আসেন নি, পূজোও করেছেন। কাজেই সেদিনকার তরুণ অন্নদাশঙ্কর যাকে এ যুগের ঋষিদের বাণী বলে ঘোষণা করেছেন আসলে তা সকল যুগের ঋষিদেরই বাণী।

কাজেই প্রতিপক্ষ বললেন, আপত্তি মিথুনাসক্তিতে নয়, আপত্তি তার বিকলাঙ্গ বিকৃতিতে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা' উপন্যাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ শনিবারের চিঠিও অস্বীকার করেছিল। কেন ? এ সম্পর্কে শনিবারের চিঠির বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। বলা হয়েছে :

"লেখক মানবজীবনের ভালো-মন্দ সুন্দর কুৎসিত সকল দিকের মধ্য দিয়া একটা চরিত্রের বিকাশ ও জীবনের পরিণাম চিত্রিত করিয়াছেন। জীবনকে যদি কেহ সমগ্রভাবে দেখিবার চেষ্টা করেন তবে কিছুই বাদ দিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহা হইলে তাহার সর্বাংশের একটা সামঞ্জস্য ধরা পড়ে। কু ও সু দুই মিলিয়া একটি অখণ্ড রাগিণীর সৃষ্টি করে, তাহা moralও নয় immoralও নয়—আরও বড়, আরও রহস্যময়।" [কল্লোল-যুগে উদ্ধৃত, পৃ° ১৬৩]

শনিবারের চিঠির বক্তব্যকে বহু রচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্টতর করেছেন সত্যসুন্দর দাসের ছদ্মনামে মোহিতলাল মজুমদার। সজনীকান্ত 'আত্মস্মৃতি'তে বলেছেন তাঁদের অভিযোগ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ছিল না ; তাঁদের অভিযোগ

ছিল বিকৃত যৌনবোধের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত জীবনবোধের বিরুদ্ধে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল ভানের বিরুদ্ধে, ন্যাকামির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কণীলেহনের বিরুদ্ধে।" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ২৬৮]

শনিবারের চিঠি সর্বক্ষেত্রে এই আদর্শ রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা তা অবশ্যই তটস্থ বিচারের অপেক্ষা রাখে। এবং সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিপক্ষকে কোমরবন্ধের অধোদেশে আঘাত করা হয় নি, এ কথা সজনীকান্তও নিশ্চয়ই হলফ করে বলতে পারতেন না। কেন না প্রেমে এবং যুদ্ধে নীতিবিগর্হিত বলে কিছু নেই। কাজেই প্রেমের দৃষ্টিতে নিজের এবং নিজের দলের অন্যান্যদের লেখায় নীতিবিগর্হিত কিছু ধরা পড়ে নি, আর শত্রুপক্ষের শিবিরে শিল্প পদেপদেই সংযমের সীমানা লঙ্ঘন করে গেছে।

চার

১৩৩৩ সালে শনিবারের চিঠির তিনটি মাত্র বিচ্ছিন্ন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পনেরোই জ্যৈষ্ঠ 'জুবিলী সংখ্যা', আষাঢ়ে 'বিরহ সংখ্যা' এবং কার্তিকে 'ভোটসংখ্যা'। জুবিলী সংখ্যা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিয়ে। ভোট সংখ্যা নির্বাচন নিয়ে, আর বিরহসংখ্যা সমকালীন সাহিত্য নিয়ে। ওতে কেবলরাম গাজনদার নাম নিয়ে সজনীকান্ত লিখলেন "Orion বা কালপুরুষ" নাটিকা, আর অশোক চট্টোপাধ্যায় লিখলেন 'শুভগ্রহ' ছদ্মনামে দুই অঙ্কের নাটক "স্বর্গে Sensation !", এবং শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল ছদ্মনামে "বিরহ-বেদনা-বিশ্লেষণ" নামে কবিতা। তিনটি রচনাই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শনিবারের চিঠিতে পরবর্তী কালে 'অত্যাধুনিক' সাহিত্য নিয়ে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বান ডেকেছিল এই রচনাত্রয়ে তারই প্রথম কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে।

সজনীকান্তের "Orion বা কালপুরুষ" নাটকটি তাঁর 'মধু ও হুল' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সৃষ্টিধর্মী রচনার দ্বারাই যে সৃষ্টিধর্মী রচনাকে তীব্র ও প্রচণ্ড ব্যঙ্গ করা যায়, 'কালপুরুষ' তার সার্থক উদাহরণ। নাটকের 'অবতরণিকা'য় লেখক বলছেন, "পুরাতনের দিন চলিয়া গিয়াছে; ক্রিমিনলজী ও সাইকোএনালিসিসের শুষ্ক পাতায় যৌন-সম্বন্ধীয় থিওরিগুলি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমরা সরস নাটকে তাহাদিগকে সজীবভাবে জগতের সম্মুখে

ধরিতে চাই।" বলাই বাহুল্য, বক্রোক্তিটি উপাদেয়, এবং ঈষৎ পীড়নের দ্বারা এখানে যে 'কৌতুকরস' পরিবেষিত হয়েছে পাঠকচিত্তে তার আবেদন অমোঘ। পাঁচটি দৃশ্যে নাটকটি শেষ হয়েছে। প্রথম দৃশ্যের শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন, "দেখিতেছি প্রথম দৃশ্যটি জ্যৈষ্ঠের কল্লোলে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের একটি গল্প 'রজনী হল উতলা' ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কোনো এক উপন্যাসের ঘটনাবিশেষ লইয়া রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে।" দ্বিতীয় দৃশ্যে পাঁচকড়ি দে প্রণীত একটি চমকপ্রদ ডিটেকটিভ উপন্যাসের এক অধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'পাপের ছাপ' নামক উপন্যাসের কোন ঘটনা লইয়া রূপ পরিগ্রহ করিতে চাহিতেছিল কিন্তু "স্থানাভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারিল না।" তৃতীয় দৃশ্যে নরেশচন্দ্রের 'বিপর্যয়', চতুর্থ দৃশ্যে তাঁরই 'শাস্তি', এবং পঞ্চম দৃশ্যে মন্মথ রায়ের 'সেমিরামিস' নাটকের ছায়া পড়েছে। কালপুরুষ শেষ করে 'শেষের কথা'য় লেখক ব্যাজস্তুতিকে সম্বল করে বিনীত ভাষণে বললেন, "স্থানাভাবে নাটকটির নানা স্থলে মনস্তত্ত্বমূলক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভবপর হইল না। তবে এই সূত্রে, নরেশবাবু, চারুবাবু প্রভৃতির উপন্যাস ও কল্লোল ও কালিকলম সম্প্রদায়ের লেখা পাঠ করিতে সকলকেই অনুরোধ করি। তাহাতে অনেক দুর্বোধ্য স্থান পরিষ্কার হইয়া যাইবে, এখানে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

শনিবারের চিঠির আক্রমণের রীতি ও পদ্ধতি কি হবে তারই যেন আভাস পাওয়া গেল 'কালপুরুষ' নাটকে।

কিন্তু বিরহসংখ্যা শনিবারের চিঠি প্রকাশের পাঁচ মাস পরে আসরে অবতীর্ণ হলেন তৃতীয় পক্ষ। পৌষ মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অমল হোম "অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য" প্রবন্ধ পাঠ করলেন। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। প্রবন্ধটি মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হল। অমল হোম একেবারে মধুচক্রের মধ্যবিন্দুতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বললেন :

"এ কি কৃত্রিম ভাববিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাবিহীন অনুভূতির মায়াকান্না বাংলা কথাসাহিত্যকে পাইয়া বসিল।"...

"যে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক প্রেমবিলাস বাংলার অতি-আধুনিক কথা-

সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার চাপে নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"...

"সতেরো বৎসর বয়সেই যে অজাতশ্মশ্রু তরুণের 'একটুখানি শাড়ীর আঁচল দেখলেই বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, একটু চুড়ির রিণিঝিনি শোনবার জন্যে মনটা তৃষিত হয়ে থাকে, এবং কাঁচা বয়সের মেয়ে দেখলেই ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে ইচ্ছে হয়', তার দেহমনের স্বাস্থ্য যে অটুট আছে, এ কথা কি করিয়া বলিব ?"...

"আমাদের এই নব কথাসাহিত্যের 'রিয়ালিজম' আমরা য়ুরোপ হইতে আমদানি করিয়াছি,—সেখানকার সাহিত্য হইতে এই পরগাছাটি রস ও জীবনীশক্তি আহরণ করিতেছে। তাহার শক্তি তাই ক্ষীণ, তাহার গতি তাই আড়ষ্ট, এবং অসুস্থতায় তাই তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি আড়ষ্ট।"...

"বাস্তবতার এই ঢেউ আমাদের সমাজ-জীবনের কয়েকটি সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। * * * তাহার ফলে এক ধরণের বাস্তব গল্প শুধু বাহিরের জিনিষ—কুলী ধাওড়া, কামিন্‌দের বস্তী, ছেঁড়া চট, দুর্গন্ধময় নর্দমা, পঙ্কিল পথ, অস্বাস্থ্য, কলহ—লইয়া আরম্ভ ও শেষ হইল।"...

"যৌন সম্বন্ধীয় বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে আইনে দণ্ডনীয় কতকগুলি সমাজ-সংস্থান-বিরোধী ব্যাপারও আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অতি রুচিকর উপাদান বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।"...

"লেখকেরা ভাবিতেছেন, আমাদের সমাজ-জীবনের আনাচে কানাচে যে পাপ ও অন্যায় নিত্য অভিনীত হইতেছে, তাহাকেই হুবহু চিত্রিত ও প্রতিবিম্বিত করিতে পারিলেই বুঝি বাস্তব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। সেইজন্যই আর্টের মর্যাদা-রক্ষা অপেক্ষা পাঠকের কাছে বিবৃত ঘটনাকে রসালো করিয়া তুলিবার চেষ্টাই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে—লালসার ফেণিলোচ্ছ্বসিত উদ্দাম বিলাসশালায় নারীমাংসলোলুপদের আমন্ত্রণের ইঙ্গিতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়-বুভুক্ষার বিস্তৃত বিবরণে নব-কামায়ন বিরচিত হইতেছে।"

"পশ্চিম হইতে অনুকূল বাতাস আসিয়া যদি তাহার পালে হাওয়া লাগাইয়া দিকে দিকে তাহার যাত্রা শুরু করিয়া দিত, তাহা হইলে বাংলার নব কথাসাহিত্য হয়তো একদিন জগতের সাহিত্য-সংগম-তীর্থে আসিয়া তরী ভিড়াইতে পারিত। কিন্তু 'Continental' কথাসাহিত্যের মোহে আবিষ্ট

হইয়া সে পথ বুঝি বা অবরুদ্ধ হইয়া গেল ; এবং শুধু একপ্রকার সৌখীন প্রেমের গল্প, নয় যৌনলীলার গল্প,অথবা কলকারখানার কুলিমজুরের জীবনের বাহিরের দিকটার গল্পই আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের সমস্তটুকু জুড়িয়া রহিল।"

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের স্বরূপ-নির্ণয়ে অমল হোম তাঁর সাংবাদিক-মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি প্রয়োগ করে বক্তব্যটি প্রাঞ্জল করে তুললেন। উপসংহারে 'ভরত-বচন' উচ্চারণ করে তিনি বললেন, "আমাদের বর্তমান 'তরুণ' সাহিত্যিকেরা নন্—ভবিষ্যতে তারুণ্যের জয়টীকা পরিয়া যাঁহারা আসিতেছেন, যাঁহারা শুদ্ধ শুচি, সংযমে শক্তিমান, যাঁহারা আজিকার মাসিক-পত্রিকার সহজ সম্মানে প্রলুব্ধ হইবেন না, যাঁহাদের সাহিত্য-সৃষ্টিতে শুধু রক্তমাংসের তাড়নাই প্রকাশ পাইবে না, শুধু য়ুরোপীয় সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ দেখা যাইবে না, যাঁহারা মানুষের জীবনকে আর্টের পূজাবেদীতে নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করিবেন—আমরা তাঁহাদের আগমন-আশায় অপেক্ষা করিতেছি, বাংলা কথাসাহিত্যের ভবিষ্যৎ তাঁহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ তাঁহাদের আমরা পূর্বাহ্ণেই অভিনন্দিত করি ; তাঁহারা আসিয়া বাংলা কথাসাহিত্যকে ক্লেদ-পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করুন, তাঁহাদের স্পর্শে সমস্ত প্রগল্‌ভ কল্লোল নীরব হউক, ঝরণার পঙ্কিল আবর্তন স্তব্ধ হউক, কালিকলমের কলঙ্ক-কালিমা শুভ্র শুচিতায় স্নিগ্ধ হউক,..."

অমল হোমের বলিষ্ঠ কণ্ঠ যে ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পরবর্তী ইতিহাসে। সজনীকান্ত বুঝেছিলেন আদালতের বিচারে আইনের সমর্থন লাভ করে এ সমস্যার সমাধান হবে না। সারস্বত-তীর্থকে আবিলতা থেকে মুক্ত করতে হলে তীর্থগুরুর শরণ নিতে হবে। তাই তিনি ফাল্গুন মাসে কবিগুরুর কাছে লিখিত এক দীর্ঘপত্রে পথনির্দেশের প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনা নয়, রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে আহ্বান।

পাঁচ

১৩৩৩ সালের ২৩শে ফাল্গুন সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন। তাতে তিনি লিখলেন :

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণামনিবেদনমিদং

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলাদেশে এক ধরণের লেখা চল্‌ছে, আপনি লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দু'টি

কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরণের লেখা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গদ্যের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আস্‌ছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ ক'রে চলে না। কবিতা, Stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না; গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেম্‌নি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরণের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature-এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি প'ড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণত প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য ব'লে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে-সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান ক'রে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার-শ্রেণীভুক্ত ব'লে প্রচার কর্‌বার একটা চেষ্টা দেখি। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ব'লে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের (ফাল্গুন) কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি, 'কালি কলমে' নজরুল ইস্‌লামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। আপনি এসব লেখার দু' একটা প'ড়ে থাকবেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে 'শনিবারের চিঠি'তে এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোনো প্রবলপক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট করে আস্‌ছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্যপথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত কর্‌ছি।

আমি জানি না, এই সব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি। নরেশবাবুর কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যাজস্তুতি না সত্যিকার প্রশংসা, বুঝ্‌তে পারি না। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা ব'লে মনে করি। বাঙলা সাহিত্য যথার্থ রূপ নেবার

পূর্বেই এই ধরণের লেখার মোহে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে, আমার এই ধারণা। সেইজন্যে আপনার মতামতের জন্যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা প্রয়োজন।

আপনাকে আজ এই চিঠি লেখার একটি কারণ—(কার্তিকের) ভারতীতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধ "সাহিত্যে শুচিবিকার।" এই প্রবন্ধটিকে এই সম্প্রদায়ের লেখকগণ ইতিমধ্যেই নজির স্বরূপ দাখিল করেছেন। সেই প্রবন্ধটি আমি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আজ দশ বৎসর ধরে আপনার লেখা পড়ে আমার ধারণা হয়েছে আপনি সাহিত্যে শ্লীলতার গণ্ডী পার হয়ে যাওয়ার পক্ষে নন। আপনার লেখার এমন কোনো জায়গা আমি দেখিনি যেখানে আপনার চিত্রিত চরিত্র সংযম হারিয়েছে। ঠিক যতটুকু পর্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন, ততটুকুর বেশী আপনি কখনও যাননি। অথচ যে সব জিনিষ নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন সেইসব জিনিষই আধুনিক এই লেখকদের হাতে পড়্‌লে কি রূপ ধারণ কর্‌ত ভাব্‌লে শিউরে উঠ্‌তে হয়। 'একরাত্রি', 'নষ্টনীড়' ও 'ঘরে বাইরে' এরা লিখ্‌লে কি ঘট্‌ত—ভাব্‌তে সাহস হয় না।

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্ভবত আপনি নিজে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' লিখেছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'উমা' নামক উপন্যাসের সমালোচনায় তাতে লিখিত আছে—"সুনীতির হিসাবে এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারি না। বিনোদিনী ও যোগেশ্বর সম্বলিত যে চিত্র গ্রন্থকার আমাদিগকে দেখাইয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক নহে—এমন অবস্থায় এমন ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটে। কিন্তু পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই।...কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা? তাই আবার পাঁচকড়ি-বাবুর ন্যায় ক্ষমতাশালী লেখকে করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য!...যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে?"

এই চিঠির উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য যদি আমার হয় তাহলে সেটি প্রকাশ কর্‌বার অনুমতি আমি আপনার কাছে চেয়ে রাখছি।

আপনার নিকট এভাবে জবাব দাবী করতে গিয়ে যদি কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে থাকি তাহ'লে এই ভেবে ক্ষমা কর্‌বেন যে, আমি একা নই—আমার এই চিঠিতে আমি অন্ততঃ আমার পরিচিত কুড়ি বাইশ জন সাহিত্যসেবীর

মনোভাব ব্যক্ত করেছি। ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষা বলে হেলা পায়। আপনি কথা বল্‌লে আর যাই বলুক, ঈর্ষার অপবাদ কেউ দেবে না।

আমার প্রণাম জান্‌বেন।

প্রণত শ্রীসজনীকান্ত দাস

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে সঙ্গে সঙ্গেই লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু,

কঠিন আঘাতে একটা আঙুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরুচে না। ফলে বাক্‌সংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখ্‌তে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হ'তেও পারে। আলোচনা করতে হ'লে সাহিত্য ও আর্টের মূল তত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্র দৃষ্টির প্রভাব প্রবল—তাই এখন বাগ্‌বাত্যার ধূলো দিগ্‌দিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বল্‌বার বল্‌ব। ইতি ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের ভাষ্য করে 'কল্লোল-যুগে' অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, "রসিকতাটা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই সরাসরি খারিজ করে দিলেন আর্জি।" [পৃ° ১২৭]। বলাই বাহুল্য, পরবর্তী ইতিহাস অচিন্ত্য-কুমারের এই মন্তব্য সমর্থন করছে না। রবীন্দ্রনাথ 'আর্জি' তো 'খারিজ' করে দেনই নি, বরং তিনি অমল হোম ও সজনীকান্তের বক্তব্যকেই সমর্থন করলেন। ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'অভিজাত' মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হল। বিচিত্রার দ্বিতীয় সংখ্যায়, অর্থাৎ ১৩৩৪-এর শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'সাহিত্যধর্ম' নামক প্রচণ্ড-বিতর্কসৃষ্টিকারী প্রবন্ধটি। 'সাহিত্যধর্ম' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক আর অনাধুনিক দুই দলে প্রবল বাদানুবাদ শুরু হল। সুতরাং 'সাহিত্যধর্মে' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায়

যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ

এক

'সাহিত্যধর্মে' রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব তথা সাহিত্য-দৃষ্টির স্বরূপ নির্ণয় করলেন। রাজকন্যা সম্পর্কে কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র এবং রাজপুত্রের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখিয়ে তিনি বললেন, "বস্তুত রাজকন্যা বলে যে একটি সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।"

"কোটালের পুত্রের ডিটেকটিভ-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। করতে করতে নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়ে ; রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণ থেকে মনস্তত্ত্ব। · "

"আর-এক দিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, সুতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রশ্ন ; আছে মুনফার হিসাব।"

"রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন—অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েছেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে।"

সাহিত্য-রাজকন্যা সম্পর্কে রাজপুত্রের দৃষ্টিভঙ্গিই যথার্থ সাহিত্য-দৃষ্টিভঙ্গি,—এই হল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রথম সূত্র। এই সূত্রকে বিশদতর করে কবিগুরু বললেন," যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞানির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, 'তুমি কেন।' সে বলে, 'তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট।' রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বলবার জন্যে সাজাহানকে তাজমহল বানাতে হয়েছিল।" সাহিত্য-শিল্পীরাও এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে

সাহিত্যশিল্পের নব নব তাজমহল রচনা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারে এই তত্ত্বটি নূতন-কিছু নয়। অপ্রয়োজনের আনন্দই যে সাহিত্যের উপজীব্য, এ কথা তিনি সর্বদাই বলেছেন।

এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, জীবধর্মে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রবল। কিন্তু এই শিশ্নোদরপরায়ণতা মানুষের জৈবধর্মের সীমানাতেই আবদ্ধ। যেখানে তার মানবধর্মের সাধনা সেখানে বুভুক্ষা ও রিরংসা এই দুটি আদিম প্রবৃত্তি মর্যাদা পায় নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, পেট-ভরানো ব্যাপারটাকে মানুষ যেমন তার কলালোকের অমরাবতীতে স্থান দেয় নি, তেমনি স্ত্রী-পুরুষের মিলন-ব্যাপারের জৈব দিকটিও সেখানে অপাঙ্‌ক্তেয়। তা ছাড়া স্ত্রীপুরুষের দেহমিলন মানবচেতনায় মনের মিলনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়ে আছে। "প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তোলে।"

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, জীবনে ও সাহিত্যে যৌনমিলনের স্থান কি ও কতটুকু। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা 'প্রজনার্থং' নয়, কেন না সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজনা আদায়ের দাবি ক'রে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা চলছেই।" আধুনিক সাহিত্য বলতে এখানে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ভাবে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের কথাই বলছেন। বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যধর্মকে সমাজধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন নি। সাহিত্য সামাজিক মানুষের সৃষ্টি, সামাজিক মানুষেরই জন্যে—এ কথা মেনে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যশিল্পীকে সমাজসংস্কারক বা শিক্ষাগুরুর আসনে বসাতে প্রস্তুত নন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রয়োজনাতীত আনন্দসৃষ্টিই সাহিত্যের লক্ষ্য। লোকহিতের আদর্শ সেখানে গৌণ। তাই তিনি বললেন, "সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ, যৌনমিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলংকৃত করে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায়, সেইটিই হল বিচার্য।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ

বিশুদ্ধ সাহিত্যের আদর্শকে সামাজিক অনুশাসনাবলী দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষপাতী নন। সাহিত্যের ধর্ম বা সাহিত্যের সত্যবিচারে সাহিত্য-জগতের নিয়মাবলীকেই প্রাধান্য দিতে হবে, এই তাঁর মত।

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যে যৌনমিলনের প্রাদুর্ভাবকে সাহিত্যস্রষ্টার লালসার ফল বলেও স্বীকার করতে চান নি। তিনি একে বলেছেন বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল কথাটি বিশদীভূত করলে দেখা যাবে এর দুটি অর্থ আছে। একটি হল সামগ্রিক ভাবে এ যুগের মানবচিত্তের উপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব। আরেকটি হল এ যুগের ফ্রয়েড ও তাঁর উত্তরসূরিবৃন্দের মনঃসমীক্ষণবিদ্যার প্রভাব। যৌনমিলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যখন বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের প্রশ্ন তোলেন তখন কথাটি দ্বিতীয় অর্থাৎ বিশেষ অর্থেই প্রযোজ্য। তিনি বলেন, "আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্টোরেশন-যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু, সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটিকা চিরদিনের মতো পায় নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টি঳কতে পারে না।"

আধুনিক সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতার প্রাদুর্ভাব বৈজ্ঞানিক কৌতূহল-সঞ্জাত,—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সাহিত্যিকদের দাবি সম্ভবত এখানেই। তাঁরা বলবেন, আধুনিক যুগের সমস্ত জিজ্ঞাসাই যখন গবেষণাগারে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আলোকেই উত্তর খুঁজে পাচ্ছে তখন নরনারীর দেহসম্পর্কও এই আধুনিক মানসিকতাকে অস্বীকার করতে পারে না। তা ছাড়া মনঃসমীক্ষকগণ মানবমনের নির্জ্ঞানলোকে যে-রহস্যময় জগতের আবিষ্কার করেছেন, তার কথা এ যুগের শিল্পীরা ভুলে থাকবেন কি করে? মানবমনের সেই অনাদি অন্ধকারে আত্মগোপনকারী সেই আদিম পশুকেই বা তাঁরা কি করে অস্বীকার করবেন? ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের প্রেমচেতনার একেবারে মর্মমূলেই যে আঘাত হেনেছে। আদিম লিবিডোকে নিয়ে মানুষের মনোলোকে ইদং, অহং ও অধিশাস্তার যে অনাদ্যন্ত সংগ্রাম চলছে, আধুনিক শিল্পীর দৃষ্টি মানবমনের সেই মর্মমূলে প্রবেশ করে সেই মহাকুরুক্ষেত্রকেই করেছে তার সাহিত্যের উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। এই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল সাহিত্যকে বে-আব্রু করে তুলেছে, রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ সেখানেই। এ অভিযোগ

শুধু বাংলা সাহিত্যেরই বিরুদ্ধে নয়, কবিগুরুর এই অভিযোগ আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের বিরুদ্ধে।

আধুনিক সাহিত্যের এই বৈজ্ঞানিক কৌতূহলকে তিনি সাহিত্যদৃষ্টি বলে স্বীকার করে নেন নি। এটিকে তিনি রাজকন্যা সম্পর্কে কোটালপুত্রের মনোভাব বলেছেন। কোটালপুত্রের এই ডিটেক্‌টিভ-বুদ্ধির জেরায় সাহিত্য-রাজকন্যার নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়েছে, রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণ থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু সাহিত্য-রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে। সে হৃদয় কোটালপুত্র বা সওদাগরপুত্রের নেই। আছে কেবল রাজপুত্রের। আর পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মতে রাজপুত্রের দৃষ্টিই সত্যকার সাহিত্যদৃষ্টি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য এই বিশুদ্ধ সাহিত্যদৃষ্টি থেকে বিচ্যুত হয়েছে—এই হল রবীন্দ্রনাথের প্রধান অভিযোগ। তাই প্রবন্ধশেষে তিনি বললেন :

"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ-কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য ; যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।"

এই অনভিজাত বে-আব্রুতা, বিজ্ঞানমদমত্ত এই নির্বিচার অলজ্জতা যে সাহিত্যের বসন্তোৎসবে হোলি-খেলার নামে পঙ্ককেলি মাত্র, এই তত্ত্বকেই উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে কবি বলছেন, "এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকান ধুলো-মাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক করে তুলে তাই চিৎকারশব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব বলে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না, এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্যকারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু, মানুষের রসবোধই যে উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত

করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসংগত বলেই আপত্তি করব, অসত্য বলে নয়।" অর্থাৎ, কবি বলছেন, চিৎপুরের পঙ্ককেলিতে যে অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা আছে সাহিত্যক্ষেত্রে যখন তার প্রাদুর্ভাব ঘটে তখন সকল মানুষকে মলিন করাই হয় তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। এই বর্বর মানসিকতা অসত্য না হতে পারে, কিন্তু তা অসঙ্গত। তাই তিনি বলেন :

"সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি। এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাতলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচোখচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে, তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কি না, যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সংগীত কি না। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে এক রকম উল্লাস হয়; কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্যহীন এই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ বলে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয়।"

'রসের হোলিখেলায় কাদামাখামাখির পক্ষ' যে অসমর্থনীয়, এই কথাই প্রবন্ধের শেষ কথা। চিৎপুর রাস্তার প্রমত্ত পৌরুষ যে সাহিত্যের অমরপুরীর সুস্থ মনুষ্যত্ব নয়, এই সিদ্ধান্তই 'সাহিত্যধর্মে'র ফলশ্রুতি। তাই প্রবন্ধের উপসংহারে কবি বললেন, "বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের" যে অধিকার দাবি করছে তার দ্বারা নিত্য-সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব। সাহিত্যক্ষেত্রে এই বে-আব্রুতা, সাহিত্যলক্ষ্মীর এই বস্ত্রহরণের দুঃশাসনীয় মনোবৃত্তি সর্বভাবে নিন্দনীয়।

দুই

আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমস্তটা 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় নি। প্রবন্ধটি রচিত হয় ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে [১৯২৭ জুলাই-এ]। প্রবন্ধ রচনার অব্যবহিত পরেই তিনি মালয় ও দ্বীপময় ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। এই পরিক্রমা শুরু হয় বারোই জুলাই, আর শেষ হয় সাতাশে অক্টোবর [১০ই কার্তিক ১৩৩৪]। এই বৃহত্তর ভারত

ভ্রমণে যাঁরা কবির সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুনীতিকুমার 'শনিবারের চিঠি'র আদর্শ ও নীতির সমর্থক। তাঁর সঙ্গ কবিমানসে কি ভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল জানা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। তারই ফলে রচিত হয় 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি। জাভা থেকে বালি যাবার পথে প্লান্‌সিউজ জাহাজে 'যাত্রীর ডায়ারি' আকারে প্রবন্ধটি ভাদ্র মাসে (২৩ আগস্ট ১৯২৭) রচিত হয়। পরে প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য, 'সাহিত্যে নবত্ব' 'সাহিত্যধর্মে'র পরিপূরক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, অরিজিন্যালিটি।" আর, তাঁর মতে, অরিজিন্যালিটি হল চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করা। নবীন লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি এই শক্তির প্রকাশ দেখেছিলেন। এটি যে 'বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ', এবং এঁদের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের যে "বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায়" আছে সে কথা স্বীকার করে তিনি বললেন, "আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নি, একথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বার বার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরি নেই। অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; বোঝা যায় যে, বঙ্গ-সাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হই নে।" [প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, পৃ° ২১৫]।

এখানে রবীন্দ্রনাথ যাকে 'একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ' বলেছেন, ইংরেজি সাহিত্যে তার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল ১৯১০-১৯১৪ সনের মধ্যে। ১৯০০ থেকে ১৯৫০—এই 'পঞ্চাশ বৎসরের ইংরেজি সাহিত্য' সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্কট-জেমস্ তাঁর 'Fifty years in English Literature'* গ্রন্থে এই

যুগলক্ষণটিকে স্পষ্টতর ভাষায় প্রকাশ করে বলেছেন, "It was an exciting age for writers—an age which marked a definite break with the past, a challenge to authority, an assertion of the right to be anarchistic in thought and form—romantic, realistic, passionate—a self-conscious age when writers were intensely critical of the composition of society, and were beginning to be critical of the composition of the individual soul." [পৃ° ১৩]

বাংলা সাহিত্যে এই 'নব অভ্যুদয়' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তিনি এর মধ্যে 'শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তি'র যেমন পরিচয় পেয়েছিলেন তেমনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই আন্দোলন দেশের জল-হাওয়া-মাটি থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উদ্ভূত নয়, এর অনেকখানিই ছিল বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ। এই জন্যেই তিনি এর মধ্যে 'কৃত্রিমতা' লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি বললেন,

"শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল করে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গিতে কেবল জলের নিচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধিগতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই বলেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ করে রাখে।"

হাল-আমলের নূতনত্বের এই বাঁধি বুলিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বলেছেন, 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। বলেছেন, "বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি করে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে; লঙ্কার গুঁড়ো বেশি-থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম শিশিতে-সাজানো বাঁধিবুলি আছে, অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।"

এখানেই আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা তুঙ্গশিখরে আরোহণ করেছে। 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' আর 'লালসার অসংযম'—এক কথায় শিশ্নোদরপরায়ণতা এ যুগের লেখকদের পাকশালার

শিশিতে-সাজানো কারি-পাউডর। রবীন্দ্রনাথ যদিও তাঁর বক্তব্যকে খানিকটা মোলায়েম করে বলেছেন, এ হল 'অপটু' লেখকদের পাকশালার কথা ; তবু শক্তিমান দু-একজনের কথা বাদ দিয়ে এই হল আধুনিক সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ।

দারিদ্র্য-বেদনার স্থান সাহিত্যে নেই, এ কথা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ বলেন নি। তরুণদের অগ্রগণ্য শৈলজানন্দের গল্প সম্পর্কে তিনি অকুণ্ঠ ভাষাতেই বলেছেন, "শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকে নি। 'নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখি নি ·দরিদ্রনারায়ণের পূজারীর মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডরি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি।" [প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, পৃ° ২১৭]।

এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে, 'দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা' যেখানে আছে সেখানে রচনা যে মহৎ সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। তাঁর আপত্তি 'কৃত্রিমতা'য় ; তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তৎকালীন সাহিত্যে 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' 'একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে।' এই চোখ-ভোলানো ভঙ্গিসর্বস্বতাই তাঁর দৃষ্টিতে ভর্ৎসনীয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সাহিত্যসৃষ্টিতে দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রশংসনীয় একটি উদাহরণ দিয়েছেন স্কট-জেমস তাঁর গ্রন্থে। চার্লস এফ. জি. মাস্টারম্যান ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট বিদ্যার্থী। ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অসামান্য সম্ভাবনা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ক্যাম্বারওয়েলের বস্তিতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই তিনি মেহনতি মানুষের জীবনকে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের সে-যুগের সাহিত্যে মাস্টারম্যানের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এঁরা, কবির ভাষায়, শুধু ভঙ্গি দিয়েই চোখ ভুলিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই দুটি প্রবন্ধ—'সাহিত্য ধর্ম' এবং 'সাহিত্যে নবত্ব'—আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর প্রধান আপত্তি আধুনিক যুগের বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তিভঙ্গী সম্পর্কেই। বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে যে অলজ্জ বে-আব্রুতা সাহিত্যে দেখা দিয়েছে তিনি তাকে নিত্য-সাহিত্যের লক্ষণ বলে মনে করেন নি। ভঙ্গিসর্বস্ব কৃত্রিমতা-দোষদুষ্ট বলেই 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' তাঁর কাছে নিন্দনীয় হয়েছে। 'লালসার অসংযম' কথাটি তিনি ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু রেসটোরেশন যুগের লালসা থেকে এ যুগের যৌনচেতনাকে তিনি পৃথক করেই দেখেছেন। তিনি একে বলেছেন সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ-সঞ্জাত অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি। তাই 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি বললেন, "আমি দেখেছি, কেউ কেউ বলছেন, এই সব তরুণ লেখকদের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে বলেই এই রকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছেন তার প্রধান কারণ, এটাই সহজ।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি সস্নেহ সহানুভূতিই প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু সত্য খরখড়্গসম নির্মম। সে-যুগের তরুণ লেখকদের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটে নি—এ কথা কিছুতেই বলা যাবে না। 'কল্লোল যুগে'র লেখক মঞ্জুভাষী। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের নিষ্ঠুর সত্যভাষণ তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। তিনি সে যুগের তরুণ লেখকসম্প্রদায়ের স্বপ্ন ও আদর্শকেই ভাষা দিয়েছেন, কিন্তু বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করতে পারেন নি। 'কল্লোল যুগে'র তরুণ সাহিত্যিকদের জীবনচর্যায় যে অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল সেকথা স্বীকার না করলে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। কিছুই-না-মানা এক বেপরোয়া বোহেমিয়ান ভাব ছিল সে যুগের নবীন সাহিত্যের যুগলক্ষণ। নিশামুখে মদ্যপান এবং বারবনিতাবিলাস ছিল তরুণ সাহিত্যিকদের অনেকেরই প্রায় নিত্যকৃত্য। শুচিশীলন যে চারুশীলনের অপরিহার্য অঙ্গ এ কথা তাঁরা মানতে চান নি। আমাদের দেশের মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ আলংকারিক রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় 'কবিচর্যা' পর্যায়ে বলেছেন, 'শুচিশীলনং হি সরস্বত্যাঃ সংবননম্ আমনন্তি।' শুচিশীলনের দ্বারাই সরস্বতীর কৃপা লাভ করা যায়। 'কবিচর্যা'র এই আদর্শকে সে-যুগের তরুণ সাহিত্যিকগণ প্রমত্ত তাণ্ডবে পদদলিত করেছেন। তা ছাড়া তাঁরা ছিলেন দেশকাল থেকে বিচ্ছিন্ন এক কৃত্রিম জীবনচর্যার উপাসক।

তখন পরাধীন ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে। সাহিত্য সেই সংগ্রামকে অনুপ্রেরণা দেবে,—সেদিনকার দেশকালের এই দাবি ও প্রত্যাশা অন্যায় ও অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু সাহিত্য তখন উন্মার্গগামী, উৎকেন্দ্রিক। যখন বাংলার হাজার হাজার যুবক হয় স্বগৃহে অন্তরীণ, নয় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ, তখন বাংলার তরুণ সাহিত্যিকগণ ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় উচ্ছৃঙ্খল, এবং সাহিত্যে সেই বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকেই চরম সত্য বলে প্রচার করছেন: এ কাহিনী যেদিন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সত্যগ্রন্থিতে বাঁধা পড়বে সেদিন বাংলার ইতিহাস সে-যুগের তথাকথিত প্রগতিবাদী তারুণ্যকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'

এক

রবীন্দ্রনাথ দ্বীপময় ভারত পরিক্রমা শেষ করে ১৩৩৪ সালের কার্তিক মাসের প্রথমার্ধে [১৯২৭ সনের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে] দেশে ফিরে এলেন। 'সাহিত্য ধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব' নিয়ে তখন সাহিত্যিক মহলে তুমুল বাদানুবাদ চলছে। 'শনিবারের চিঠি'রও তখন যৌবনের পূর্ণ জোয়ার। কার্তিক মাসের 'শনিবারের চিঠি'র "মণিমুক্তা" বিভাগে কোন মহিলা কথাশিল্পী ছিলেন আক্রমণের পাত্রী। এই নিয়ে তাঁর লাঞ্ছনা সাহিত্যের আঙিনা থেকে সামাজিক দেহলিতে গিয়ে পৌঁছল। রবীন্দ্রনাথের কাছে নিশ্চয়ই অসহায় নারীকণ্ঠের আবেদন পৌঁছেছিল। ২৮শে কার্তিক এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে লিখছেন :

"কল্যাণীয়েষু—

তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে বড় বড় মহামহোপাধ্যায়ের পণ্ড পাণ্ডিত্যের বর্মচ্ছেদন যখন করো তখন তার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক মহিমা দেখতে পাই—তাতে খুশি হই—কিন্তু তোমাদের 'শনিবারের চিঠি'র সমরাঙ্গণে আহতদের মধ্যে কোনো নারীকে ধরাশায়িনী দেখলে আমার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না—তারা অপরাধিনী হ'লেও। নারীদের প্রতি পুরুষস্বভাবের অন্তর্গূঢ় করুণাই তার একমাত্র কারণ নয়—

আরো একটা কারণ আছে। তোমাদের হাতে মার খেয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকের যে লজ্জা সেটা সাহিত্যিক লজ্জা,—কিন্তু মেয়েদের লজ্জা তার উপরে আরো বেশি, সেটা সামাজিক। সিভিল ক্রিমিন্যাল দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখো, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে 'ছায়েবানুগতা', ওরা যদি দোষ করে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত ক'রে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তা হ'লে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময় স্থূল বস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখতে হয়—মেয়েদের অপরাধ তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো ব'লে মনে হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্মিণীর সহধর্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে, আগে আগে যে দুঃসহধর্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা ক'রে দেখো। ইতি ২৮শে কার্তিক ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির ভাষা লক্ষ্য করবার মত। তিনি বলছেন সজনীকান্তের বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে যখন বড় বড় মহামহোপাধ্যায়দের পণ্ড পাণ্ডিত্যের বর্মচ্ছেদন ঘটে তখন তিনি তার মধ্যে একটা 'মহাকাব্যিক মহিমা' দেখতে পান। তাতে তিনি খুশী হন। শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যে স্বভাবতই সজনীকান্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে কিছু লেখবার জন্যে আহ্বান করলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"কল্যাণীয়েষু—

দোহাই তোমাদের, 'শনিবারের চিঠি'তে আমাকে টেনো না। নিজে যদি সাহিত্যিক না হতুম তা হ'লে তোমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজি হতুম—কেন না আমার পক্ষে এটা ক্যানিবলিজ্‌ম্ দাঁড়ায়। 'প্রবাসী'তে এবার যেটা লিখেচি ["সাহিত্যে নবত্ব"] সেটাতেও হয়তো অনেকের গায়ে বাজবে—কারণ গায়ের শিরগুলো অনেকেরই টনটনে হয়ে রয়েছে। যৌবনের তীব্রতা গিয়ে অবধি আমার কলম প্রায় জৈনমতে চলতে চায়, এখন সময় অল্প ব'লেই সেই সময়টার গায়ে রক্তের দাগ লাগাতে সঙ্কোচ হয়—ধুয়ে ফেলবার অবকাশ পাব না। অল্প কটা দিন আছে—শেষ ব্যবহারের জন্যে স্বচ্ছ রাখতে ইচ্ছা করে।

তোমার হ'ল সার্জিকাল ডিপার্টমেন্ট, আর আমার আরোগ্যস্নানের মহল। তোমার বয়স যদি পেতুম তোমার ব্রতে যোগ দেওয়া সহজ হ'ত। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”

এই পত্রেও দেখা যাচ্ছে 'শনিবারের চিঠি'তে লিখতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না। কেবল ক্যানিবলিজ্‌ম্‌-এর অপরাধ থেকে আত্মরক্ষাই না-লেখার কারণ। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সজনীকান্তের হল 'সার্জিকাল ডিপার্টমেন্ট', আর তাঁর 'আরোগ্যস্নানের মহল'। তৎকালীন আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি অচিরেই আরোগ্যস্নানের আয়োজন করলেন। জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা ভবনে' বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উদ্যোগে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা-সভা আহ্বান করা হল। আলোচনা-সভা বসল দুদিন। ১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসের ৪ঠা ও ৭ই তারিখে।

কিন্তু তার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ২৩ পৌষ তারিখে লেখা এক পত্রে তাঁর মনোভাবকে বিশদতর করে তুললেন। পত্রখানি মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে মুদ্রিত হল। সুনীতিকুমারকে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

“কল্যাণীয়েষু,

প্রজা খাজনা বন্ধ করাতে সামরিক গোমস্তা ব্যোমযান থেকে বোমা বর্ষণ ক'রে খাজনা আদায় ক'রতে বেরিয়েছিল এমন একটা সংবাদ কিছু কাল পূর্বে শোনা গিয়েছে। আমার মনে হয় শনিবারের চিঠির সঙ্গে সেই শাসন-প্রণালীর কিছু একটু সাদৃশ্য আছে।

শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে। আর্ট পদার্থের একটা গৌরব আছে—তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো করলে তাকে খর্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্বজনীন মনুষ্যলোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা-গলিতে নয়। পৃথিবীতে উন্মার্গ-যাত্রার বড়ো বড়ো ছাঁদ, type আছে, তার একটা না একটার মধ্যে প্রগতিরও গতি আছে। যে-ব্যঙ্গের বজ্র আকাশচারীর অস্ত্র, তার লক্ষ্য এই রকম ছাঁদের 'পরে। এই type-এর অভিব্যক্তি নানা আকারে নানা দেশে নানা কালে,—এই

জন্যে, এ-কে যে-ব্যঙ্গ আঘাত করে তা আর্টিস্টের হাতের জিনিস হওয়া চাই, কেন না তাকে চিরকালের পথে যাত্রা করতে হবে। আর্ট যা'কে আঘাত করে তাকে আঘাতের দ্বারাও সম্মান করে। ক্ষুদে ক্ষুদে রাবণ অলিতে গলিতে বাস করে, সর্বদা হাটে বাটে তাদের বিচরণ, কিন্তু বাল্মীকির রামচন্দ্র ক্ষুদে রাবণদের প্রতি বাণ বর্ষণ করেন নি, যে মহারাবণের একদেহে দশ মুণ্ড বিশ হাত তার উপরেই হেনেছেন ব্রহ্মাস্ত্র।

তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাসিক সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে প'ড়ল এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো-আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো-আধো কথা নিয়েই গর্ব ক'রে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা", তখন বুঝ্‌তে পারি কচি ডাব অকালে ঝুনো হ'য়ে উঠেচে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে। স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে অস্থানে বাহাদুরী ক'রে বেড়ায়, "আমরা তরুণ, আমরা তরুণ" ক'রে আকাশ মাত ক'রে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে, বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে যে, এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য ব'লে গণ্য করি নে। চিরকাল দেখে এসেছি তরুণ জ্বর নিজেকে তরুণ ব'লে কম্পান্বিত ক'রে দেখায়, তরুণ স্বাস্থ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে।—আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মতো হ'য়ে উঠল, সে নিজেকে ভুল্‌চে না, এবং পাড়াসুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখ্‌চে যে, সে টন্‌টনে তরুণ, বিষফোড়ার মত দগ্‌দগে তার রঙ। শুধু তাই নয়, তরুণরা যে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপকপাড়া থেকে তার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা চল্‌চে। এর মধ্যে কৌতুকের কথাটা হচ্ছে এই যে, তারুণ্যটা হ'ল বয়সের ধর্ম, ওটা স্বভাবের নিয়ম,—ওটার জন্য রুশীয় সাহিত্য-শাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ ক'রে কাউকে এগজামিন পাশ করতে হয় না,—বিধাতার বিধানে ঐ বয়সটাতে মানুষ আপনিই আসে। কিন্তু আজকালকার দিনে তারুণ্যের বিশেষ ডিগ্রী-ধারীরা নিজেদের দুঃসহ তরুণতা সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের থীসিস্ লিখ্‌তে শুরু করেচে। তারা বল্‌চে আমরা তরুণ-বয়স্ক ব'লেই সবাই আমাদের সমস্বরে বাহবা দাও,—আমরা যুদ্ধ করেচি ব'লে না, প্রাণ দিয়েচি ব'লে না, তরুণ বয়সে আমরা যা-ইচ্ছে-তাই

লিখেচি ব'লে। 'সাহিত্যের তরফে বল্‌বার কথা এই যে, যেটা লেখা হয়েচে সাহিত্যের আদর্শ থেকে তাকে হয় ভালো নয় মন্দ বল্‌ব, কিন্তু তরুণ বয়সে লেখার একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া কর্‌তে হবে এ তো আজ পর্যন্ত শুনি নি। বাংলা দেশে সাহিত্যের বিচারে দুই-জাতের আইন, দুই-জাতের জুরি রাখ্‌তে হবে, একটা হ'চ্চে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের লেখকদের জন্যে, আর একটা বাকি সকলের জন্যে, এই বিধানটাই পাকা হবে নাকি? এখন থেকে লেখকদের কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে লেখার ভালোমন্দ ঠিক কর্‌তে হবে? কোনো তরুণ-বয়স্কের লেখার নির্লজ্জতাদোষ ধর্‌লে নালিশ উঠবে যে, সেটাতে কেবলমাত্র লেখার নিন্দা করা হোলো না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত তরুণ আছে সবাইকেই গাল দেওয়া হোলো। যা হোক্, আমার বক্তব্য এই যে, যথার্থ সাহিত্যের হাসি বিরাট্, দূরগামী! সে নিষ্ঠুর, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের উপরে নয়, হাস্যকর মানুষের পরে। ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিশেষ উক্তি সম্বন্ধে ভুল করার আশঙ্কা আছে, চিরদিন সে রকম হয়ে এসেচে, কিন্তু বহু মানুষ নিয়ে বিধাতা মাঝে মাঝে যে অদ্ভুত রসের অবতারণা করেন, তার মধ্যে একটা সর্বজনীনতা আছে। ডন্ কুইক্‌সোটে যদিচ য়ুরোপীয় মধ্যযুগের পিক্‌বিকে ইংরেজী বিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যিক হাসি ধ্বনিত, তবু সে-হাসি সকল মানুষের অন্তরের হাসি, কোনো দেশে তার সীমা নেই, কোনো কালে তার অবসান নেই। বাঙালী তরুণের স্বভাবে যদি কোনো হাস্যকরতা ব্যাপকভাবে এসে থাকে, তবে সাহিত্যে তার হাসি তেমনি বড়ো করে দেখা দিক, এই হচ্চে আমার সাহিত্যিক দাবী, এটা আমার সামাজিক দাবী নয়। তুমি তর্ক করবে সবাই সর্বান্টেস্ বা ডিকন্‌স্ হতে পারে না—সে তর্ক আমি মানিনে। সাহিত্যে বড়ো-ছোটোর ভেদ আছে, মূল আদর্শে ভেদ নেই। যার কলমেই সাহিত্যিক শক্তি দেখতে পাব তার কলমের কাছেই সাহিত্যিক দাবী করব—এই দাবীর দ্বারাই সাহিত্যের আদর্শ জোর পায়।

সাহিত্যের দোহাই ছেড়ে দিয়ে সমাজহিতের দোহাই দিতে পারো। আমার নিজের বিশ্বাস, "শনিবারের চিঠি"র শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্চে। যে সব লেখা উৎকট ভঙ্গীর দ্বারা নিজের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবত ক্ষণজীবীর আয়ু এতে বেড়েই যায়। তাও যদি না হয়, তবু সম্ভবত এতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আইনে প্রাণদণ্ডেরও বিধান আছে, প্রাণহত্যাও থামচে না।

ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবী আছে। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান,—নব-নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়। সে কাজ করবারও লোক আছে, তাদের কাগজী লেখক বলা যেতে পারে, তারা প্যারাগ্রাফ-বিহারী। ইতি ২৩ পৌষ, ১৩৩৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

"আর একটা কথা যোগ করে দিই। যে সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেচে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য তাকে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।"

এই পত্রেও রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার মধ্যে একটা অসামান্যতা আছে বলে স্বীকার করলেন। বললেন, এই ক্ষমতাটা আর্টের পদবীতে গিয়ে পৌঁছেছে। তা ছাড়া তারুণ্য নিয়ে তখনকার দিনে 'যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন' দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তা অট্টহাস্যের যোগ্য। তিনি আরও বললেন, "আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মতো হয়ে উঠল, সে নিজেকে ভুলবে না, এবং পাড়াসুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখবে যে, সে টন্‌টনে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপকপাড়া থেকে তার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা চলচে।" শেষের বাক্যটির ব্যঞ্জনা অনেকখানি। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার চন্দ এই সম্পর্কে তরুণদের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করার জন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। বোধ করি তারই ইঙ্গিত 'অধ্যাপকপাড়া থেকে প্রমাণপত্র সংগ্রহ করার' মধ্যে নিহিত আছে।

তাই, দেখা যাচ্ছে, সজনীকান্ত উত্তরোত্তর উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় আহ্বান করলেন আধুনিক সাহিত্য ও চিরন্তন সাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর অভিমত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে। সজনীকান্তের এই উৎসাহের কারণ বোধ করি এই ছিল যে, তিনি তাঁকে ও অধ্যাপক সুনীতিকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে বুঝতে পেরেছিলেন কবিগুরুর রায় তাঁদেরই পক্ষে যাবে। ফাল্গুনের দ্বিতীয়ার্ধে সজনীকান্তের লেখা পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ২০শে ফাল্গুন লিখলেন ;

"কল্যাণীয়েষু,

চেষ্টা করব কিন্তু কি রকম ব্যস্ত হয়ে আছি তা তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। এর ওপরে হিবর্ট লেকচার এখনো লিখতে বসতে পারি নি ব'লে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে।

তর্ক-বিতর্কের যে ঘোরতর আন্দোলন চলচে তাতে আরো ঠেলা মারতে ইচ্ছে করে না। আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত ক'রে দিয়েচে। যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্মুখের মুখোশ প'রে আমাকে ভয় দেখাচ্চে তা হলে মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেট-ভরে হাসব তারো সময় আমার নেই—চতুর্মুখ বোধ হয় সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু কতদিনের। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

এই পত্রের শেষ বাক্যের শেষাংশ তরুণদের পক্ষে মারাত্মক। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "চতুর্মুখ বোধ হয় এই সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু কতদিনের।"

দুই

বিচিত্রা ভবনের আলোচনা সভার প্রথম দিনে 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষীয় প্রতিনিধি কে কে উপস্থিত ছিলেন সঠিক জানবার উপায় নেই। সম্ভবত কেউই ছিলেন না। সজনীকান্ত লিখেছেন, "প্রথম দিন আমরা উপস্থিত ছিলাম না।" প্রথম দিনের বিবরণী ৬ই চৈত্রের 'বাংলার কথা' নামক দৈনিকে প্রকাশিত হয়। এই বিবরণী কল্লোল-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কারও লেখা হওয়াই সম্ভব। এই বিবরণী পড়ে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ৭ই চৈত্র তিনি আবার সভা আহ্বান করলেন। সেদিন সভার প্রারম্ভেই তিনি বললেন, "আমরা গেল বারে যে আলোচনা করেছি তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে। সে রিপোর্ট যথাযথ হয় নি।" [সাহিত্য-সমালোচনা, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫]। তাই কবি দুদিনের সভায় তাঁর বক্তব্য স্বয়ং লিপিবদ্ধ করে রাখেন। প্রথম দিনের বক্তব্য বৈশাখের (১৩৩৫) 'প্রবাসী'তে "সাহিত্যরূপ" শিরোনামায়, এবং দ্বিতীয় দিনের বক্তব্য ও বিবরণী "সাহিত্যসমালোচনা" শিরোনামায় জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ৪৯২-৫১২ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ দুটি 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সংকলিত

হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের সভায় বিবদমান দুই পক্ষই তাঁদের মুরুব্বীদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতির তালিকায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, অমল হোম, সজনীকান্ত দাস, নীরদ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও সাহিত্যরসিকদের নাম রয়েছে। [দ্রষ্টব্য ঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী-২৩, পৃ° ৫১০]

প্রথম দিনের সভার প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আজ এই সভা আহ্বান করা হয়েছে এই ইচ্ছা করে যে, নবীন প্রবীণ সকলে মিলে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করব ; কোনরকম চরম সিদ্ধান্ত পাকা করে দেওয়া যাবে তা মনে করে নয়।"

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল এই যে, নবযুগের স্রষ্টা তাঁকেই বলব যিনি নবরূপের স্রষ্টা। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার নাম প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থে :তেলা লেন, "রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে—ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।" "দিঘি বলিতে জল এবং খনন-করা আধার দুই একসঙ্গে বুঝায়। কিন্তু কীর্তি কোন্‌টা? জল মানুষের সৃষ্টি নহে—তাহা চিরন্তন। সেই জলকে বিশেষভাবে সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিবার যে উপায়, তাহাই কীর্তিমান মানুষের নিজের। ভাব সেইরূপ মনুষ্যসাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়রচনাই লেখকের কীর্তি।" [সাহিত্যের সামগ্রী]। "সাহিত্যরূপ" আলোচনায়ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাক্তন বক্তব্যই নূতন করে বললেন, "পূর্বযুগের সাহিত্যেই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে ঃ হে গুণী, কোন্‌ অপূর্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি করলে।"

এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে আধুনিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন :

"আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।

"আমরা দেখলুম কী। কোনো একটা নূতন বিষয়? তা নয়, একটা নূতন রূপ। সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ, সেই ভাবটি যে বিশেষ রূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য।...

"বলা বাহুল্য, মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। যাতে সেই লক্ষ্যের দিকে আপন কলমকে নিয়ে যেতে পারেন এমন একটা ছন্দের প্রশস্ত রাজপথ মাইকেল তৈরি করে তুললেন। রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে-রূপের সম্পদ পেল সেইটেতেই সে ধন্য হল।"

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালেও একই সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। "তিনি গল্পসাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন।" রূপের এই প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তারই পূজা চালালেন তিনি। 'এ সম্বন্ধে ...' যে, গল্পের কোনো একটি থিওরি প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 'বিষবৃক্ষ' নামের দ্বারাই মনে হতে পারে যে, ঐ গল্প লেখার আনুষঙ্গিকভাবে একটা সামাজিক মতলব তাঁর মাথায় এসেছিল। কিন্তু আসলে, রবীন্দ্রনাথের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র "রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপস্রষ্টা রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।"

জীবনের এই রূপদর্শন ও রূপসর্জনের ক্ষমতা যাঁর আছে তিনিই যথার্থ শিল্পী। তাই রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা, "নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন।"

তরুণ সাহিত্যিকদের লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। "কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এই-রকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এ কথা মানতে পারব না।" তিনি বললেন, দল বেঁধে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কেন না, সাহিত্যের মত দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই। "খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন; সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ, সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্নরকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো

ভালোই। কিন্তু, সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়।"

তিনি আরও বললেন, "রচনার বিষয়টি কালোচিত যুগোচিত, এইটেতেই যাঁর একমাত্র গৌরব তিনি উঁচুদরের মানুষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন, সাহিত্যিক নন।" সাহিত্যে বিষয়ের গুরুত্বকে রবীন্দ্রনাথ অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর মতে "সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনই প্রকাশ পায় যখনই দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। আজকালকার দিনে য়ুরোপে নানা কারণে তার ধর্ম সমাজ লোকব্যবহার স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত বেশি নাড়া খাওয়াতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা না হলে তার বাঁচাও নেই। এই একান্ত উৎকণ্ঠার দিনে এই সমস্যার দল বাছবিচার করতে পারছে না। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা যেমন প্রয়োজনের দায়ে গৃহস্থের ঘর ও ভাণ্ডার দখল করে বসে, তেমনি প্রব্লেমের রেজিমেণ্ট তাদের নিজের বারিক ছাপিয়েও সাহিত্যের সর্বত্রই ঢুকে পড়ছে। লোকে আপত্তি করছে না, কেননা সমস্যাসমাধানের দায় তাদের অত্যন্ত বেশি। এই উৎপাতে সাহিত্যের বাসা যদি প্রব্লেমের বারিক হয়ে ওঠে তবে এ প্রশ্ন মারা যায় যে, স্থাপত্যকলার আদর্শে এই ঘরের রূপটি কী। প্রয়োজনের গরজ যেখানে অত্যন্ত বেশি সেখানে রূপ জিনিসটা অবান্তর। য়ুরোপে সাহিত্যের সব ঘরই প্রব্লেমের ভাণ্ডার ঘর হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে; তাই প্রতিদিনই, দেখছি, সাহিত্যে রূপের মূল্যটা গৌণ হয়ে আসছে। কিন্তু এটা একটা ক্ষণকালীন অবস্থা—আশা করা যেতে পারে যে, বিষয়ের দল বর্তমানের গরজের দাবি ক্রমে ত্যাগ করবে এবং সাহিত্যে রূপের স্বরাজ আবার ফিরে আসবে। মার্শাল ল যেখানে কোনো কারণে চিরকালের হয়ে ওঠে সেখান থেকে গৃহস্থকে দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করাই কর্তব্য। বিষয়প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তা হলে বলতেই হবে, এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।"

তিন

দ্বিতীয় দিনে আলোচনা-সভা উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে বেশ গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আজকের সভায় ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, নিন্দা প্রশংসার কথা নয়—ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে যাঁরা সাহিত্যের

সত্যকে মনের ভিতর দেখতে পেয়েছেন তাঁরা আপনাদের মনের কথা বলবেন," এই বিশ্বাসেই সভা আহূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত যাঁদের আছে তাঁরা সেটা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করবেন। "কোন্ নীতির ভিত্তির উপর সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে, কোন্ সাহিত্য মানুষের কাছে চিরকালের গৌরব পাবার যোগ্য" সেই সম্বন্ধে কারো কিছু বলবার থাকলে তিনি তা প্রকাশ করে বলবেন—এই উদ্দেশ্যেই সভার আয়োজন।

আলোচনার প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য প্রকাশ করে বললেন, "ব্যক্তিগত ভাবে এই তর্কে আমার কোনো স্থান নেই। এমন কথা নয় যে, আমি এক পক্ষে আছি, আর আধুনিক সাহিত্য আর-এক পক্ষে আছে। * * * আমাকে কেউ পছন্দ করুন বা না করুন, এখন আমার চেয়ে ভালো লিখতে পারুন বা না পারুন, সে আলোচনা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।"

কিন্তু যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক তাঁরা কবিকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, কিংবা তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছিলেন। কবি বললেন, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে লেখেন নি। কতকগুলি লেখা তাঁর চোখে পড়েছিল যেগুলিকে তাঁর "সাহিত্যধর্মবিগর্হিত" বলে মনে হয়েছিল। সমাজের কথা চিন্তা করে নয়, সাহিত্যের আদর্শের কথা চিন্তা করেই তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বললেন, "আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানুষ যে-সকল মনের সৃষ্টিকে চিরন্তন মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে, তাকে সাহিত্যে এবং আর্টে চিরকালের ভাষায়, চিরকালের চিত্রে চিত্রিত করে। আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে-মহাকাব্য, স্পষ্ট দেখি তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্যপ্রচার, মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়—তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা।"

তিনি বললেন, মানুষের মহিমাকে রূপ দেওয়াই মহৎ সাহিত্যের আদর্শ। "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি বলেছিলেন, "তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।" আলোচনা-সভাতেও কবি বললেন, "মানবজীবনকে বড়ো করে দেখার শক্তি সব চাইতে বড়ো শক্তি।" তিনি আরও বললেন, আমরা এখন একটা নবযুগের আরম্ভকালে আছি। এখন নূতন কালের উপযোগী বল সংগ্রহ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে

প্রতিকূলতার সঙ্গে। "যে আত্মসংযমের দ্বারা মানুষ বড়ো শক্তি পেয়েছে তাকে অবিশ্বাস করে যদি বলি, সেটা পুরানো ফ্যাশন, এখন তার সময় গেছে, তা হলে আমাদের মৃত্যু। যে ফল এখনও পাকবার সময় হয়নি তার ভিতর পোকা ঢুকেছে, এই আক্ষেপ মনের ভিতর যখন জাগে তখন সেটাকে কেউ যেন ব্যক্তিগত কলহের কথা বলে না মনে করেন।"

"যে-সমস্ত লেখা সমাজের কাছে তিরস্কৃত হতে পারত যখন দেখি তাও সম্ভব হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে বাতাসে কিছু ঘোরতর বিষ-সঞ্চার হয়েছে। এই মনের আক্ষেপ নিয়ে হয়তো কিছু বলে থাকব। বেদনা কিছু ছিল দেশের দিকে, কালের দিকে, সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। যদি কেউ মনে করেন, এই বেদনা প্রকাশের অধিকার আমাদের নেই, অসংযত ভাবে তাঁরা যা বলেন সেটা এখনকার ডেমোক্রাটিক সাহিত্যে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, তা হলে বলতে হবে, তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই।"

চার

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য শেষ হবার পর নানা জনে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং একটি একটি করে রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দিতে থাকেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করেন সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে। উত্তরে কবি বলেন, সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। রক্ষণশীলতা অন্ধভাবেই আপন নিয়ম আঁকড়ে থাকে। কিন্তু একটি বিশেষ যুগের রীতিনীতি সকল যুগেই চলবে, এমন কোন কথা নেই। সর্বকালের নীতির দিকে তাকিয়ে সাহিত্য বিশেষ কালের বিধিনিষেধকে বিদ্রূপ করে। "সমাজের পথযাত্রার পাথেয় হচ্ছে উৎকর্ষের জন্যে আকাঙ্ক্ষা।" এই আকাঙ্ক্ষাই সাহিত্যে বাণীরূপ লাভ করে।

একজন প্রশ্ন করলেন, সাহিত্য সৃষ্টির যেমন আদর্শ আছে, সাহিত্য-সমালোচনারও তেমনি কোনও আদর্শ আছে কিনা। 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনারীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি জানতে চাইলেন, সাহিত্য-সমালোচনায় লগুড় ও ব্যক্তিগত গালাগালিই যদি একমাত্র জিনিস হয় তা হলে সেটা সাহিত্যের পক্ষে হিতজনক কিনা। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন,

"এটা সাহিত্যিক নীতি-বিগর্হিত। * * * সুবিচার করবার ইচ্ছাটা দণ্ড-বিধান করবার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল থাকা উচিত।" 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা সম্পর্কে তিনি পুনরায় বললেন, "কর্তব্যপালনের যে অবশ্যম্ভাবী কঠোরতা আছে নিজেরও সম্বন্ধে সেটাকে অত্যন্ত দৃঢ় রাখা চাই। 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্যের প্রমাণ হবে। সাহিত্যসংস্কার কার্যে তাঁদের কর্তব্যের ক্ষেত্র আছে—কিন্তু কর্তব্যটি অপ্রিয় বলেই এই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদেরকে একান্তভাবে রক্ষা করতে হবে। অস্ত্রচিকিৎসায় অস্ত্রচালনার সতর্কতা অত্যন্ত বেশি দরকার, কেননা, আরোগ্যবিধানই এর লক্ষ্য, মারা এর লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের চিকিৎসাই 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটুমাত্র বাইরে গেলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে।"

'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে এ-সব মন্তব্য থেকে 'শনিবারের চিঠি'র দলভুক্ত যাঁরা তাঁরা অনায়াসেই বলতে পারেন কবির সমর্থন তাঁরা অনেকখানিই পেয়েছেন। 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের "সুতীক্ষ্ণ লেখনী"। তাঁদের "রচনা-নৈপুণ্যের"ও কবি প্রশংসা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি এ কথাও বললেন যে, "সাহিত্যের চিকিৎসাই 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য।"

উপরন্তু আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বললেন, "যে-জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন, এ-সব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্থতা নয়।... ঈশ্বরকে মানিনে, ভালোবাসা মানিনে, সুতরাং আমরা সাহিত্যে বিশেষ কৌলীন্য লাভ করেছি, এমন কথা মনে করার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরকে মানি না বা বিশ্বাস করি না, সেটাতে সাহিত্যিকতা কোথায়। ভালোবাসা মানছি না, অতএব যারা ভালোবাসা মানে তাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছি, সাহিত্য প্রসঙ্গে এ কথা বলে লাভ কী।"

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ তরুণ সাহিত্যিকদের লক্ষ্য করে ভরতবচন উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কথায় কথায় আধুনিক সাহিত্যপত্রে বল,

আমরা আধুনিক কালের লোক, অতএব গরীবের জন্যে কাঁদব। এ রকম ভঙ্গিমা বিস্তারের প্রশ্রয় সাহিত্যে অপকার করে। আমরা অর্থশাস্ত্র শেখবার জন্য গল্প পড়ি না। গল্পের জন্য গল্প পড়ি। * * * যখন তোমাদের লেখা পড়ব তখন এই বলে পড়ব না যে, এইবার গরীবের কথা পড়া যাক। গোড়ার থেকে ছাপ মেরে চিহ্নিত করে তোমরা নিজেদের দাম কমিয়ে দাও। দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকে না।"

উপসংহারে তরুণদের খুশী করে দেবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তোমাদের অনেক লেখকের মধ্যে আমি প্রতিভার লক্ষণ দেখেছি। আমি কামনা করি, তাঁরা যুগপ্রবর্তনের লোভে পড়ে তাঁদের লেখার সর্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উল্‌কি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হল বলে না মনে করেন। তাঁদের শক্তির বিশুদ্ধ স্বকীয় রূপটি জগতে জয়ী হোক।"

কবির সেদিনকার এই কামনা কৃত্রিম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই নবজাতকের জয়ধ্বনি করেছেন। এই প্রসঙ্গে ১৩৩৫ সালের ১৪ পৌষ লেখা তাঁর একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে। দিলীপকুমার রায়ের উদ্দেশে "তরুণ আশীর্বাদপ্রার্থীর প্রতি প্রাচীন কবির নিবেদনে" কবি যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে দিলীপকুমারকে বলা হলেও সাধারণ ভাবে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন প্রতিভার উদ্দেশেই কবিগুরুর আশীর্বাদ। তাতে কবি বলেছিলেন :

> নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে
> ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
> তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
> অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, "আশীর্বাদ মাগি,
> হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
> "আশীষ তোমার তরে, নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া
> প্রভাতসূর্যের করে ; ধ্যানমগ্ন গিরি-তপস্বীর
> নিরন্তর করুণার বিগলিত আশীর্বাদ-নীর
> তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায় হতে
> নির্জনে একান্তে বসি, দেখি তুমি নির্বারিত স্রোতে
> সংগীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
> মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ, পথরোধী পাষাণ-সঞ্চয়,

গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনাতে জাগাবে উৎসাহ॥

এই কবিতায় কবি সরোবর এবং তরুণ-নির্ঝরের প্রতীক আশ্রয় করে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা সপ্তম-অষ্টম ও নবম পংক্তিতে বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে। সরোবর তরুণ নির্ঝরকে বলছে, "ধ্যানমগ্ন গিরি-তপস্বীর / নিরন্তর করুণার বিগলিত আশীর্বাদ-নীর / তোমারে দিতেছে প্রাণধারা।" কিন্তু সেদিনকার তরুণ-নির্ঝর এ কথা স্বীকার করতে চায় নি। রবীন্দ্র-যুগেরই বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। সে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরোধী। এই নিয়ে রবীন্দ্রমানসে যে দুর্জয় অভিমানের সৃষ্টি হয়েছিল তার ইতিহাসও কম চমকপ্রদ নয়। পরবর্তী অধ্যায়ে কবিগুরুর সেই সারস্বত অভিমানের প্রসঙ্গই আলোচিত হবে।

সপ্তম অধ্যায়

কবিগুরুর অভিমান

এক

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই অভিমানী। অতি-সূক্ষ্ম স্পর্শ-সচেতন ছিল তাঁর মন কিন্তু তাঁর সারা জীবনই নানা প্রতিকূল সমালোচনার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। পঁচিশ বছর বয়সে 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশের পর কাব্যবিশারদের কাছে কটুভাষায় যে ভর্ৎসনা শুনেছিলেন তার উত্তরে 'মানসী'তে "নিন্দুকের প্রতি নিবেদন" কবিতায় কবি বলেছেন :

যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই।

কবির ভাগ্যদেবতা তাঁকে দিয়ে এই কথা জীবনের নানা পর্বে নানা প্রসঙ্গে বারবার বলিয়েছেন। ১৯১৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী দীনবন্ধু (সি. এফ.) এণ্ড্রুজকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

I had been suffering from a time of deep depression and weariness. But I am sane and sound again and willing to live another hundred years, if critics would spare me. At that time I was physically tired, therefore the least hurt assumed a proportion that was perfectly absurd. However, I am glad

that there is still that child in me who has its weakness for the sweets of human approbation. I must not feel myself too far above my critics. I don't want my seat on the dais ; let me sit on the same bench with my audience and try to listen as they do. I am quite willing to know the healthy feeling of disappointment when they don't approve of my things ; and when I say, "I don't care," let nobody believe me.

সমালোচনা আমি গ্রাহ্য করি না, একথা যখন বলি তখন কেউ যেন আমাকে বিশ্বাস না করেন। কবির এই উক্তিটি বিরুদ্ধ-সমালোচনার ফলে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত তার বিচার-প্রসঙ্গে সর্বদা স্মরণীয়। পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত সজনীকান্তকে লেখা ২০ ফাল্গুন ১৩৩৪ তারিখের চিঠিতে তিনি বলছেন, "আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত করে দিয়েছে।" সাতষট্টি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মত অসামান্য প্রভাববিকিরণকারী কবি-সার্বভৌমের পক্ষে এই উক্তি কতটা অভিমানের ও বেদনার তা এর বাচ্যার্থ থেকে বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু এর ব্যঞ্জনা যে কত মর্মবিদারণকারী তার পরিচয় অচিরাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আলোচ্য পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিমানকে গোপন করার বৃথা চেষ্টায় বলছেন, "যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্মুখের মুখোশ পরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে তা হলে তো মুখ শুকিয়ে যেত।"

কিন্তু সত্যি সত্যি কি কবিগুরুর মুখ শুকিয়ে যায় নি ? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার পূর্বে পূর্ববাক্যটি ['আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত করে দিয়েছে'] রবীন্দ্রনাথ কেন লিখলেন তার কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। কল্লোল বেরিয়েছে প্রায় চার বছর আগে। কল্লোলীয় তরুণদের কণ্ঠে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রবিদ্রোহের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁরা বলছেন, হে বৃদ্ধ কবি, তুমি আমাদের পথ আগলে আছ। সরে দাঁড়াও, আমাদের পথ ছেড়ে দাও। কবি অচিন্ত্যকুমারের ভাষাতেই তরুণদের বক্তব্যটি স্পষ্ট করে বলা যাক্। অচিন্ত্যকুমার লিখলেন :

> এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার,
> যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
> কারেও ডরি না কভু ; সুকঠোর হউক সংসার,
> বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।

পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে।

রবীন্দ্রবিদ্রোহী এই দম্ভোক্তি শুনে চতুর্মুখ সেদিন নিশ্চয়ই হেসেছিলেন। যুগ-সূর্যকে ম্লান করে দেবার এই আকাশস্পর্শী স্পর্ধা যতই শূন্যগর্ভ বলে পরে প্রতীয়মান হোক, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিচলিত না হয়ে পারেন নি। পঁচিশ বছর বয়সে কবিকণ্ঠে যে অভিমান ভাষা পেয়েছিল, ['যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি, আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই'] সেই অভিমানই পুনরায় ভাষা পেল একটি কবিতার রূপে। সেই কবিতায় যুগ-সূর্যের কণ্ঠে যুগবিজয়ার বাণী শুনতে পাওয়া গেল। কল্লোল প্রকাশের ঠিক তিন বৎসর পরে ১৩৩৩ সালের ১১ চৈত্র তিনি লিখলেন "লেখা" শীর্ষক সনেটকল্প কবিতাটি। তাতে বললেন :

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হোক লয়
সমাপ্তির রেখাদুর্গ। নবলেখা আসি দর্পভরে
তার ভস্মস্তূপরাশি বিদীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
অনভিজ্ঞ নিক জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে
যায় প্রতিমার দিন। ধূলা তারে ডাক দিয়ে কয়,
"ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।"

শিল্পক্ষেত্রে এই তো মহাকালের নির্দেশ! যুগবিজয়ার দিনে শিল্পীর গড়া প্রতিমা কালস্রোতে বিসর্জিত হবে। নবযুগের শিল্পী এসে সেই মাটি দিয়েই নবীন প্রতিমা নবকৌশলে গড়ে তুলবে। "তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা।" সাহিত্যের নবীন শিল্পী সম্পর্কেও ওই একই কথা। বাক্-প্রতিমা নির্মাণে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করবেন তাই হল জিজ্ঞাস্য।

কিন্তু আলোচ্য কবিতাটিতে এই কঠিন সত্য উন্মেষিত হলেও ওটিতে নিরাসক্ত ও শান্তরসাশ্রিত কবিমানসের শুধু নির্বেদ-লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে মনে করলে ভুল হবে। ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে যুগাতিক্রান্ত শিল্পিমানসের বেদনা। "হয়েছে সময় নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে" হবে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের সারস্বত অভিমানও ওর মধ্যে নিগূঢ় বেদনা সঞ্চার করেছে। তাই দেখতে পাই ঠিক এক বৎসর পরে, ১৩৩৪ সালের ৪ চৈত্র বিচিত্রাভবনে আহূত আলোচনা-সভার প্রথম দিনে কবি বলছেন :

"কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিজের সাহিত্যিক পালাটা সঙ্গে করে চলে যেতে পারেন ; কিন্তু তিনি যে একটা কোনো যুগকে চুকিয়ে দিয়ে যান কিম্বা আর একজন যখন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রতিভাকে প্রকাশ করেন তিনি আর-একটা যুগকে এনে হাজির করে দেন, এটা অদ্ভুত কথা। একজন সাহিত্যিক আর-একজন সাহিত্যিককে লুপ্ত করে দিয়ে যান না, তাঁর একটা পাতার পরে আর-একটা পাতা যুক্ত করে দেন। প্রাচীন কালে যখন কাগজ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না তখন একজনের লেখা চেঁছে মেজে তারই উপরে আর-একজন লিখত—তাতে পূর্বলেখকের চেয়ে দ্বিতীয় লেখকের অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণ হত না, এই মাত্র প্রমাণ হত যে দ্বিতীয় লেখকটি পরবর্তী। এক যুগ আর-এক যুগকে লুপ্ত না করে আপনার স্থান পায় না, এইটেই যদি সত্য হয় তবে তাতে কেবল কালেরই পূর্বাপরতা প্রমাণ হয় ; তার চেয়ে বেশি কিছু নয়—হয়তো দেখা যাবে, ভাবীকাল উপরিবর্তী লেখাটাকে মুছে কেবল তলবর্তীটাকেই উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে।" ["সাহিত্যরূপ," 'সাহিত্যের পথে'। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী-২৩, পৃ ৪৯৭-৪৯৮]। আলোচ্য কবিতাটির সঙ্গে কবির এই ভাষণের উদ্ধৃত অংশ মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারা যাবে রবীন্দ্রনাথের মনে সেদিন কী গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু উদ্ধৃতাংশের শেষবাক্যে একটি আশ্চর্য দৈববাণী সেদিন কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। "হয়তো দেখা যাবে, ভাবীকাল উপরিবর্তী লেখাটাকে মুছে ফেলে তলবর্তীটাকেই উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে।" বস্তুত, কল্লোল যুগের রবীন্দ্রবিদ্রোহের রণডঙ্কা স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, সাহিত্যে [কথাসাহিত্যের কথাই বিশেষভাবে বলছি] রবীন্দ্র-ঐতিহ্যেরই জয়ধ্বনি ঘোষণা করে আবির্ভূত হলেন 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে এলেন তারাশঙ্কর আর 'বনফুল'। সত্যি কথা বলতে গেলে, সেদিন কল্লোল আর শনিবারের চিঠির দ্বন্দ্বের মূল কথা ছিল রবীন্দ্র-বিদ্রোহ

আর রবীন্দ্রানুসরণের ভাবদ্বন্দ্ব। কল্লোল-যুগ অতিক্রান্ত হবার পরে দেখা গেল শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রানুসরণেরই জয় হল। এমন কি সেদিনকার তথাকথিত তরুণ রবীন্দ্রবিদ্রোহীদেরও অনেকে [যেমন বুদ্ধদেব বসু] শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-গোত্রেই প্রবেশ করলেন। এই গোত্রান্তর ধীরে ধীরে আরও অনেকের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে আলোচনা পরবর্তীকালের। আপাতত কবিগুরুর অভিমান সম্পর্কে নূতনতর তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা যাক্।

দুই

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শেষের কবিতা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে। কিন্তু এই উপন্যাসের রচনাকাল আরও বছর দেড়েক আগে। কবি তখন রয়েছেন নীলগিরির অন্যতম শৈলাবাস কুন্নুরে। সঙ্গে আছেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও তাঁর স্ত্রী রানী দেবী। সেখানেই 'মিতা' নামে শেষের কবিতা উপন্যাসের সূত্রপাত হয় ১৩৩৫ সালের বৈশাখে। আর লেখা শেষ হয় মহীশূরের বঙ্গলুরে শ্রাবণের প্রথম ভাগে।

এই শেষের কবিতা উপন্যাসের নায়ক অমিত রায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার তরুণদের বক্তব্যকে ভাষা দিয়েছেন। একদিন বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবিঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচ্য বিষয়। একজন সেকেলে গোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবিঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। দু-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা এক রকম সন্তোষজনক। অমিত রায় ছিল সভাপতি। সে সভায় গিয়েছিল মনে মনে যুদ্ধসাজ পরে। সে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বললে, "কবিমাত্রের উচিত পাঁচ বছর মেয়াদে কবিত্ব করা; পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ-কথা বলব না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। *** রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ডসওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায় রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও

চৌকির হাত আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা।"

রবীন্দ্রনাথের নিজেরই নায়ক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করছে—এটি অতি উপাদেয় ও উচ্চাঙ্গের রসিকতা বটে। অমিত রায়ের সভাপতির অভিভাষণে রসিকতাটি নূতন নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করেছিল, 'সাহিত্য থেকে লয়ালটি উঠিয়ে দিতে চান?' উত্তরে অমিত রায় বলল, 'একেবারেই'। এবং তার পরেই শুরু হল তার দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ। এবার রবীন্দ্রনাথের 'রচনা-রেখা'র বিরুদ্ধে তার জেহাদ। সে বলছে, "রবিঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গ-রেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মকৃশো করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন কি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিলডিঙের আদলে হয় ক্ষতি নেই।"

অমিত রায়ের মুখে নিজের 'রচনারেখা' বা স্টাইল সম্পর্কে এই রঙ্গরসিকতা পদে পদে শ্লেষাত্মক। রবিঠাকুরের রচনারেখা গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরণে।—ওটা এ যুগে অচল, কেননা ওটা প্রিমিটিভ। নবযুগের নবীন শিল্পীর রচনা হবে ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো। তা হবে গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, কেন না মন্দিরের মণ্ডপ এ দেশের আর আর গথিক গির্জে বিদেশাগত। তথাকথিত আধুনিকতার প্রতি কবির তীব্র ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণতম হয়ে উঠেছে যখন তিনি বললেন,"এমন কি যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিলডিঙের আদলে হয় ক্ষতি নেই।" সাহিত্যের রীতির প্রসঙ্গে অমিত রায় বললে "এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে; যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতি বৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ।"

অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রে কান্তাসম্মিত বাণীর স্থান দখল করবে শাস্তাসম্মিত বাণী। মন ভোলাবার প্রয়োজন নেই, মন কাড়বার জবরদস্তি জানা থাকলেই

হল। রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে অমিত রায়-রূপী তরুণদের তৃতীয় অভিযোগ হল তিনি বৃদ্ধ বয়সে নির্লজ্জভাবে নিজের লেখা নিজেই নকল করে চলেছেন। অমিত রায় বলছে, "যে-সব কবি ষাট-সত্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না, তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে শস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারদিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাঙচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চুরি শুরু করে হয়ে পড়ে রিসীভর্স অফ স্টোলন প্রপার্টি। সে-স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে, কিছুতেই এই সব অতিপ্রবীণ কবিদের বাঁচতে না দেওয়া,—শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।"

ঠাট্টা এখানে একেবারে অট্টহাসিতে বিদীর্ণ হয়েছে। শেষের কবিতার গোড়াতেই বিন্যস্ত এই বিদ্রূপাত্মক বক্রোক্তি, এই রবীন্দ্রবিদূষণ সেদিনকার অত্যুগ্র তরুণমহলকেও কম বিস্ময়বিমূঢ় করে নি। হাল আমলের নায়ক-চরিত্র চিত্রণে এই পূর্বরঙ্গের উপস্থাপনা উপন্যাসের দিক দিয়ে অত্যাবশ্যক ছিল কি না সে প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। কিন্তু শেষের কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করে দিলেন তাঁর শক্তি ও রীতি অচল হয়ে তো যায়ই নি, বরং তিনি এখনও অননুকরণীয়, অনতিক্রম্য। শেষের কবিতা আধুনিক যুগের আধুনিকতম সৃষ্টি।

কিন্তু, অমিত রায়ের কণ্ঠে রবিঠাকুরের এই দুর্গতির ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ আমোদই শুধু উপভোগ করেছিলেন এ কথা বললে নিশ্চয়ই সবটুকু বলা হবে না। ওর মধ্যে কবির অভিমানও পদে পদে বিদীর্ণ হয়েছে। সজনীকান্তকে লেখা এক চিঠিতে [৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪] রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আধুনিক তরুণদের বিরুদ্ধে আক্রমণ তাঁর পক্ষে ক্যানিবলিজমের সামিল। অমিত রায় কবিরই মানসপুত্র। সাহিত্যসংসারে উত্তরপুরুষেরা পূর্বসূরির পুত্রতুল্য। ক্যানিবলিজমের তাৎপর্য এই সূত্রেই বিধৃত। সন্ন্যাসীরা নিজেরাই নিজের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে রাখেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসংসারে অগ্নিব্রক সন্ন্যাসী ছিলেন না। তৎসত্ত্বেও তিনি কী বেদনায় নিজেই নিজের শ্রাদ্ধক্রিয়ার আয়োজন করেছিলেন তা গভীর ভাবে বিচার করে দেখা কর্তব্য।

তিন

শেষের কবিতা রচনার পরে কবি আরও তেরো বছর বেঁচে ছিলেন। এই তেরো বছর তিনি অন্তরের অভিমান অন্তরেই বহন করে চলেছিলেন। কাব্যলোকে তার প্রকাশ নানা ভাবে হয়েছে। 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থের "মরণমাতা" কবিতায় কবি বলেছেন, "রোধিয়া পথ আমি না রব থামি।"—

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনম মাঝে নিজেরে দিব দান।
আজি রাতের যে ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

১৩৪৩ সালের বৈশাখে লেখা, 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ কবিতায় [আঠারো সংখ্যক] কবি বলছেন :

কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি,
এইবার থামো তুমি। বাক্যের মন্দিরচূড়া গাঁথি
যত উর্ধ্বে তোল তারে তার চেয়ে আরো উর্ধ্বে ধায়
গাঁথুনির অন্তহীন উন্মত্ততা। থামিতে না চায়
রচনার স্পর্ধা তব।

কী বেদনায় কবি নিজেই নিজেকে এই ধিক্‌কার দিচ্ছেন তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কখনো এই অভিমান হাসির ছদ্মবেশ পরেও দেখা দিয়েছে। 'প্রহাসিনী'র "মাল্যতত্ত্ব" কবিতায় নাতনির সঙ্গে রঙ্গরসিকতায় আধুনিকতা সম্পর্কে প্রসন্ন ব্যঙ্গ পরিহাসে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। কবি লিখছেন :

'শুক্ল একাদশীর রাতে
কলিকাতার ছাতে
জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁওয়া,
গলায় আমার কুন্দমালা গোলাপজলে ধোওয়া'—
এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে প'ল,
এটা নেহাত অসাময়িক হল।
হাল ফ্যাসনের বাণীর সঙ্গে নূতন হল রফা,
একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা।
শূন্য সভায় যতখুশি করুন বাবুয়ানা,
সত্য হতে চান যদি তো বাহার দেওয়া মানা।

তাছাড়া ঐ পারিজাতের ন্যাকামিও ত্যাজ্য,
মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ন্যায্য।
বদল করে হল শেষে নিম্নরকম ভাষা—
'আকাশ সেদিন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
রাতটা যেন কুলিমাগি কয়লাখনি থেকে
এল কালো রঙের উপর কালির প্রলেপ মেখে।'

এখানে আধুনিকতাকে ঠাট্টা করাই হয়েছে। কিন্তু মর্ত থেকে বিদায় নেবার আড়াই বছর আগে, ১৩৩৯-এর নববর্ষে লেখা, 'আকাশপ্রদীপে'র "সময়হারা" কবিতাটিতে কবির অভিমানসঞ্জাত বেদনা এবং সেই বেদনা ভোলার প্রয়াসটি সত্যসত্যই মর্মস্পর্শী। কবি বলছেন :

খবর এল, সময় আমার গেছে,
আমার গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই ;
সাবেক কালের দালান ঘরের পিছন কোণেই
ক্রমে ক্রমে
উঠছে জমে জমে
আমার হাতের খেলনাগুলো,
টানছে ধুলো।
হাল আমলের ছাড়পত্রহীন
অকিঞ্চনটা লুকিয়ে কাটায় জোড়াতাড়ার দিন।

কিন্তু সময়হারারও সময় কাটাবার একটা সম্বল চাই। শিল্পীর কণ্ঠে কবি বলেন :

শহর জুড়ে নামটা ছিল যেদিন গেল ভাসি
হলুম বনগাঁবাসী।
সময় আমার গেছে বলেই সময় থাকে প'ড়ে,
পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেয়াল গড়ে।
* * *
সময় আমার গিয়েছে, তাই গাঁয়ের ছাগল চরাই ;
রবিশস্যে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই।

কিন্তু খেয়াল গড়ার তো কূলকিনারা নেই! তাই শিল্পী মনে মনে স্বপ্ন রচনা করে :

সন্ধ্যে নামে পাতাঝরা শিমূল গাছের আগায়,
আধ-ঘুমে আধ-জাগায়
মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্টারিটির পথে
স্বপ্নমনোরথে ;
কালপুরুষের সিংহদ্বারের ওপার থেকে
শুনি কে কয় আমায় ডেকে,—
"ওরে পুতুলওলা
তোর যে ঘরে যুগান্তরের দুয়ার আছে খোলা,
সেথায় আগাম বায়না দেওয়া খেলনা যত আছে
লুকিয়ে ছিল গ্রহণ-লাগা ক্ষণিক কালের পাছে ;
আজ চেয়ে দেখ, দেখতে পাবি,
মোদের দাবি
ছাপ-দেওয়া তার ভালে।
পুরানো সে নতুন আলোয় জাগ্‌ল নতুন কালে।

কিন্তু এও তো দুর্মর শিল্পিমানসের অলীক স্বপ্নমাত্র! তাই কবি কবিতার শেষে নবীন কালের বিচারপতির কাছে ক্ষমা চেয়ে বলছেন :

এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপ মাত্র—
নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র ;
পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

কবিতার এই উপসংহারটি সত্যসত্যই অতিশয় করুণ। 'আরোগ্যে'র আঠারো সংখ্যক কবিতায় [রচনার তারিখ ১০ জানুয়ারী ১৯৪১] নিজের কাব্যক্ষেত্রকে কবি ফসলকাটা মাঠের রিক্ততার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সৃষ্টির শ্রাবণ চলে গেছে, বাদলের ধারা নিঃশেষিত, অঘ্রানের সোনার ধানের দিনও সারা হয়েছে। তবু কবি বলছেন :

চৈত্র আমার রোদে পোড়া, শুকনো যখন নদী,
বুনো ফলের ঝোপের তলায় ছায়া বিছায় যদি,
জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয় নি ফাঁকি,
শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি।

ভাবতে বিস্ময় লাগে, রবীন্দ্রজীবনের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে'র ['শেষলেখা'

কবির তিরোধানের পরে প্রকাশিত হয়েছে] সর্বশেষ কবিতায়ও অভিমানের সুরটি অপরিস্ফুষ্ট নয়। কবি বলেছেন :

তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ।
তোমাদের আবেষ্টন, চলাফেরা, চারিদিকে ঢেউ ওঠা পড়া,
সবই চেনা জগতের তবু তার আমন্ত্রণে দ্বিধা—
সবা হতে আমি দূরে, তোমাদের নাড়ীর যে ভাষা
সে আমার আপন প্রাণের, বিষণ্ণ বিস্ময় লাগে
যবে দেখি স্পর্শ তার সসংকোচ পরিচয় নিয়ে
আনে যেন প্রবাসীর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ আত্মীয়তা।

কিন্তু তবু শেষ নিশ্বাসের সঙ্গেও কবির দেওয়ার ইচ্ছা বিলুপ্ত হয় নি।—

আমি কিছু দিতে চাই, তা না হলে জীবনে জীবনে
মিল হবে কি করিয়া—আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে—
ভয় হয়, রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসস্বাদ
হারায়েছে পূর্বপরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
রবে না সম্মান।

তবু এই আশঙ্কার দূরত্ব থেকেও কবিকণ্ঠ আসক্তির মহামোহ থেকে মুক্ত হতে পারে নি। তাই তিনি বলেন :

যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা ;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি।

শিল্পিমানসের যে আসক্তি থেকে কবির অভিমানের জন্ম তার বিচিত্র আলো-ছায়ার লীলা রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষযুগের উদ্ধৃত কবিতাবলীর মধ্যে চিরদিনের মতো কাব্যচ্ছন্দে গাঁথা হয়ে রইল। উত্তরসূরিদের উপর গড়ে-ওঠা অভিমান সকল-চিহ্ন-লোপকারী মহাকালের বিরুদ্ধেও পুঞ্জীভূত হতে দেখা দিয়েছে।

চিরন্তন কবিশিল্পীর এই অভিমানই একদিন 'পত্রপুটে'র "পৃথিবী"

কবিতায় অবিনশ্বর ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছিল। উদাসীন পৃথিবীকে শেষ নমস্কার জানিয়ে কবি বলেছিলেন :

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ড কালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে ;
তারি মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীর্তির অবসান।

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসিনি তোমার সম্মুখে ;
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে—
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক
আমার কপালে ;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে ॥

যে-রবীন্দ্রনাথ একদিন যৌবনলগ্নে পরম আসক্তির সুরে বলেছিলেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,' যিনি 'বসুন্ধরা' কবিতায় জননী মৃন্ময়ীকে আহ্বান করে বলেছিলেন :

ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি—
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?

সেই কবির জীবনদিনান্তে যে অনাসক্তির সুর 'পৃথিবী' কবিতায় বেজে উঠেছে তার অন্তরালে বহুদিনের বহু অভিমান লুক্কায়িত হয়ে রয়েছে। বিশ্বপ্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথের এই মহাবৈরাগ্য কী নিগূঢ় অভিমান থেকে জন্ম নিয়েছিল তা ভেবে দেখবার বিষয়।

অষ্টম অধ্যায়

গুরুনিন্দা

এক

রবীন্দ্রনাথের দুর্জয় সারস্বত অভিমানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন সজনীকান্ত। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাকে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা তো করতে পারলেনই না, উপরন্তু গুরুনিন্দা করে কবিগুরুর ক্রোধ নিজের উপরই ডেকে আনলেন। সজনীকান্ত সরস্বতীর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনা যে তাঁকে বারবার পথভ্রষ্ট করেছে তার নিদর্শনও তাঁর জীবনে দুর্লভ নয়। রবীন্দ্রবিদ্রোহী তরুণদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে শনিবারের চিঠির একেবারে দলে টানা হয়তো সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু তাঁকে শনিবারের চিঠির অনুকূলে আনা যে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, এ উপলব্ধি সজনীকান্তের হয়েও হল না। 'নির্বোধ হঠকারিতা'র ফলেই তিনি কবিগুরুর উদ্দেশে আঘাত হেনে বসলেন।

তখন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন মাস। মাসিক শনিবারের চিঠির উদ্যোগপর্ব চলছে। কুরুপাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রের আয়োজন হচ্ছে পূর্ণোদ্যমে। কিন্তু সজনীকান্ত বলছেন, সেই উদ্যোগপর্বেই ভীষ্মপর্বের বিষাদযোগ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। "নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিপক্ষীয় দলের সমর্থক-দের ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে আমাদের একমাত্র ভরসা ও আদর্শ স্বয়ং জনার্দনই সাময়িকভাবে শনিবারের চিঠিকে নয়, একমাত্র আমাকেই ত্যাগ করিয়া-ছিলেন।" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ ২৭৮]

যাকে সজনীকান্ত বলছেন 'নিজের অবিমৃষ্যকারিতা', 'নির্বোধ হঠকারিতা', সেই বস্তুটি হল 'নটরাজ' গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বিচিত্রা' মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রা'র সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ বাংলা সাময়িক-পত্রিকার ইতিহাসে নানা দিক দিয়েই অভূতপূর্ব ঘটনা বলে বিবেচিত হবে। যতগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হয়েছিল, প্রতি

মাসে গদ্যে-পদ্যে রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনা হল সেগুলির অন্যতম। 'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যার প্রথমেই কবিগুরুর 'নটরাজ' গীতিনাট্যটি সুসজ্জিত অঙ্গসজ্জায় বিভূষিত হয়ে প্রকাশিত হল। এই 'নটরাজ'কে নিয়ে সেদিন রবীন্দ্র-রসিকসমাজে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সজনীকান্তের মনে হল, "নটরাজ রবীন্দ্র-প্রতিভার আরোহণ নয়, অবতরণ।" "ভাবের দিক দিয়া তাহা পুরাতন রবীন্দ্রনাথেরই অনুকরণ, এবং অক্ষম অনুকরণ, ছন্দ ও মিল শিথিল।"

এই কথাগুলিই সজনীকান্ত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের আকারে লিপিবদ্ধ করলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে লেখাটি উদ্দীপনার সঙ্গে পড়াও হল। রচনাগুণে লেখাটি ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সেনের ভাল লেগেছিল। তিনি 'অরসিক রায়' ছদ্মনামে ওটিকে সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন। তখন তারানাথ রায় ছিলেন 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক। সাপ্তাহিক-খানির খুব প্রতিপত্তি ছিল। 'অরসিক রায়ে'র "নটরাজ" 'আত্মশক্তি'তে ১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাসের ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ তারিখে এবং আশ্বিনের ২৭ তারিখে পাঁচটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, প্রবন্ধটি সে-যুগে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। যথাকালে লেখা ও লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছল। সজনীকান্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন হয়ে উঠল বিরূপ। "নটরাজ" প্রবন্ধটিই ছিল গুরু-শিষ্যের প্রথম সংঘাতের মূলে। সুতরাং তার একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক।

দুই

প্রবন্ধের ভূমিকাতেই সজনীকান্ত তাঁর মূল বক্তব্যটি স্পষ্ট করলেন। তিনি বললেন :

"আমাদের সৌভাগ্য যে বঙ্গবাণীর দরবারে 'নটরাজ'ই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র অর্ঘ্য নহে। ঋতুরঙ্গশালায়ও ইতিপূর্বে বারবার তাঁহার ডাক পড়িয়াছে; তিনি কবিতা ও গানের অপূর্ব পুষ্পসম্ভার লইয়া বহুবার তথায় উপস্থিত হইয়া অফুরন্ত দানে রঙ্গশালা ছাইয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সমসাময়িক তাঁহারা তাঁহার পুষ্প-অর্ঘ্যের মধুগন্ধে বিহ্বল হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। সে পুষ্পমাধুর্য ও সৌরভ ম্লান হইবার নহে, অনন্ত অনাগত কালেও তাহা অমলিন অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে।"

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীই ছিল সজনীকান্তের আদর্শ। মুক্তকণ্ঠেই

তিনি ঘোষণা করলেন, "তিনি ইতিপূর্বে যাহা দিয়াছেন তাহাকেই আদর্শ করিয়া আমি তাঁহার এই নূতন দানের বিচার করিব।" [আত্মশক্তি, ৯ই ভাদ্র, ১৩৩৪]। সজনীকান্ত আরও বললেন :

"বিশ্ববাণীর দরবারে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যতখানি গৌরব তাহার পনেরো আনা রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই। বিচারের দ্বারা তাঁহাকে ছোট করিতে গেলেই আত্মহত্যা করা হইবে। অনেকে এইজন্য আমাদিগকে মহা অপরাধে অপরাধী করিবেন। যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে তাহা প্রকাশ করিলে যদি মহাপাতকও হয় আমরা তাহার শাস্তি মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসি বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের বিচার করিতেছি। শ্রদ্ধা ও স্নেহের বিচার সকল ক্ষেত্রেই মার্জনীয়।"

রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসেন বলেই রবীন্দ্রনাথের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন— এ উক্তি সত্ত্বেও প্রবন্ধটি রচনাকালে লেখকের মনে অন্যান্য চিন্তাও যে বিরাজমান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে যখন তিনি বলছেন :

"তিনি বিশাল মহীরুহের মত দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া পথশ্রান্ত পথিক ও তাপিতকে ছায়াদান করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার পাদদেশে যে সকল লতাগুল্ম অতীব সঙ্কোচে আকাশের রৌদ্র বায়ু ও মৃত্তিকারস আহরণ করিয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছিল একে একে তাঁহার আওতায় সকলগুলি প্রায় শুকাইয়া আসিল ; যে কটি জীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া টিকিয়া আছে 'নমুনা'রূপ তাঁহার ভক্ত সেগুলিকেও আর বুঝি বাঁচিতে দেয় না। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসিনী প্রতিভা এক প্রকাণ্ড অভিশাপের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

এই বক্তব্যকেই স্পষ্টতর করে সজনীকান্ত লিখলেন :

"প্রত্যেকের দেয় আছে—প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ক্ষুদ্র বৃহৎ দিবে। কিন্তু বাণী-মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত যাঁহারা—অন্য সকলের দান উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শুধু রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই বাণীর অর্চনা সারিতে চাহিতেছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথেরও অপমান করা হইতেছে এবং উপেক্ষিত সাধক-দিগকেও নিস্তেজ ও দুর্বল করিয়া দেওয়া হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ ভাল লিখিতেছেন কি মন্দ লিখিতেছেন তাহা বিচার করিবার সাহস কাহারও নাই। অর্ধ শতাব্দীর অভ্যাসের মোহে তিনি যাহাই লিখিতেছেন, চরমতম কাব্য হইতে তুচ্ছতম বাজার হিসাব পর্যন্ত সকলই সাদরে সাহিত্যভোজে উপাদেয় ভোজ্যরূপে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে এবং নিরীহ জনসাধারণকে

বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে যাহা পাইতেছ তাহাই মাথায় তুলিয়া লও, লোভ করিবার মত বস্তু অন্য কুত্রাপি কিছুমাত্র নাই।"

সাহিত্যে এই একেশ্বরবাদ সজনীকান্তের মতে সর্বনাশের সূচনাকারী। এই একেশ্বরবাদের প্রতিবাদেই তিনি প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। "আমার উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণে যেন যাচাই করিয়া সমস্ত জিনিস গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক সাহিত্যসেবীই যেন তাহার প্রাপ্য সম্মান বুঝিয়া পায়।"

অর্থাৎ সজনীকান্তের সেদিনকার বক্তব্য ছিল মূলত দুটি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথার মণি সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্ধভক্তি কোন ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান আমরা মাথা পেতে গ্রহণ করব, কিন্তু তাঁর নিকৃষ্ট বা অসার্থক সৃষ্টিগুলিকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতই আমাদের বর্জন করতে হবে। বলাই বাহুল্য, পূর্বসূরির প্রতি এই বিচারই উত্তর-সূরির ক্ষেমংকর কৃত্য। সজনীকান্তের দ্বিতীয় বক্তব্য হল, রবীন্দ্রেতর গুণী শিল্পীকেও আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এখানে সম্ভবত তাঁর মনে তাঁর অন্যতর গুরু মোহিতলালের কথাই বিশেষভাবে উদিত হয়েছে। বস্তুত, এই দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই সেদিনকার রবীন্দ্র-বিদ্রোহী তরুণদের সঙ্গে সজনীকান্তের যুগপৎ মিল ও অমিল খুঁজে পাওয়া যাবে। তরুণেরা রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাঁর স্থলে অন্য গুরুর [অচিন্ত্যকুমারের সাক্ষ্য অনুসারে তাঁদের ক্ষেত্রেও মুখ্যত মোহিতলাল] প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য স্বীকার করে নিয়েই নূতন গুরুকে আহ্বান করেছেন।

তিন

'নটরাজ' সম্পর্কে সজনীকান্তের বিরূপতার প্রধান হেতু হল এই যে, এই গীতিনাট্যটি "গতানুগতিকতা দোষদুষ্ট।" সজনীকান্ত সেদিন 'বলাকা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে মহৎ সৃষ্টি বলে স্বীকার করেছিলেন। এ মত তাঁর গুরু মোহিতলালের মতেরই অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে মোহিতলাল একবার বলেছিলেন, "বলাকার পর রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়াছেন একথা যে বলে সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?"

সজনীকান্ত 'পূরবী'র মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের শক্তির কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছেন, কিন্তু তবু তিনি বলছেন:

"পূরবীর প্রায় সর্বত্রই তিনি পুরাণো কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—অথচ

পুরাতনের সে প্রাণশক্তি হারাইয়াছেন। তাহার পরই তাঁহার পতন হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের সে সংযম ও বাঁধুনী পূরবী হইতেই নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বহু স্থানে তিনি আপনাকে আপনি অনুকরণ করিয়াছেন। পুরাতন কবিতার ভাব ভাষা এমন কি পংক্তির পর পংক্তি লইয়া তিনি ঢালিয়া সাজিয়াছেন কিন্তু পূর্বের সুষমা ও শক্তি নষ্ট হইয়াছে। বিধিদত্ত অপূর্ব প্রতিভাবলে তিনি যে মাঝে মাঝে মনের বার্ধক্যকে জয় করিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে অপূর্ব বস্তু সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন নাই একথা সত্য নহে। তবে এখন তাঁহার শক্তির প্রকাশ ক্বচিৎ কদাচিৎ লক্ষিত হয়।"

'নটরাজ' রবীন্দ্রনাথের অবনতিরই সাক্ষ্য বহন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে। সজনীকান্ত বলছেন :

"মাঝে মাঝে কবি ভাব ও রসের অতীন্দ্রিয় লোকে বসিয়া যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার বিশ্ববিজয়িনী বাণী স্থানে স্থানে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই ৫৮ পৃষ্ঠা লেখার মধ্যে এই অপরূপ রস এত অল্প যে মন ব্যথিত হয়—ইহা রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত হয় নাই।"

পুনশ্চ :

"বহুস্থলে কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অধিকাংশ কবিতা ও গান অত্যন্ত সাধারণ গোছের, ছন্দ, রস, শব্দ ও ভাবের যে বাঁধুনীর জন্য রবীন্দ্রনাথের এত খ্যাতি নটরাজ পালায় রবীন্দ্রনাথ সেই বাঁধুনী বজায় রাখিতে পারেন নাই। তিনি যেন শব্দ ও ছন্দ লইয়া খেলা করিয়াছেন মাত্র, শিল্পসৃষ্টি করেন নাই।"

প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে লেখক বলেছেন খুঁটিনাটি নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন না, বৃহৎ অসঙ্গতি ও রসাভাস ইত্যাদিরই শুধু উল্লেখ করলেন। শুধু উল্লেখই নয়, দুর্বল স্থানগুলি বেছে বেছে উদ্ধৃতি সাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বক্রকটাক্ষ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

চতুর্থ কিস্তিতে লিখছেন :

"উদ্বোধন কবিতার শেষের অংশটি পড়িয়া আমাদের হতাশার সঞ্চার হইয়াছে। এই অংশটিতে আমরা রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্যের নিকট রবীন্দ্রনাথের পরাজয় লক্ষ্য করি। ইহা অবশ্য সর্বত্র দোষের নহে, কিন্তু এখানে সত্য-সুন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথ বীভৎস বিদ্রোহ-রসের মোহে পড়িয়াছেন। শব্দের ও ছন্দের ঝঙ্কার আছে কিন্তু অর্থ-সঙ্গতির অভাব মনকে পীড়া দেয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা এই কবিতাটি পাঠ করিলেই আমাদের

কথা বুঝিতে পারিবেন। রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মধ্যে সুন্দরের লাগি অর্ঘ্যমালা সাজাইতে দেখিতেছেন, এমত সময়ে

'অকস্মাৎ কোমলের কমল মালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;
মুহূর্তে অম্বর বক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার-ক্রন্দন।'

মনে হয় নজরুলী কবিতা পড়িতেছি, রসাভাব স্পষ্ট, কদর্যতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামা ও দামামার মিল ভাল হয় বটে, কিন্তু শ্যামাকে দিয়া দামামা বাজাইলে আমাদের পৌরাণিক সংস্কারকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।"

'শরতের ধ্যান' কবিতাটি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া মনে হয় না। গীতাঞ্জলির 'শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে', 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' কিম্বা 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা' ইত্যাদি গানের সহিত তুলনা করিলে এই কবিতাটির দৈন্য ধরা পড়িবে। এই ধরনের কবিতা 'নাচঘর' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাতে প্রায়শই পড়িয়া থাকি।

'শরতের বিদায়' গানটি সত্যেন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ। তাও আবার ১২ লাইন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছন্দ বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন নাই দুর্গতি ইহাকেই বলে।''

এই জাতীয় বক্রকটাক্ষসহ 'নটরাজে'র ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে প্রবন্ধের উপসংহারে সজনীকান্ত বলছেন, "নটরাজ পালায় প্রাণের সেই বেগ নাই, গতিহারা স্রোতের মত ইহা শৈবালদামে পূর্ণ বলিয়া আমরা বিচারের দ্বারা সেই শৈবালদাম সরাইয়া জলের সন্ধান করিয়াছি, অন্যায় কিছু করিয়াছি বলিয়া মনে করি না।''

এইখানেই প্রবন্ধটি সমাপ্ত হলে লেখকের বক্তব্য শুদ্ধমাত্র 'নটরাজে'র কাব্যবিচারে সীমাবদ্ধ বলে গ্রহণ করা যেতে পারত। কিন্তু প্রবন্ধের উপসংহারে সজনীকান্ত একেবারে শনিবারের চিঠির প্রবক্তারূপে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। গুরুর উদ্দেশে শিষ্য উপদেশামৃত বর্ষণ করেছেন। কবির লেখনীতে যখন আর তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত রচনার সৃষ্টি হচ্ছে না তখন তাঁর কর্তব্য, অক্ষম সৃষ্টির চেষ্টা পরিত্যাগ করে বেত্রদণ্ড গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অনাচার ও অনাসৃষ্টির উপযুক্ত শাস্তিবিধান করা। সজনীকান্ত লিখছেন :

"রবীন্দ্রনাথ যদি আপনার মরিচাধরা তরবারি লইয়া ছন্দ-কৌশল দেখাইবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে শানাইয়া বঙ্গ-সাহিত্যে অনাচারের স্রোত বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেও আমাদের মঙ্গল। যে সাহিত্য ও ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ বুকের রক্ত দিয়া এতকাল পুষ্ট করিয়া আসিলেন তাহাকে রক্ষা করিবার ভার আজ তিনি গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। বাংলা সাহিত্যে দিনে দিনে ভাবে ও ভাষায় যে বীভৎসতা ও কুরুচি প্রসার লাভ করিতেছে তাহা দূর করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের মত শক্তিশালী লেখকের চেষ্টা আবশ্যক। সাহিত্যে সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি অসুন্দরকে সংহার করিবার জন্য রুদ্র মহাকালের ডম্বরু নিনাদও প্রয়োজন। সুন্দরকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে অসুন্দরকে হনন করিতে হইবে। আজ আমরা বাঙলাদেশে এই অসুন্দরের বীভৎস নৃত্য সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ আজও জীবিত আছেন, তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টিগুলি বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে পুরাতন হইবার পূর্বেই অতি নূতনের চাপে সেগুলি লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বীভৎসতার বন্যা কেন বহিতে সুরু করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমাদের একান্ত প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংহার মূর্তিতে একবার অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গবাণীর পূজামণ্ডপে আগাছার উচ্ছেদ করিয়া সুন্দরের জয় ঘোষণা করুন, যে সুন্দর, যে শিব তাঁহার এতকালের উপাস্য দেবতা তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াও যে তিনি কেন নিশ্চেষ্ট আছেন বুঝিতে পারি না।"

চার

প্রবন্ধশেষে সজনীকান্ত লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে যাহা দিয়াছেন তাহা তৌল করিয়া দেখিবার মত তুলাদণ্ড আজিও সৃষ্ট হয় নাই এবং কোনকালেই হইবে না। তাঁহার দান পর্বতের মত গুরুভার, এক্ষেত্রে শুধু নটরাজ পালা গানখানি লইয়াই তাঁহার শক্তির বিচার করিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র, আমি তাহা করি নাই। আমি একান্ত ভাবে 'নটরাজ' বইখানিরই সমালোচনা করিয়াছি—রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করি নাই।"

সজনীকান্তের এই উক্তি সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, তাঁর গুরুভক্তি অবিমিশ্র ছিল না। যুগসন্ধির দ্বন্দ্ব তাঁর মনেও কতকটা জ্ঞাতসারে কতকটা অজ্ঞাতসারে ক্রিয়াশীল ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর চিত্তে তা কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে তাও তিনি ভেবে দেখেন নি।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সজনীকান্ত যখন এই পাঁচ-কিস্তি গুরুনিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন প্রায় সেই সময়েই তিনি শনিবারের চিঠির সমর্থন কামনা করে রবীন্দ্রনাথকে চিঠিপত্র লিখছেন। তাঁকে লেখা কবিগুরুর ২৮ কার্তিক ১৩৩৪ ও ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ তারিখের দুখানি চিঠি [পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত] পড়লেই তা বুঝতে পারা যায়।

সজনীকান্তের এই 'দুই-আমি'র পারস্পরিক আত্মপ্রবঞ্চনাকেও আমরা পূর্বে যুগসন্ধির অনিবার্য লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু অরসিক রায়ের ছদ্মনামে সজনীকান্ত আত্মগোপন করতে পারলেন না। গুরুর কানে শিষ্যের এই কুকীর্তির কথা অনুরঞ্জিত ও অতিরঞ্জিত হয়ে নানা সূত্রে প্রেরিত হল। বিপদ এল আরেক দিক থেকে। সজনীকান্ত তখন 'প্রবাসী'র কর্মচারী। নবাগত 'বিচিত্রা' 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দ্বী। 'বিচিত্রা'র অত্যুৎসাহী সমর্থকগণ কবিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, কুকর্মটি সজনীকান্তের হাত দিয়েই হয়েছে বটে, কিন্তু এর মূলে 'প্রবাসী'র কর্তাদের গোপন হস্তও বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ এই ব্যাপারে রামানন্দবাবুকেও টেনে আনার চেষ্টা হল। সজনীকান্ত প্রমাদ গণলেন। এবং কৃত অপরাধের জন্যে কবিগুরুর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখলেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে সজনীকান্তের চিঠি এবং সঙ্গে সঙ্গে একই দিনে লেখা রবীন্দ্রনাথের উত্তর গুরুশিষ্য সম্পর্কের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। তাই পত্র দুখানি উদ্ধারযোগ্য :

সজনীকান্তের পত্র :

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৭

শ্রীচরণকমলেষু,

সাপ্তাহিক আত্মশক্তি'র কয়েক সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আপনার 'নটরাজ' গীতিনাট্যখানির সমালোচনাটি লইয়া কিছুদিন যাবৎ গোপনে ও প্রকাশ্যে একটু আন্দোলন চলিতেছিল পরম্পরায় তাহার আভাস পাইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার কিছু জবাবদিহি করিবার আছে কি না ভাবিয়া তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া এতকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই বা পত্র লিখি নাই। কিন্তু গত পরশু ও কাল প্রশান্তবাবুর সহিত দুই-একটি কথাবার্তার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, অবিলম্বে আপনার নিকট আমার নিজের দিকটা খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক নতুবা আমার সহিত অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জড়াইয়া অকারণে তাহাদের ক্ষতি করার চেষ্টা চলিতে পারে।

সমালোচনাটি আমার লেখা। অরসিক রায়ের নামের আড়ালে আমি যে-কারণেই আত্মগোপন করিয়া থাকি, ভাবিয়াছিলাম ওই নামটিই ওই প্রবন্ধটি সম্পর্কে অন্য আলোচনার অবকাশ দিবে না। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি বাংলা দেশে লেখার দ্বারা লেখার বিচার হয় না, লেখকের কুলজীকোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয়। এ দেশের লোকেরা সত্য-অনুসন্ধিৎসু, গোপনতম সত্যটি তাহারা টানিয়া বাহির করিবেই; কারণ কোন বিশেষ বস্তুর উপর স্বকপোলকল্পিত বিশেষ উদ্দেশ্যটি আরোপ করিতে না পারিলে তাহাদের সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখানো হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।...

আমি শুনিয়াছি আপনি এই লেখাটি সম্পর্কে একাধিক পত্র পাইয়াছেন, তাহার একটিতে নাকি লেখা আছে আমি অপরের প্ররোচনায় প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম,...ইহাও কেহ বলিয়া থাকিবেন যে, যেহেতু আমি 'প্রবাসী' অফিসের বেতনভোগী কর্মচারী এবং যেহেতু 'বিচিত্রা' পত্রিকাটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দ্বী সেই হেতু শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে দিয়া এই প্রবন্ধ লিখাইয়া 'বিচিত্রা'কে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনাকে জানাইতেছি আমার লিখিত উক্ত সমালোচনাটিতে সত্য, মিথ্যা, বাতুলতা, প্রলাপ, ঔদ্ধত্য, ঈর্ষা যাহা কিছু আছে তাহা সম্পূর্ণ আমার, অন্য কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্র প্ররোচনা বা অংশ নাই।...

যে রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বেনামীতে 'মেঘনাদবধে'র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, যিনি বয়সের হিসাব ভুলিয়া গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ [বড়দাদা], চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহিত সত্যের খাতিরে দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর নন-কো-অপারেশন আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী নৈতিক ভয় দূর করিবার জন্য "সত্যের আহ্বান" করিয়াছিলেন, তিনিই যদি আজ কাহাকেও স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করিতে দেখিয়া গোপন অনুসন্ধান ও হীন চরবৃত্তির প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।... বাংলা দেশের মানুষকে আপনি ৬৭ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন, আমার ভয় হয়, পাছে যাহারা নিরন্তর আপনাকে ঘিরিয়া থাকে, তাহাদের ফেরে পড়িয়া আপনি ভুল করেন।...

আমার এই ২৬ বৎসরের জীবনে মানুষকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পাই নাই, সুতরাং ভুল করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনি বহুবর্ষ যাবৎ এই পৃথিবীর হালচাল দেখিয়া আসিতেছেন, আপনি ভুল করিবেন না, এ বিশ্বাস আমি করিতে পারি। আপনার অনেক ভক্ত আছে। কেহ কাছে

থাকিতে পায়, কেহ পায় না। দূরে যাহারা থাকে তাহাদের ভক্তি বিন্দুমাত্র কম নহে। অন্তত, আমার সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ, এবং এতকাল খোরাকও রবীন্দ্রনাথই যোগাইতেছেন। আমার ভক্তি বা শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ করেন তাহা হইলে আমার চরমতম শাস্তি ঘটিবে। আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া অন্তত সেই শাস্তিটুকু হইতে আমাকে রেহাই দিবেন।—প্রণত শ্রীসজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্রনাথের উত্তর :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আত্মশক্তিতে কয়েক সংখ্যা ধরে নটরাজের যে সুদীর্ঘ নিন্দাবাদ প্রকাশ হয়েছিল সেটা তোমার লেখা বলে আমি জানতুম না বা সন্দেহ করি নি। বাইরে থেকে চিঠি পাই। তার উত্তরে লিখি, যাঁদের আমি বন্ধু বলে বিশ্বাস করি তাঁরা আমার নিন্দা-প্রচারে আনন্দ বোধ করেন এত বারবার ইহার প্রমাণ পাইয়াছি যে ইহাতে আমি বিস্মিত হই না এবং এ কথা লইয়া আলোচনা করিতে আমার লেশমাত্র ইচ্ছা নাই।

নিঃসন্দেহ আমার দীর্ঘকালের কাব্যরচনায় মন্দ লেখা বিস্তর আছে। সেইগুলির উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া ইতিপূর্বে তুমি কখনো লেখ নাই। সম্প্রতি যদি আমার কোনো লেখা মন্দ হইয়া থাকে সেটা কি পাঁচখানা কাগজ ভরাইবার মতো এতই অসহ্য মন্দ? এ সম্বন্ধে তোমার মত যদি আমাকে লিখিয়া জানাইতে, আমার কৈফিয়ৎ আত্মীয়ভাবে তোমাকে জানাইতে পারিতাম। কিন্তু আত্মশক্তিতে তোমার সহিত পাল্লা দিতে পারি না, সে কথা তুমি জানো। এমন অবস্থায় ছাপার কাগজের উচ্চাসনে গুপ্তভাবে বসিয়া আমার প্রতি সরাসরি বিচারে যথেচ্ছ দণ্ড বিধান করা তোমার পক্ষে সহজ কিন্তু এমন কাজ তুমি করিতে পারো তাহা সন্দেহ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

মেঘনাদবধের সমালোচনা যখন লিখিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ১৫। তা ছাড়া তখন মাইকেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিম ও মহাত্মাজির সঙ্গে আমার যে দ্বন্দ্ব তাহা নৈতিক; তাহা কর্তব্যের বিশেষ প্ররোচনায়। বঙ্কিমের কোনো গ্রন্থের সাহিত্যিক সমালোচনা যদি করিতাম তবে প্রধান ঝোঁক দিতাম তাঁহার গুণের উপর, ত্রুটির উপর নহে, কারণ তাঁহার প্রতি

শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধাই পজিটিভ গুণকে বড় করিয়া দেখে। এই জন্যই রাজসিংহের সমালোচনা করিয়াছিলাম।

এত কথা লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি তোমার কথা জানাইয়াছ বলিয়াই লিখিতে হইল। ইতি ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁচ

নটরাজ-পর্ব শেষ হবার পরেই শুরু হল প্রমথ চৌধুরী-পর্ব। ১৩৩৫ সালের বৈশাখে মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলেন শনিবারের চিঠির তৎকালীন সম্পাদক নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তাঁর "শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—পেন্সিল ড্রয়িং" প্রবন্ধটি বৈশাখের চিঠিতে প্রকাশিত হয়ে মধুচক্র নয়, ভীমরুলের চাকে খোঁচা-মারার অবস্থা সৃষ্টি করল। প্রমথ চৌধুরী বিদগ্ধজনমণ্ডলীতে শুধু প্রসিদ্ধই নন, বাংলা সাহিত্যে তিনি একটি বিশেষ রীতির প্রবর্তক। তৎ-সম্পাদিত 'সবুজপত্র' প্রথম-সমরোত্তর বাংলা সাহিত্যে নবযুগের স্রষ্টা। পাণ্ডিত্যে ও আভিজাত্যে বীরবল বিদগ্ধ সাহিত্যিক-সমাজের গোষ্ঠীপতি। সুতরাং নীরদ চৌধুরীর প্রবন্ধটি তুমুল আন্দোলন ও তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি করল। ধূর্জটিপ্রসাদ, প্রবোধ বাগ্‌চী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন। সাময়িক-পত্রিকাগুলির মধ্যে 'ফরোয়ার্ড', 'বাংলার কথা', 'আত্মশক্তি', 'নবযুগ', 'কালিকলম', 'নাচঘর,'-এ প্রমথনাথের শিষ্যবৃন্দের তাণ্ডব শুরু হল। শনিবারের চিঠির দলে সেদিন মুখ্যত ছিলেন সম্পাদক নীরদচন্দ্র আর মুদ্রাকর-প্রকাশক সজনীকান্ত। জ্যৈষ্ঠের চিঠিতে সজনীকান্ত প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নূতন ঘৃতাহুতি দিলেন। লিখলেন, "বাংলা কাব্যসাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দান।" কাব্য হিসাবে 'সনেট পঞ্চাশৎ' যে কতটা অসার্থক তাই প্রমাণ করা ছিল সজনীকান্তের প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য। প্যারডি-পারংগম প্রবন্ধকার 'সনেট পঞ্চাশতে'র দুটি প্যারডিও রচনা করলেন—"বালিগঞ্জ" আর "বেগুন"। নীরদচন্দ্রও চুপ করে থাকার পাত্র নন। জ্যৈষ্ঠের চিঠিতেই তিনি তাঁর বৈশাখের প্রবন্ধের "জের" টানলেন। তাঁর পুনশ্চ ভাষণের বক্তব্য ছিল এই যে, প্রমথবাবুর বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনার গুণ অথবা দোষ নয়, সেটা হল তাঁর টেম্পারামেন্টের বিশেষত্ব। এই মার্কা-মারা বিশেষত্বের একটা সৌন্দর্য ও আকর্ষণ নিশ্চয়ই আছে। সমাজবিশেষে তার প্রয়োজনীয়তাও

আছে। কিন্তু, নীরদচন্দ্রের ভাষাতেই বলি, "আমাদের দেশে, আমাদের কালে, প্রমথবাবুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের এই উগ্র ও অবিরত আত্মপ্রকাশ ও তাঁহার ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল ফ্রিভোলিটি—শিক্ষা, সাহিত্য, ও "কালচারে"র পক্ষে একটা গুরুতর অনিষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।" সেদিনকার তরুণ নীরদচন্দ্রের ভাষা কোন্ স্তরে পৌঁছেছিল তার প্রমাণ "ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল ফ্রিভোলিটি" থেকে পাওয়া যাবে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠেই হাঙ্গামা শেষ হল না। আষাঢ়ে সজনীকান্ত প্রথম চৌধুরীর পাণ্ডিত্যের অর্থাৎ সংস্কৃত-জ্ঞানের উপর কটাক্ষ হানলেন "পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী" প্রবন্ধে। এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করলেন ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ।

শনিবারের চিঠির এই প্রমথ-বিদূষণ সঙ্গত হয়েছিল কি অসঙ্গত হয়েছিল তার বিচার করার স্থান এটি নয়। প্রবন্ধগুলি যে অশ্রদ্ধাপ্রসূত ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সজনীকান্তকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শ্রদ্ধাই পজিটিভ গুণকে বড় করিয়া দেখে।" অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে নিগেটিভ দিকগুলি তিলবৎ হয়েও তালপ্রমাণ হয়ে দেখা দেয়। সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে শনিবারের চিঠির এই পর্যায়ের লেখাগুলিকে বলেছেন, অতি-পাণ্ডিত্যের ভান।

বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হলেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর একান্ত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর স্বামী। তাঁর বিশেষ স্নেহভাজনের ওপর এই মাত্রাতিরেকী আক্রমণে তিনি শনিবারের চিঠির ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। শনিবারের চিঠির 'কম্‌প্লিমেন্টারি কপি' তাঁকে পাঠানো হত। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। স্বহস্তে 'রিফিউজ্‌ড' লিখে পত্রিকা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। শনিবারের চিঠির প্রমথনীতি সম্পর্কে নিজের নৈতিক অসমর্থন এর চেয়ে সংযতভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতে পারতেন না। সজনীকান্ত মনে মনে প্রমাদ গণলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু বাইরে ভ্রূক্ষেপহীনতার ছদ্ম-গাম্ভীর্য দেখিয়ে প্রমথ চৌধুরীর ওপর আরও নির্মম হয়ে উঠলেন।

ছয়

১৩৩৫ সালের শ্রাবণ মাসের বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ একান্ত-সচিব অমিয় চক্রবর্তী শনিবারের চিঠির ওপর তীব্র আঘাত হানলেন 'সাহিত্যব্যবসায়' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটিতে 'দেশমান্য সাহিত্যস্রষ্টা' প্রমথ চৌধুরীর ওপর চিঠির "ইতর" আক্রমণের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হল। চিঠির পক্ষের অনেকে মনে

করলেন প্রবন্ধটি দক্ষতর হস্তের বেনামী লেখা। ফলে চিঠির দলের তপ্ত মগজ তপ্ততর হয়ে উঠল। 'সাহিত্যব্যবসায়' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা—এই জনরব রবীন্দ্রনাথের নিকটেও পৌঁছল। কবি জানালেন, এই জনরব মিথ্যা। মোহিতলাল "অমিয় চক্রবর্তী বনাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রবন্ধে লিখলেন, "স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জানিয়েছেন যে জনরব মিথ্যা, ও-লেখা তাঁর নয়, এবং ও-লেখাব সঙ্গে তাঁর সহানুভূতিও নেই। জানি, জনরবটা বাইরের, আর রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ব্যক্তিগত, অর্থাৎ ভেতরের। এতে করে জনরবকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।" তবু চিঠির দল নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে, লেখাটি রবীন্দ্রনাথের নয়, তাঁর "খাস কলমচী" অমিয় চক্রবর্তীরই। তাই তাঁরা কবিগুরুকে আপাতত নিষ্কৃতি দিলেন।

শুধু নিষ্কৃতিই নয়, সে সময়কার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনায় শনিবারের চিঠি অপ্রত্যাশিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের মতকেই সমর্থন জানাল। ঘটনাটি ঘটেছিল সিটি কলেজের ছাত্রাবাস রামমোহন হস্টেলে সরস্বতী পুজোকে উপলক্ষ করে। ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ চেয়েছিলেন ছাত্রাবাসেই তাঁরা প্রতিমা বসিয়ে পুজো করবেন। কর্তৃপক্ষ তাতে আপত্তি জানালেন। এই নিয়ে হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হল। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা ছাত্রদের দাবি সমর্থন করলেন। সত্যাগ্রহ শুরু হল, সিটি কলেজে ছাত্র-ভরতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলল। সিটি-কলেজ উঠে যাবে উঠে যাবে এমন অবস্থা হল।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার এই জাতীয়-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দুর্দিনে, ব্রাহ্ম বলে নয়, উদার অসাম্প্রদায়িক মানবতার পূজারী বলেই, রবীন্দ্রনাথ কলেজ-কর্তৃপক্ষের সমর্থনে তাঁর লেখনী ধারণ করলেন। 'মডার্ন রিভিয়ু'তে একখানি চিঠি এবং 'প্রবাসী'তে "সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখলেন [প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫]। সেদিনকার রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যে স্থানকালনিরপেক্ষ একটা ধর্মাদর্শের বাণী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সাকার ও নিরাকার পূজার প্রসঙ্গে হিন্দু ব্রাহ্ম-কোন্দলে শনিবারের চিঠির সমর্থন কোন্‌দিকে যাবে তা অনুমান করা অসম্ভব ছিল না। সাপ্তাহিক চিঠির প্রতিষ্ঠাতৃত্রয় তিনজনেই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। কিন্তু এই ব্যাপারে উৎসাহ দেখালেন সবচেয়ে বেশি সজনীকান্ত। তাঁর কালাপাহাড়ী স্যাটায়ার "হিন্দু রিলিজিয়ন ইনসালটেড" 'মধু ও হুল' গ্রন্থে তারই সাক্ষীরূপে

বিরাজমান। সজনীকান্ত তখন 'প্রবাসী'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তা ছাড়া তাঁর অন্তরঙ্গজনের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তারই প্রভাব তাঁর অন্তরে অত্যুৎসাহী উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল কিনা বলা শক্ত। অথবা মানুষের মনের গতি স্বভাবকুটিল না হলেও রহস্যময়। রবীন্দ্রনাথের মতের সমর্থনের দ্বারা তাঁর বিরূপ চিত্তকে অনুকূলে আনয়ন করার গোপন বাসনা ওর মধ্যে নিহিত ছিল কিনা তাও বলা শক্ত।

১৩৩৫ সালের ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিদেশ-ভ্রমণে বেরলেন। ক্যানাডা, জাপান পরিভ্রমণ করে দেশে ফিরলেন চার মাস আট দিন পরে, ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে। [ভ্রমণকাল ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ই জুলাই ১৯২৯]। প্রবাস-গমনের জন্যে গুরুশিষ্যের মধ্যে যে বিচ্ছেদ রচিত হল তার ফলে সজনীকান্ত আত্মপরীক্ষার সুযোগ পেলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই আষাঢ়ের শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হল তাঁর "শ্রীচরণেষু" কবিতাটি। গুরুর উদ্দেশে লেখা শিষ্যের এই পত্রকবিতাটি সজনীকান্তের মনের নিগূঢ় দিকটিকে নির্বারিত করেছে। তাই কবিতাটি সমগ্রভাবেই এখানে উদ্ধারযোগ্য। সজনীকান্ত লিখছেন :

'অপরাধ করিতেছি,' কহিতেছে জনে জনে,
'হ'ব গুরুহত্যা-পাপভাগী'—
হে গুরু, আমরা জানি, তুমি জানো মনে মনে,
কেবা কত গুরু-অনুরাগী।
তুমি জানো, কেন এই গুরুনিন্দা নিষ্ঠুর বিলাস,
তোমার যা স্বপ্ন তারে কেন হেন ক্রূর উপহাস,
তোমারে তোমার অস্ত্র হানিবার কেন অভিলাষ,
হে দেবতা, হে ভূমা-বৈরাগী,
তুমি শুধু বুঝিয়াছ, এ নহে নিতান্ত আত্মনাশ,
মিথ্যা নিন্দা, নহি পাপভাগী।

অর্ধেক শতাব্দীব্যাপী করালে অমৃত পান,
সে অমৃতে বাখানি' গরল,
সত্য বটে। নহে গুরু, সে তোমার অপমান,
মোরা ক্লীব, মোরা হীনবল,
দেবভোগ্য সে অমৃতে পারি না করিতে আত্মসাৎ ;
স্বর্গের অমৃতধারা বিষ হ'য়ে ওঠে অকস্মাৎ।

ধরার অক্ষম জীব, ধরায় করি না পদপাত
শূন্যে ছুঁড়ি চরণ চঞ্চল।
জানিতে পার না তুমি, ধ্যানাসনে বসি দিনরাত,
সুধা কবে হয়েছে গরল।

আপনার কল্পনায় আপনি বিভোর রহি -
মহাবিশ্বে করিছ ভ্রমণ—
পিছু ফিরে দেখ নাই, সঙ্গী তব কেহ নহি,
তুমি একা, পথ সুবিজন!
অনন্ত যাত্রার মন্ত্র মহোল্লাসে আপনি উচ্চারি'
ভাবিছ তোমার পিছে মোরাও দিতেছি বুঝি পাড়ি,
যদি কভু মোহ টুটে দেখিবে দু'নয়ন বিস্ফারি'
নিজেরই ছায়ার সঞ্চরণ,
দূরে কাছে কেহ নাই, দীর্ঘ পথ দিগন্ত প্রসারী—
তুমি একা করিছ ভ্রমণ।

আপনি দেখিছ স্বপ্ন, ভাবে স্বপ্নাচ্ছন্ন মন,
স্বপ্নে স্বপ্নে চলিছে ধরণী!
জ্ঞানে কর্মে ব্যর্থ মোরা, রিক্ত মোরা, অকিঞ্চন,
ঘাটে বাঁধা মোদের তরণী।
তুমি ভাব সে তরণী পাড়ি দেয় বিশ্বপারাবার—
শোন নাই কোলাহল, শোন না ক্রন্দন হাহাকার,
কুটীর-প্রাঙ্গণে মোরা দ্বন্দ্ব করি আজো ক্ষুদ্রতার;
বহুদূরে স্বপন-সরণি?
তুমি একা যাত্রী সেথা, শিরে স্বপ্ন-কল্পনার ভার—
ধূলিপঙ্কে মলিন ধরণী।

বহু দুঃখে কহি, তুমি আমাদের নহ কভু,
সে নহে তোমার অপরাধ!
সঙ্গে নিতে চাহিও না আমরা অক্ষম, প্রভু,
দূর হ'তে কর আশীর্বাদ।

তুমি যে তুমিই আছ, সে তুমি সুবিরাট মহান্—
আমরা মাটির জীব, ধূলিপঙ্কে নিয়ত শয়ান—
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, কাছে গেলে করি অপমান,
না জানিয়া কত সাধি বাদ!
মত্ত স্বপ্ন-রসাবেশে তুমি চাহ করিবারে ত্রাণ,
সে নহে তোমার অপরাধ।

তোমারে পাড়িয়া গালি, নিজে হই সাবধানী,
তুমি ডাক, 'এসো দ্বন্দ্ব ভুলে।'
নাহি জান কত দূরে পারি যেতে, ক্ষুদ্র প্রাণী।
কাঁদি ব'সে সাগরের কূলে।
তোমার নিন্দার ছলে স্বর্গের অমৃতে নিন্দা করি—
মৃত্তিকার স্থূল-রসে পূজা করি দিবস-শর্বরী
ভয় হয়, দীপ্তি হানে তোমার প্রতিভা ভয়ংকরী-
প্রহরী আপনি পড়ে ঢুলে,
কাছে আসিও না গুরু, কর দয়া, দূরে যাও সরি—
ডাকিও না 'এসো দ্বন্দ্ব ভুলে।'

তুমি নামিও না নীচে, ক'রো না মাটির স্তুতি,
সে তোমার মহা মিথ্যাচার!
আসিয়াছ এ ধরায় ললাটে স্বর্গের দ্যুতি
তুমি কেহ নহ মৃত্তিকার!
উর্ধ্ব হ'তে উর্ধ্বলোকে আপনার সঙ্গীতে বিহ্বল—
একেলা ছুটিয়া চল, ধূলি-পঙ্ক-ম্লান ধরাতল।
ঝরিয়া পড়ুক নিত্য সুধা তব সঙ্গীত তরল—
দীপ্ত হোক মৃত্তিকা-আঁধার—
কবি নহে মন্ত্রদাতা, ওষধি নহেক শতদল—
দূর কর এই মিথ্যাচার।

সাত

সজনীকান্ত লিখছেন, তাঁর এই 'প্রণতি-বাণ' গুরুর চরণ পর্যন্ত পৌঁছল না। তাঁর 'পুনর্মিলন-ব্যাকুলতা' ব্যর্থ হল। শুধু ব্যর্থই যে হল এমন নয়, এবার গুরুর নিকট থেকেই এল চরম আঘাত। সজনীকান্ত তখন 'প্রবাসী'র মুদ্রাকর। 'শনিবারের চিঠি'ও 'প্রবাসী' প্রেস থেকেই ছাপা হত। হঠাৎ 'প্রবাসী'-সম্পাদক-মহাশয় সজনীকান্তকে জরুরী তলব দিয়ে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। সেদিন ২২শে আষাঢ় ১৩৩৬, ইংরেজী ৬ই জুলাই ১৯২৯। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন কথা না বলে একখানি পত্র সজনীকান্তের হাতে তুলে দিলেন। পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের লেখা। 'প্রবাসী' -সম্পাদককে তিনি জানিয়েছেন, 'প্রবাসী' প্রেসে 'শনিবারের চিঠি' ছাপা হলে তিনি আর কোনপ্রকারে 'প্রবাসী'র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

সজনীকান্তের মাথায় বজ্র ভেঙে পড়ল। শনিবারের চিঠি বাস্তুহারা হল। সে আঘাতও না হয় সহ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর পুনর্মিলনের ব্যাকুলতা, তাঁর প্রণতি-বাণ? এই কি তার প্রতিদান? তরুণ শিষ্য অভিমানে কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জিত হলেন। প্রচণ্ড অভিমান ও প্রচণ্ডতর নৈরাশ্যে তিনি লিখলেন 'হেঁয়ালী' কবিতা। 'শ্রীচরণেষু' বেরিয়েছিল আষাঢ়ে, 'হেঁয়ালী' বেরল শ্রাবণে। সজনীকান্ত লিখছেন—

ঘুমে মগন সোনার পুরী কে রয় জাগি দুয়ারে,
মুক্তা পথে গড়িয়ে যায় শুঁকিয়া যায় শুয়ারে!
বন্ধু তোমার মিথ্যা আশা,
কাগে মাথায় বাঁধল বাসা,
কোকিল তবু ডিম পাড়ে না;
ইংরাজে আর বুয়ারে
লাগল কোথায় লাঠালাঠি, জাগ্‌ল হুক্কা হুয়ারে!

তোষাখানার রক্ষী হ'ল পোষা কুকুর শেয়ালে,
ঘুণ ধরিল পাকা বাঁশে, ফাট্‌ল পাষাণ দেয়াল এ।
কাব্য হঠাৎ গেল উবে,
পছিম কাঁধে চাপ্‌ল পূবে

পূবের ঋষি 'হলিউডে'
মাতেন মনের খেয়ালে,
নয়া-বাহন নাড়ুগোপাল ভূমানন্দে নেহালে।

বিশ্বপ্রেমিক গোরাচাঁদের নিত্যানন্দ মজুরী,
নোংরা শিখ কি ক্যানেডিয়ান তাহার হ'ল জহুরী!
লক্ষ্মীরে যে পেত্নী বানায়,
হাঁকিয়ে মোটর, যায় না থানায়—
নোংরা সে কয়? মিস্ মেয়ো হায়,
চাপ্‌ল কাঁধে বজুরই?
চুনো-গলির ফিরিঙ্গিনী বেহেস্ত-খসা raw-হুরী!

সাইগনে হায়, বাপের বাড়ীর 'বাইগনে' কে ভুলিয়া,
নকল বাপের স্কন্ধে চেপে নাক আসিল তুলিয়া!
হিন্দুয়ানীর গন্ধে কেঁপে,
কষ্টে বমি রাখল চেপে,
Star-এর-আঁখি ঠারের লোভে
'মুখোস' গেল খুলিয়া!
ঠাকুর-ঘরের ধূপের ঘ্রাণে নাক ঢাকিল নুলিয়া।

তিন ঠ্যাঙেতে বেরালছানা দাঁড়িয়ে আছে শিয়রে,
কুকুরছানা চরণ চাটে তক্তপোষের নিয়ড়ে।
মেনি বাঁদর চাপল কাঁধে,
ভেঙায় শ্রী-মুখ নিখুঁত ছাঁদে,
ঘুরঘুরে আর আরসোলারা
বাবরী চুলে বিহরে,
মহাকালের ডাক শুনিয়া শিব যে ভয়ে শিহরে।

* * *

স্বপ্নভাঙা নিঝর তোমার এই কি ছিল ললাটে
মনের লেখা পড়লে নাক দেখলে শুধু মলাটে!
দেখলে তবক চক্‌মকানি,
পোষা টিয়ার বক্‌বকানি

শুন্‌লে শুধু, সন্ধ্যা-ছায়ায়
চক্ষু তোমার ঘোলাটে।
খাইনি ব'লে তুমিও খাও ঠাকুর ঘরের কলাটে!

ছন্দ-পতন হয় কি না হয় বন্ধ করে লেখনী,
শৃগাল-কুকুরের ডাক ভুলিয়া, হিসাব ক'রে দেখনি!
কান কি তোমার সে কান আছে?
বেসুর স্তুতি কানের কাছে
অহরহ শুন্‌ছ প্রভু,
সাচ্চা ঝুটা শেখনি!
সন্দেহ হয়, মন্দ আরো তোমার ললাট-লেখনই!

পরের মুখে ঝাল খেয়েছ, পরের কথা শুনিয়া,
স্তাবক-তুষ্ট হে মহারাজ, হঠাৎ হ'লে খুনিয়া!
লেলিয়ে পুলিস পালিয়ে গেলে,
কেউটে কভু হয় না হেলে।
ভাবের বিশ্ব উঠ্‌ল ভ'রে,
নিঃস্ব মাটির দুনিয়া,
ধনুক-ছিলা ছিঁড়ল হঠাৎ স্বপন-তুলা ধুনিয়া!

স্বদেশ তোমায় চিনলে নাক এইটে হ'ল হেঁয়ালি,
ভাবছ বুঝি, বিদেশ করে তোমার যশের দেয়ালী!
সে ভুলও শিব, ভাঙবে তোমার,
শেক্সপীয়ার ও গ্যেটে হোমার,
রবেই বেঁচে, বল্‌বে তখন
এরাও কুকুর-শেয়ালই!
স্বদেশ স্মরি কাঁদবে তখন থাকবে না আর খেয়ালী!

* * *

শ্মশান-শিবে ধর্‌ল ছেঁকে পোষা শেয়াল কুকুরে,
শিব দেখিছে আপন ছায়া তাদের চোখের মুকুরে।
তারাই শুধু বুঝ্‌ল হা রে,

তাঁর প্রতিভা তপস্যারে,
কুকুর নিয়েই মত্ত মহেশ
প্রভাত-সন্ধ্যা-দুকুরে,
সাগর-সেঁচা সূর্য—সে কি অস্ত যাবে পুকুরে ?

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন, "এমন বর্বর কবিতা আমিও খুব বেশী লিখি নাই।" বলাই বাহুল্য, এই "বর্বরতা" রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর কবিচিত্তে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার ছিলেন কবির বিশেষ স্নেহের পাত্র। কবিগুরুর প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল অপরিসীম। শনিবারের চিঠিকেও তিনি কম ভালবাসতেন না। তিনি চিঠির হয়ে ওকালতি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন কবিগুরুর কাছে। কিন্তু তাতে কোনও ফলোদয় হল না। বরং কবি তাঁর ওপরেও অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। সে-সময় সুনীতিকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠির প্রতি তাঁর বিরূপতা কোথায় পৌঁছেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। সুনীতিকুমারকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মনে করেছিলুম তোমার খাতা থেকে আমার ছবিটাকে নির্বাসিত করব। তুমি রক্ষা করতে অনুরোধ করচ, রইল ওটা।

সেদিন তোমার সঙ্গে যে কথার আলোচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা এইখানে বলে রাখি। তুমি বলেছিলে শনিবারের চিঠিতে যাঁরা আমার অবমাননা করেচেন তাঁরা আমার ভক্ত, কেবল বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত কারণেই তাঁরা আমাকে আক্রমণ করে ক্ষোভ নিবৃত্তি করেচেন। কিছুকাল থেকেই এটা দেখেছি ব্যক্তিগত কারণ ঘটবার বহুকাল পূর্ব হতেই তাঁরা আমার নিন্দায় আনন্দ ভোগ করে এসেচেন। এটা দেখেছি যাঁরা কোনো দিন আমার লেখার কোনো গুণ ব্যাখ্যা করবার জন্যে একছত্রও লেখেন নি তাঁরাই নিন্দা করবার বেলাতেই অজস্র ভাবে বহু পল্লবিত করে লিখেচেন। সকল লেখকের রচনাতেই ভালোমন্দ দুইই থাকে কিন্তু ভালোটার সম্বন্ধে নীরব থেকে মন্দটাকেই দীর্ঘস্বরে ঘোষণা করার উৎসাহ শ্রদ্ধার লক্ষণ নয়। মোটের উপর যাকে আমরা নিন্দার্হ বলে জানি তার সম্বন্ধেই এরকম আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এরকম ব্যবহারকে নিন্দা করা যায় না। কেন না সকলেই আমার রচনা বা চরিত্রকে প্রশংসনীয় বলে মনে করবে এরকম প্রত্যাশা করাও লজ্জার

কথা। বাংলা দেশে আমার সম্বন্ধে এমন প্রত্যাশা করার হেতুই ঘটে নি। এঁরাই কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে থাকেন যে স্তাবকবৃন্দ আমাকে বেষ্টন করে সর্বদা যে স্তব-কোলাহল করে থাকেন তার দ্বারাই নিজের ত্রুটিবিচারে আমি অক্ষম। এঁরা নিজে আমাকে পরিবেষ্টন করে থাকেন না, যাঁরা থাকেন তাঁরা কী করেন সে সম্বন্ধে এঁদের অনভিজ্ঞ কল্পনা আমার প্রতি প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দেয়। কিছুকাল ধরে তুমি নিরন্তর আমার কাছে ছিলে, নিজের স্তব শোনবার আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাস তোমার দ্বারা পরিতৃপ্ত করবার কোনো চেষ্টা করেচি কিনা তার সাক্ষ্য তুমিই দিতে পারো। আমার যতদূর মনে পড়ে যেখানে তোমার কোনো গুণ দেখেচি সেখানে তোমার গোচরে ও অগোচরে তোমার স্তব আমিই করেচি। আমার বক্তব্য এই যে অসঙ্কোচে যাঁরা আমার নিন্দা করতে আনন্দ পান তাঁদের সংখ্যা অনেক এবং আমি তাঁদের দোষ দেব না, কিন্তু তাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান একথা বলা চলবে না।

সময় এসেচে যখন এসব ব্যাপারকে শান্তভাবে আমাকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের লোকের কাছ থেকে আমি যা পাই তা আমার প্রাপ্য নয় এবং যা না পাই তাই আমার প্রাপ্য এই হিসেবনিকেশের নালিশ তুলে কিছু লাভ হয় না। মানরক্ষাও হয় না। কিন্তু অনাত্মভাবে সত্যটাকে জেনে রাখা দরকার। চিত্তরঞ্জন কিংবা মহাত্মাজিকে দেশের লোকে কদাচিৎ প্রতিবাদ করেচে, এমন কি নিন্দাও করেচে কিন্তু অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েও গর্হিত ভাষায় কুৎসিত ভাবে তাঁদের প্রতি অসম্মান করেন নি, করতে পারলে আনন্দ পেতেন না তাও নয় কিন্তু সাহস করেন নি—কারণ তাঁরা জানেন দেশের লোক তা সহ্য করবে না। আমার সম্বন্ধে সে রকম সঙ্কোচের লেশমাত্র কারণ নেই—অনেকেই আমার নিন্দায় প্রীত হন এবং বাকি অধিকাংশই সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার প্রকাশ্য অপমানে দেশের লোকের চিত্তে বেদনা লাগে না, সুতরাং আমার প্রতি যাঁরা কুৎসা প্রয়োগ করেন তাঁদের ক্ষতি বিপদ বা তিরস্কারের আশঙ্কা নেই। এক হিসাবে তাঁরা সমস্ত দেশের প্রতিনিধি-স্বরূপেই এ কাজ করে থাকেন। সুতরাং তাঁরা উপলক্ষ্য মাত্র। যাঁরা আমার অন্ধ স্তাবক বলে কল্পিত, যাঁরা আমার সুহৃদ বলে গণ্য তাঁরা আমার এই অবমাননার কোনো প্রকাশ্য প্রতিকার করে থাকেন তারও কোনো প্রমাণ নেই। বুঝতে পারি প্রকাশ্যে অপমান করতে অপর পক্ষের যত সাহস ও নৈপুণ্য এ পক্ষের তা নেই, তার প্রধান

কারণ তাঁরা মনে মনে জানেন দেশের লোকের সহযোগিতার বল তাঁদের দিকে নয়। দেশের লোকের কাছে যে কোনো কারণে যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন তাঁদের ভাগ্যে এ রকম গ্লানি কোনো দেশে কখনোই ঘটে না—রাস্তার চৌমাথার মধ্যে এমন নির্যাতন নিঃসহায়ভাবে তাঁদের কখনোই ভোগ করতে হয় না। তাই বলচি এই ব্যাপারের মূল সত্যটাকে আমার জেনে নেওয়া এবং মেনে নেওয়া দরকার—আর তার পরে চিত্তকে অবিচলিত রাখা আরো দরকার। সত্তরের কাছে এসে পৌঁছেচি—আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেচে, এখন মনের সমস্ত শক্তি নিয়ে এই কামনা করচি যে এই হতভাগ্য আমি নামক বাহিরের পদার্থটার সমস্ত বোঝা এবং লাঞ্ছনা থেকে ভিতরের আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেন ইহলোক থেকে বিদায় নিতে পারে।

এই উপলক্ষ্যে সংক্ষেপে আর একটা কথা বলে রাখি। প্রকাশ করাই আমার স্বধর্ম—প্রকাশের প্রেরণাকে অবরুদ্ধ করা আমার পক্ষে ধর্মবিরুদ্ধ। আমার প্রকৃতিতে এই প্রকাশের নানা ধারার উৎস আছে—তাদের যেটাকেই আমি অগ্রাহ্য করব সেটাতেই আমার খর্বতা ঘটবে। প্রকাশ আর ভোগ এক জিনিস নয়—প্রকাশের অভিমুখিতা বাইরের দিকে, বস্তুত সেটাতেই অন্তঃপ্রকৃতির মুক্তি, ভোগের অভিমুখিতা ভিতরের দিকে, সেইটেতে তার অবরোধ। আমার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তোমার মনে আপত্তি উঠেচে। কিন্তু নাটক রচনার মধ্যে যে প্রকাশচেষ্টা, অভিনয়ের মধ্যেও তাই। রচনার মধ্যেই যদি কলুষ থাকে সেটা নিন্দনীয়, অভিনয়ের মধ্যে যদি থাকে সেও নিন্দনীয় —কিন্তু অভিনয় ব্যাপারের মধ্যেই আত্মলাঘবতা আছে এ কথা আমি মানি নে। আমার মধ্যে সৃষ্টিমুখী যতগুলো উদ্যম আছে তার প্রত্যেকটাকেই স্বীকার করতে আমি বাধ্য। তোমাদের অভ্যাস ও সংস্কারের বাধায় তোমরা যে দোষ কল্পনা করচ তার দ্বারা আমার চেষ্টাকে প্রতিরুদ্ধ করলে নিজের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হবে। ইতি ১১ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল [২৬ ডিসেম্বর, ১৯২৯]

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনীতিকুমারকে এই চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হলেন না। তিনি চিঠির একটা নকল সজনীকান্তের নিকটেও পাঠিয়ে দিলেন। এই চিঠি সজনীকান্তকে মর্মান্তিক আঘাত হানল। শনিবারের চিঠির দশাও তখন মুমূর্ষু। ১৩৩৬-এর কার্তিক সংখ্যা ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়ে চিঠি কিছুদিনের

মত বন্ধ হয়ে গেল। কার্তিকের চিঠিতে সজনীকান্ত লিখলেন সুদীর্ঘ কবিতা —'ভ্রান্তি'। সুনীতিকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে এই 'ভ্রান্তি'। সজনীকান্ত লেখেন :

জ্বলিতেছে তবু ধাতব সূর্য দুঃখ এই।
মিথ্যা এ কথা—তাঁর প্রতি দেশে শ্রদ্ধা নেই।
আপন করিতে জানে যেই জনা
তারি পায়ে সবে বিকায় আপনা,
"হব না আপন" যাঁহার সাধনা, শুধু তাঁরেই
আপন করিতে পারে নাই কেহ—সত্য এই।...

শ্রীচরণেষু, হেঁয়ালি ও ভ্রান্তি—১৩৩৬-এর আষাঢ়, শ্রাবণ ও কার্তিকে প্রকাশিত এই তিনটি কবিতা সজনীকান্তের মনের নিগূঢ় জটিলতাকেই শুধু প্রকাশ করছে না, কবিগুরু সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপটিকেও উদ্ঘাটিত করছে।

আট

সজনীকান্তের গুরুনিন্দা তুঙ্গশিখরে আরোহণ করল, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে [১৯৩১ ডিসেম্বর] কবিগুরুর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর জয়ন্তী-উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়েছিল। স্বভাবতই এই জয়ন্তীকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রচিত্ত বিশেষভাবে আত্মসন্ধানী ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিল। ২৩ বৈশাখ ১৩৩৮-এ লেখা 'জন্মদিন' কবিতায় কবি বলছেন :

রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
হয়ে আসে সমাপন।
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।

এই কবিতারই উপসংহারে কবি বলছেন :

এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে

শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ ;
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।'

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, দেশময় কবির সত্তর-বৎসরের জন্মোৎসব পালনের বিরাট আয়োজন চলছে, সেকথা মনে করেই কবি আত্ম-বিশ্লেষণমূলক কবিতা 'জন্মদিনে' লিখলেন, 'প্রবাসী' ১৩৩৮ পৌষ সংখ্যায়। কবিতাটি "অপূর্ণ" নামে 'পরিশেষ' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। কবি বলছেন :

কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,
কত-না সংশয় তর্ক, কত-না বিশ্বাস,
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত-না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা,—
মনগড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিন ভেঙে করে ঢেলা,
অতীতের বোঝা হতে আবর্জনা কত
জটিল অভ্যাসে পরিণত,
বাতাসে বাতাসে ভাসা বাক্যহীন কত-না আদেশ
দেহহীন তর্জনী-নির্দেশ,
হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি
কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে দেয় পুনঃ মুছি,
কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব তরে
কত-না আকাশযাত্রা কল্পপক্ষভরে,
কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা,
কত জয় কত পরাভব—
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
ভালো মন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।

এই নিঃশেষ আত্মবিশ্লেষণ, এই বিচিত্র আত্মজিজ্ঞাসা থেকে স্পষ্টই বুঝতে

পারা যায় যে, কবি অহংকারে স্ফীত হয়ে জয়ন্তী-উৎসবে যোগদানের জন্যে মোটেই উন্মুখ হয়ে ছিলেন না। 'সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা" সম্পর্কে যিনি পূর্ণসচেতন তাঁর কবিমানসের অনাসক্তি সম্পর্কে ভুল হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু সজনীকান্ত ভুল করলেন। ভুল করার কিছু কারণও ছিল। এই সময়ে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় অভিজাত ত্রৈমাসিক-পত্রিকা 'পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছে [শ্রাবণ ১৩৩৮]। পরিচয়ের দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক পত্রিকার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে এক পত্র-প্রবন্ধ লিখলেন। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় লিখলেন কবি বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা-মূলক "নবীন কবি" প্রবন্ধ। [বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৮] কিছুদিন পূর্বেই য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করে কবি দেশে ফিরেছেন। বিদেশে তাঁর আঁকা ছবিগুলি প্রশংসা পেয়েছে। শান্তিনিকেতনে ১৩৩৮ সালের রাস-পূর্ণিমার দিন [৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮] শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে।" বললেন, "ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।"

রবীন্দ্রজয়ন্তী হল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। ২৫শে ডিসেম্বর খ্রীস্ট-জন্মদিনে তার সূত্রপাত। রবীন্দ্রজয়ন্তীর স্বরূপ এবং একে অবলম্বন করে 'শনিবারের চিঠি'র উষ্মার কারণ কী ও কোথায় তা ভাল করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রজয়ন্তী সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখছেন :

"বাংলাদেশে কবিমনীষীকে সংবর্ধনা জানাইবার এই প্রথম আয়োজন—ইহার অনুকূলে কোনো রাষ্ট্রশক্তি নাই, সাধারণ শিক্ষিত লোকের এই সমারোহ। কলিকাতা টাউন হলে উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার কর্ণধার অমল হোম—ক্যালকাটা ম্যুনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক। প্রদর্শনী ও মেলার ভার ছিল জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর উপর। রবীন্দ্রজয়ন্তী সাফল্য-মণ্ডিত করিবার দায়িত্ব বহুল পরিমাণে ছিল অমল হোমের। * * * অমল সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলিতে শুরু করে ; শরৎচন্দ্র তাঁহাকে এক পত্রে লেখেন, 'জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডী মাত্র তুমি, পেছনে থেকে তিনিই তোমাকে দিয়ে সব করাচ্ছেন। এ যে বাংলা দেশ, অমল। মনে ক্ষোভ রেখো না—যে যা বলে বলুক। দেশের মুখ রেখেছ তুমি।'

"২৫ ডিসেম্বর [৯ পৌষ ১৩৩৮] টাউন হলে কবির চিত্রপ্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন দিয়া জয়ন্তী-উৎসব আরম্ভ হইল। এ ছাড়া কবির নানা বয়সের প্রতিকৃতি, তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীও প্রদর্শিত হয়। ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সভায় ত্রিপুরা-রাজপরিবারের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার কথা বিবৃত করেন।

"সেই দিন অপরাহ্নে টাউন হলে সাহিত্যসম্মেলন আহূত হয়, এই সভায় শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। সেইদিন সন্ধ্যায় ও পরদিন সন্ধ্যায় [২৬ ডিসেম্বর] কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-হলে 'গীত-উৎসব' অনুষ্ঠিত হইল।

"২৭ ডিসেম্বর টাউন হলে কবিসংবর্ধনা। কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মেয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের তরফ হইতে অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিরূপে প্রতিভা দেবী, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের পক্ষ হইতে জগদীশচন্দ্র বসু [তিনি অসুস্থ হওয়ায় কবি কামিনী রায়] অভিনন্দন পাঠ করিলেন। অতঃপর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় The Golden Book of Tagore নামে প্রশস্তিগ্রন্থ, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-পরিচয় সভার প্রতিনিধিরূপে ক্ষিতিমোহন সেন 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' নামে গ্রন্থ কবিকে উপহার দিলেন। কবি প্রত্যেকটি অভিনন্দনের যথাযোগ্য প্রতিভাষণ দান করিলেন।

"ইহার পর একদিন (৩১ ডিসেম্বর] বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-হলে কলিকাতার ছাত্রসমাজ কর্তৃক কবিসংবর্ধনা হইল।

"এই ছাত্র-ছাত্রী-উৎসবের অঙ্গরূপে জোড়াসাঁকোর বাটিতে 'শাপমোচন' নাটিকার মূক অভিনয় ও নৃত্যগীত হয়।

"জয়ন্তী উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান ইন্‌ডিয়া সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর সদস্যদের কবিপ্রণাম। এইটি উৎসবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় নাই—কারণ, ৪ জানুয়ারি সংবাদ আসিল গান্ধীজি গ্রেপ্তার হইয়াছেন—উৎসব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ৫ জানুয়ারি শিল্পীদের অনুষ্ঠান হইল জোড়াসাঁকোর বাটীতে। * * *

"এইবারের জয়ন্তী-উৎসবে রবীন্দ্রনাথের দুইটি নব সৃষ্টি লোকে দেখিল; একটি তাঁহার অঙ্কিত ছবির প্রদর্শনী, অপরটি হইল 'শাপমোচনে'র অভিনয়।"

[রবীন্দ্রজীবনী-৩, সং অগ্রহায়ণ ১৩৬৮, পৃ° ৪১৮-১৯।

নয়

শনিবারের চিঠি কার্তিক ১৩৩৬ সংখ্যার পরই সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় প্রকাশিত হল ১৩৩৮-এর ভাদ্র মাসে। নবপর্যায় শনিবারের চিঠি প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ শনি-গোষ্ঠীর প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। সজনীকান্ত লিখছেন, প্রবাসী প্রেস থেকে চিঠির মুদ্রণ রহিত হওয়াতেও রবীন্দ্রনাথের যে ক্রোধ শান্তি হয় নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৩৩৮ আশ্বিনের 'স্বদেশে'। দার্জিলিঙে কবিগুরুর সঙ্গে নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ নজরুল 'স্বদেশে' প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। তাতে নজরুল লিখলেন :

"কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোন রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেমন চমৎকার ফুলঝুরির মত ফুল সেজে থাকে।...কবি হাসতে হাসতে বললেন, এই রকম আর একটি জীবের নাম করা চলে—দেখতে সে বেশ সুশ্রী ; কিন্তু সেও ঠিক ওই কারণে সাহিত্যের আসরে একেবারে একঘরে হয়ে আছে।

"আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।"

এই সজনে গাছ এবং মুরগী-প্রসঙ্গ সজনীকান্তকে যে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করবে তা বলাই বাহুল্য। 'পরিচয়' প্রকাশের পর আশ্বিনের [১৩৩৮] শনিবারের চিঠিতে 'পরিচয়'-মারী "পরিচিতি" লিখলেন চিঠির পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্যতম ডক্টর সুশীলকুমার দে। রবীন্দ্রনাথ তাতেও শনিবারের চিঠির উপর চটলেন। কার্তিকের বিচিত্রায় "নবীন কবি" প্রবন্ধে তিনি শনিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করে "সাহিত্যিক মোরগের লড়াই" কথাটা ব্যবহার করলেন, এবং এই সঙ্গে লিখলেন, "এই লড়াইয়ে কোনোদিন আমি যোগ দিইনি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েছি।"

কবিগুরুর এ আঘাত মর্মবিদারী। সজনীকান্ত লিখছেন, "আমাদেরও বয়স ছিল কম, রক্ত ছিল গরম। পূর্বের "সজনে ফুল" ও "মুরগী"র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া "সাহিত্যিক মোরগে"র উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল..."রবীন্দ্র-জয়ন্তী"কে কেন্দ্র করিয়া। * * * তখনই আমরা "জয়ন্তী-সংখ্যা" [মাঘ ১৩৩৮] প্রকাশ করিয়া ব্যাজস্তুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ করিয়া বসিলাম। * * * সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না ; বিশেষ করিয়া তাঁহার ছবিকে [রবীন্দ্রনাথের চিত্রসংবেদনা বা] "ছবিতা" আখ্যা দিয়া যে সচিত্র ব্যঙ্গরচনাটি

[আমার রচিত, হেমন্ত-চিত্রিত] আমাদের জয়ন্তী-সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, রবীন্দ্রনাথকে উত্ত্যক্ত ও মর্মাহত করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। তদ্ব্যতীত কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্রেও কম লঘুতা প্রকাশ পাইল না। মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসাপরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল।" [আত্মস্মৃতি-২ পৃ° ১৬৩-৬৪।]

দশ

জয়ন্তী-সংখ্যা শনিবারের চিঠির [মাঘ ১৩৩৮] সূচীপত্র নিম্নে সংকলিত হল :

১ 'কবি-বরণ' (কবিতা)—মোহিতলাল মজুমদার ; ২ 'জয়ন্তী' প্রবন্ধ ; ৩ প্রসঙ্গ-কথা ; ৪ নৃত্যময়ী (কবিতা) ; ৫ জয়জয়ন্তী (জনগণমন অধিনায়কের প্যারডি) ; ৬ চলচ্চিত্র (ব্যঙ্গচিত্র) ; ৭ রবীন্দ্রনাথের চিত্রসংবেদনা বা ছবিতা (প্রবন্ধ) ; ৮ বড়ো বুধুর বন্দনা (কবিতা) ; ৯ দি গোল্ডেন বুক অব ট্যাগোর ও জয়ন্তীউৎসর্গ (প্রবন্ধ) ; ১০ লটির পূজা (ব্যঙ্গ নাটিকা) ; ১১ সংবাদ-সাহিত্য ; ১২ রবীন্দ্রনাথ (প্রশস্তি কবিতা)—সজনীকান্ত দাস।

প্রথম ও শেষ দুটি কবিতা ছাড়া প্রতিটি লেখাই তীব্র তীক্ষ্ণ ও উগ্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পূর্ণ। কিন্তু জয়ন্তী উপলক্ষে শনিবারের চিঠির শ্রাদ্ধ-তর্পণ এইখানেই শুরু নয়, শুরু হয়েছে দু মাস আগে অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে। অগ্রহায়ণে সজনীকান্ত লিখলেন "জয়ন্তী" কবিতা :

মোরগ-লড়াই ভালই তো নয় বলছে যত বোষ্টমে,
বুনিয়াদের জমিদারি ঘুচবে এবার অষ্টমে ;
প্রভু এবার প্রবুদ্ধ,
গণ্ডূষে খাও সমুদ্র—
সুখ করেছ অষ্টপোয়া পড়বে এবার কষ্টমে।
মৃত্যু তোমায় জয় করিছে তাই হতেছে জয়ন্তী
শকুনি চিল হুক্কাহুয়া জুটল এসে অগণ্‌তি।
হট্টগোলের মাঝখানে,
এতই জানো, জানো না 'ঘর পায় না অতি-ঘরন্তী।'

বলাই বাহুল্য এই কবিতাটি এবং জয়ন্তী সংখ্যার 'বড়ো বুধুর বন্দনা'য় সাহিত্যিক মোরগের লড়াই এবং বুদ্ধবন্দনাকে সজনীকান্ত একসঙ্গে পাঞ্চ করেছেন।

প্রভাতকুমার বলেছেন, রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের দুটি নব সৃষ্টি লোকলোচনের গোচরীভূত হল: এক—কবির আঁকা ছবি, দুই—, 'শাপমোচনে'র নৃত্যাভিনয়। এই দুটি বিষয়েই রবীন্দ্র-বিরোধী সমাজের বিরূপতা ছিল প্রচণ্ড। সজনীকান্তের লেখা "রবীন্দ্রনাথের চিত্রসংবেদনা বা ছবিতা"য় এই বিরূপতাই ভাষা পেয়েছে। বাংলার ভদ্রঘরের মেয়েদের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্যাভিনয় রক্ষণশীল সমাজমানসে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তারই কাব্যরূপ ফুটে উঠেছে সজনীকান্তের "নৃত্যময়ী" কবিতায়। "নৃত্যময়ী" সাতটি স্তবকবন্ধে রচিত একটি প্যারডি। প্রথম তিন স্তবক নিম্নে উদ্ধৃত হল:

ছিনু একদিন কোন্ মহাঘুমে মজ্জিত—
নয়ন মেলিয়া দেখি একি আঁখি-ভ্রান্তি রে।
চৌদিকে মোর, করি বেশবাস বর্জিত
সুরসুন্দরী নাচে অপরূপকান্তি রে।
নাচে উল্লাসে মেনকা-রম্ভা-উর্বশী,
নৃত্যের তালে পড়ে কুন্তল-চুর খসি'
—দেহ হতে মোর নিতে চায় বুঝি প্রাণ ছিঁড়ে।

টানি নাই মাল মাধ্বী পৈষ্ঠী গৌড়ীয়া
সেবন করিনি চণ্ডু চরস গঞ্জিকা ;—
নহি উন্মাদ—উদোম ফিরি না দৌড়িয়া,
পথ চলি দেখে গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা।
তবে একি হল ? মরিয়া ঢুকিনু স্বর্গে কি ?
স্বপ্নের ঘোরে লভিনু চতুর্বর্গে কি ?
কিম্বা এ মায়া কল্পনা-অনুরঞ্জিকা।

—স্বর্গ এ নয়, ওরে মন, নয় কল্পনা
আহা মরি মরি। এ যে নিতান্ত সত্য রে।
নহে এ লাস্য হেমা-রম্ভার ছল্পনা ;
—বঙ্গমহিলা নাচিছে রঙ্গ-চত্বরে।
চরণে চরণে মঞ্জীর মৃদু গুঞ্জিয়া
তনুতরঙ্গে কলাকৌশল পুঞ্জিয়া
আপন নৃত্যে আপনি মগন মত্ত রে।

এসব রচনার সবটাই যে রবীন্দ্র-বিদূষণ-স্পৃহাপ্রণোদিত তা নয়। এর মধ্যে অনেকখানি ছিল রঙ্গ-ইয়ারকি ঠাট্টা-মশকরা। "জয়জয়ন্তী" 'ঘন ঘন ধনমপি নায়ক জয় হে জয়ন্তীভাগ্যবিধাতা' প্রভৃতি লেখাই তার প্রমাণ। এসব রচনার মধ্যে সজনীকান্তের লেখনীস্পর্শ লেগেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু এগুলিতে জয়ন্তী সম্পর্কে শনিমণ্ডলীর সমবেত দৃষ্টিভঙ্গিই ভাষা পেয়েছে। সজনীকান্তের নিজস্ব জয়ন্তী-অভিবাদন প্রকাশিত হয়েছে পৌষ-সংখ্যা শনিবারের চিঠির 'সংবাদ সাহিত্যে'। সংবাদ-সাহিত্যের সেই প্রসঙ্গটি এখানে সবটাই উদ্ধারযোগ্য। সজনীকান্ত বলছেন :

"জয়ন্তী উপলক্ষে সকলেই কবিকে অভিবাদন জানাইয়াছেন, আমরাও জানাইতেছি।

"হে রবীন্দ্র, যৌবনে তুমি শুধু কবিই ছিলে। সুরে, ছন্দে, সংগীতে বাণীকুঞ্জকে এমন করিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছ যে, তাহার ঝঙ্কার দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যুগে যুগে প্রতিধ্বনিত হইবে।

"তারপর তোমার 'বাণী'মুখর মূর্তি দেখিলাম। সেই 'বাণী' বহন করিয়া তুমি বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ। তোমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ বিস্তার করিয়া বিশ্বাকাশে উড্ডীন হইয়াছ, কোথাও বা শ্যামল প্রান্তরের পুষ্পপল্লবিত বৃক্ষের শাখাসন তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, কোথাও বা সযত্নরচিত রাজোদ্যানের সুরম্য কুঞ্জে বসিয়া আপনার কলসংগীত ধ্বনিত করিয়াছ।

"আজ এই বৃদ্ধ বয়সে দেশে ফিরিয়া আসিলে। তোমার আজীবন সাধনায় গঠিত সহস্রদীপোজ্জ্বল, বংশীবীণামুখরিত, মণিরত্নখচিত যে লক্ষমহল মর্মরহর্ম্য নির্মিত হইল তাহার দ্বারে আসিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ আমরা তোমার জয় উচ্চারণ করিলাম।

"তাহার কক্ষে কক্ষে যে হীরক প্রবাল, যে মণিমাণিক্য থরে বিথরে সঞ্চিত হইয়াছে, কুঞ্জে কুঞ্জে যে মালতী বেলা, টগর গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা অপূর্ব। কিন্তু হায় কবি, সকল কক্ষ, সকল কুঞ্জ, সকল বাতায়ন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, মানুষ কৈ ? শুভ্র শয্যা সজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু সে-শয্যায় আলুণ্ঠিত হৃদয়ের মর্মভেদী ক্রন্দন কোথায় ? বৈঠকে বিশাল ফরাস আস্তীর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রাণখোলা অট্টহাস্য কোথায় ?

"আজ তোমার জন্মোৎসবে তোমারই একটি সংগীত বার বার মনে পড়িতেছে।

শুধু তোমার বাণী নয়গো হে বন্ধু হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।

"হে কবি, তুমি যদি শুধু কবিই না হও, যদি বন্ধু হইয়া, প্রিয় হইয়া আজ আমাদের হৃদয়ে আপনার আসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, তবে শুধু তোমার বাণীর দ্বারা নহে, তোমার স্পর্শের দ্বারা প্রাণের বীণা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠুক।

"তোমার সুদূর দৃষ্টি আরও নিকটে সংহত করিয়া দেখ, আজ তোমারই মর্মর প্রাসাদের নিম্নতলে, তোমারই উৎসব-নৃত্যের কল-ঝঙ্কারকে ছাপাইয়া উঠিয়া কাহাদের আর্তধ্বনি গগনভেদী হইয়াছে। এই ধরার ধূলায় যাহাদের যাত্রা ; এই ধরণীর মাটীর ঘরে যাহাদের জন্ম মৃত্যু, বিবাহ ; ইহারই রৌদ্রে যাহাদের হাসি, বন্যায় যাহাদের কান্না ; তাহারা আজ তোমার দ্বারে আসিয়া সমবেত হইল, কিন্তু প্রবেশের অধিকার পাইতেছে না।

"আজ তোমার নিষ্কণ্টক ফুলময় রত্নসিংহাসন হইতে ক্ষণেকের জন্যও তাহাদের মাঝখানে নামিয়া আসিয়া কি বলিতে পারিবে, 'হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো দাও গো আমার হাতে' ? আজ কি সত্যই বলিতে পারিবে

হৃদয় আমার চায় গো দিতে
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় যে তার
যা-কিছু সঞ্চয়।

"এই জন্মোৎসবে আমাদের প্রার্থনা এই যে, তোমার দৃষ্টি আজি উর্ধ্বলোকের আকাশ-স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া নিম্নলোকের এই মাটীর স্বর্গে নিবদ্ধ হোক্, ক্রোধের আলোকে অসূয়ার ভঙ্গীতে নয়, প্রীতির সুষমায়, অনুভূতির গভীর বিস্ময়ে।

"এ বিশ্ব শুধু নীলাকাশের চন্দ্রাতপ, তারার দীপালি, ফুলের গন্ধধূপ, বীণার সঙ্গীত বন্দনা নহে। নটরাজের নূপুরনিক্কণিত নৃত্যের নৈপুণ্য ছাড়াও প্রমথের বীভৎস অট্টহাস্য, মহাকালের শবসাধনা রহিয়াছে। শুধু কুসুমকুঞ্জ নহে, কন্টকগুল্মও আছে, সে কন্টক যেন তোমাকে ভীত না করে, তাহার রক্তাক্ত তীক্ষ্ণাগ্র দেখিয়া যেন তোমার দক্ষিণ মুখ গুণ্ঠিত না হয়। বিশ্বের অন্তর্বর্তী এই স্বদেশ, স্বর্গের অপেক্ষা গরীয়সী এই জন্মভূমি, দেবতার অপেক্ষা প্রত্যক্ষতর এই মানুষ, তোমার বাণী নয়—তোমার স্পর্শ লাভ করুক, এবং তাহাদের পুণ্য স্পর্শ লাভ করিয়া তুমিও ধন্য হও ইহাই প্রার্থনা করি, হে কবি, হে রবীন্দ্রনাথ, তোমাকে আমরা নমস্কার করি।"

এই গদ্যরচনাটির সঙ্গে জয়ন্তী সংখ্যার 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি মিলিয়ে পড়লেই গুরুর প্রতি শিষ্যের মনোভাবটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 'সংবাদ-সাহিত্যে'র নিবন্ধে সজনীকান্তের ভাষা বক্রোক্তিতে পূর্ণ। কবিতায়ও বক্রোক্তির অভাব নেই, কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে উঠেছে কবিশিষ্যের কাব্য-অভিবাদন। এই কবিতায় সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে বিদ্যাসাগরকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপমা হিমালয়—এ কবিকল্পনা বিশুদ্ধ ভক্তদৃষ্টিরই পরিচায়ক।

নবম অধ্যায়

সত্যবাণী দেবীর দৌত্য

এক

জয়ন্তী-সংখ্যা প্রকাশের পরও বহুদিন শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্র-বিদূষণ অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল। সবচেয়ে ক্ষতিকারক হল চিঠির প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে মোহিতলালের লেখাগুলি। গুরুগম্ভীর সমালোচনার নামে মোহিতলাল সুকৌশলে রবীন্দ্রবিরোধিতা মাসের পর মাস চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং কল্পনাতীত একটি দিক থেকে ছিন্নসূত্র পুনর্যোজনার কাজ যবনিকার অন্তরালে গোপনে চলতে লাগল। প্রায় অসূর্যম্পশ্যা এক অভিজাতবংশীয়া নারীর কল্যাণী ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হল। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ থেকে শনিবারের চিঠিতে 'সত্যবাণী দেবী' নাম্নী এক নবাগত লেখিকার সমাজ ও ধর্মবিষয়ক নানা রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এই সত্যবাণী দেবী আসলে একটি ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামের অন্তরালবর্তিনী, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্রী শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী।

হেমন্তবালা ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের বিখ্যাত জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কন্যা এবং বিখ্যাত সুরকার বীরেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠা সহোদরা। হেমন্তবালার সূত্রে নাটোর ও গৌরীপুর—এই দুই অভিজাত জমিদার-

পরিবারের রাখীবন্ধন হয়েছিল। হেমন্তবালা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ জমিদার-পরিবারের কুলবধূ। জীবনের পরম আধ্যাত্মিক সংকটে তিনি 'কবিদাদা' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন। কবির কাছে তাঁর পরিচয় যখন স্পষ্ট হয় নি, তখন কবি এক পত্রে তাঁকে লিখছেন, "তোমার লেখা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে তুমি লিখিয়ে, অর্থাৎ আমাদেরি দলের লোক। তাই তোমার দাবি অগ্রাহ্য করা সম্ভব হোলো না।" [১৯ বৈশাখ, ১৩৩৮]। পত্রালাপ অন্তরঙ্গ হওয়ার পর এক চিঠিতে কবি লিখছেন, "তোমার চিঠির ভাষা কী সুন্দর। সহজ, গভীর, অকৃত্রিম। তোমার মন তোমার ভাষায় কোথাও বাধা পায়নি, ভাবনার ভঙ্গির সঙ্গে ভাষার ভঙ্গি লীলায়িত হয়ে চলেছে। এরকম লেখা সহজ নয়। অনেকবার ভাবি তোমার এই শক্তি কেবল চিঠি-লেখার খিড়কির রাস্তা দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া-আসা করে কেন? চিঠি লেখার ভঙ্গি দিয়েই সদরের জন্য কিছু কেন লেখ না। কোনো একটা সহজ বিষয় নিয়ে তোমার এক একটা চিঠি আমাকে বিস্মিত করে, আমার মনকে দুলিয়ে দেয়।"

বস্তুত হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল পত্রসাহিত্যের এক দুর্লভ সম্পদ। শুদ্ধান্তঃপুরিকা অন্য কোন অনাত্মীয়া নারী অপরিচয়ের অন্তরালে বসে কবির কাছ থেকে এত অন্তরঙ্গ সুরের কথা টেনে বের করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে ভেবেছিলেন হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিপত্রগুলি সংকলন করে নিজের ধর্মমত সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। কবির সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নি।

দুই

সজনীকান্তের প্রতি হেমন্তবালার স্নেহসম্পর্ক গড়ে ওঠার ইতিহাসটিও চিত্তাকর্ষক। ১৩৩৮ সালে শনিবারের চিঠি যখন নবপর্যায়ে প্রকাশিত হল তখন সজনীকান্ত ৫সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটের বাসিন্দা। এই চারতলা বাড়ির একতলায় ছিল তাঁর বৈঠকখানা, দোতলায় গ্রন্থাগার শয়নঘর ও রান্নাঘর। রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের ৫বি বাড়িটি ছিল একটি বিদ্যালয়। ৫এ বাড়িতে থাকতেন জমিদার রায়চৌধুরীরা। সজনীকান্তের তখন দুটি সন্তান—খোকন আর উমা। শিশু উমা তুরতুরে পায়ে বাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে প্রায় রাস্তায় নেমে যেত। উমাই এই দুই অসম পরিবারের মধ্যে সম্বন্ধ রচনার সেতু হল। রাস্তায় বেরিয়ে আসা এই সুশ্রী শিশুটির প্রতি অন্তঃপুর থেকে হেমন্তবালার দৃষ্টি

ছিল সজাগ। পিতামাতার সতর্ক পাহারা যখন সে পেরিয়ে যেত তখন তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করতেন হেমন্তবালা দেবী। ঝি কিংবা চাকরকে পাঠিয়ে উমাকে তিনি ধরে নিয়ে যেতেন নিজেদের বাড়িতে। পাঁচের-সি থেকে যখন উমার খোঁজ পড়ত তখন সে হেমন্তবালার পরম স্নেহে অজস্র আদর ও উপহার কুড়োচ্ছে। পাঁচের-এ থেকে উমার মা সুধারাণী যখন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতেন তখন তার হাতে অগুনতি খেলনা। হেমন্তবালার দুটি সন্তান—একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ওরা অবশ্য বয়সে বড়। কিছুদিনের মধ্যেই হেমন্তবালার মেয়ে বাসন্তী হল সুধারাণীর সখী। হেমন্তবালা হলেন মাসীমা। এইভাবেই উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক এই কাহিনীতে হেমন্তবালা সজনীকান্তেরও মাসীমা হলেন। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাসীমা হলেন মা। এক পত্রে সজনীকান্ত তাঁর মাকে লিখছেন, "আপনি আমাকে ও সুধারাণীকে বাবা-মার আসন দিয়াছেন—এত বড় সৌভাগ্যের দাবী করিতে না পারিলেও আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি যে সম্মান দিয়াছেন যেন তাহার উপযুক্ত হইতে পারি ইহাই কামনা করিতেছি। আপনাকে দেখি নাই কিন্তু আপনার স্নেহ যে আমাকে নিরন্তর ঘিরিয়া আছে তাহা বুঝিতে পারি। পূর্বজন্মকৃত বহু পুণ্যের ফলে এই জন্মে এই অপ্রত্যাশিত করুণা লাভ করিয়াছি—ইহা যেন না ভুলি। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি প্রণত শ্রীসজনীকান্ত।" [২৫।১০।১৯৩২]

হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তুমি আমাদেরি দলের লোক।" বস্তুত জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর শিল্পিসুলভ কৌতূহল ছিল অপরিসীম। অন্তরে অন্তরে তিনি বৈষ্ণব। সম্পূর্ণ নিজের সারস্বতসত্তা ও সাধনার বলেই তিনি প্রতিকূল পরিবেশকে অতিক্রম করে শিল্পকাব্যের আনন্দ ও সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হতে পারতেন। সজনীকান্ত, তাঁর স্ত্রী সুধারাণী এবং তাঁদের পুত্রকন্যার প্রতি তাঁর হৃদয় অপার বাৎসল্যরসে নিত্য পূর্ণ থাকত। সজনীকান্তের সঙ্গে সম্পর্কের প্রথম স্তরে সুধারাণী ছিলেন মধ্যবর্তিনী। সাহিত্য ও জীবনজিজ্ঞাসার অজস্র প্রশ্ন তিনি পাঠাতেন সুধারাণীর হাত দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কাছেও ছিল তাঁর শিল্পিমনের অপরিসীম কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। তার একটা বড় স্থান এক সময় অধিকার করে ছিল সজনীকান্তের সাহিত্যকর্ম ও সংসারজীবন। সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখছেন, "তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাতা অচিরকাল মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার উপাস্য রবীন্দ্রনাথ ও নবলব্ধ পুত্রের মনান্তর দুস্তর হইলেও দুরতিক্রম্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার অপরিসীম ভক্তির কথাও

তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। এই ব্যবধান তাঁহাকে পীড়িত করিত এবং গোপনে গোপনে দেবতার ও ভক্তের পুনঃসংযোগ স্থাপনে তিনিই যে পুরোহিতের ভূমিকা লইয়াছিলেন তাহা পরে জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি যখন আঘাতে আঘাতে বীতরাগ রবীন্দ্রনাথকে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত মনে করিতেছিলাম, তখনই যে হেমন্তবালা দেবী সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পত্রে আমারই দৈনন্দিন কৃতকর্মের ও পারিবারিক খুঁটিনাটির খবর দিয়া তাঁহাকে আমার প্রতি ক্ষমাশীল ও স্নেহশীল করিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা যখন জানিতে পারিলাম, তখন কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরিয়া গেল। তাঁহার সহৃদয় চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, এবং সফলতার দ্বারাই ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে।" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ ১৪৩-৪৪]।

কিছুদিন ধরে পত্রে বারবার সুবিস্তৃত সজনীকান্ত-প্রসঙ্গ উত্থাপন করার ফলে হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথের বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন। ১৩৩৯ সালের আশ্বিন-কার্তিক মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথের একাধিক পত্রে এই বিরক্তি ধরা পড়েছে। তারই কথা উল্লেখ করে সজনীকান্ত হেমন্তবালা দেবীকে লিখছেন, "আমাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে লেখার ফলে দেখিতেছি তিনি উত্যক্ত হইয়াছেন, আপনাদের এতদিনকার সম্পর্কে একটু আড়ষ্টতা আসিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের তার চড়ায় বাঁধা। আপনি তাহাতে ঘা দিয়া হয়তো নিজের ক্ষতি করিয়াছেন। আমাদের জন্যই আপনি ইহা করিতেছেন বলিয়া মনে মনে লজ্জা অনুভব করিতেছি। শেষের কয়খানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বারম্বার আপনার উত্তেজনার উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ দেখিতেছি, তিনি স্বয়ং উদ্বেজিত। আমাদের নামোল্লেখে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হইয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথকে এই সম্পর্কেই একটি চিঠি লিখিব, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম তাহাতে সুফল হইবে না। আমার সম্পাদিত কাগজে রবীন্দ্রনাথের সত্যমিথ্যা এত অধিক নিন্দা প্রচার হইয়াছে যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহজ সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব। তাহার চেষ্টা করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে দুঃখ দেওয়া হইবে। তবু আপনি যখন অনুমতি লইয়াছেন তখন আমি একটি চিঠি তাঁহাকে লিখিব। তাঁহার ধারণা —তাঁহার নিন্দার ব্যবসায় এদেশে লাভজনক। ইহা সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথের নিন্দা প্রচার করিয়া শনিবারের চিঠি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, লাভবান হয় নাই।...

"রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত আমার লেখা পড়েন না, আমার ছয়খানি বই প্রকাশিত হইয়াছে; কোনোখানিই রবীন্দ্রনাথকে পাঠাই নাই। অথচ একজন লেখককে বুঝিবার পক্ষে তাহার লেখাই একমাত্র সূত্র। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুবিধা আছে। তাঁহার লেখা আমরা পড়িতে বাধ্য। তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারি, অথচ আমার লেখা তাঁহাকে পড়াইতে পারি না। তাঁহাকে যাঁহারা বই পাঠান তাঁহাদের প্রতি তিনি প্রসন্ন নহেন, আপনার চিঠিতেই তার প্রমাণ আছে, বরঞ্চ তাঁহাদের লইয়া তিনি বিদ্রূপই করেন। রবীন্দ্রনাথ যদি কষ্ট করিয়া আমার এক-আধখানা বই পড়িতেন আমার কিছু পরিচয় পাইতেন। আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুমতি পাইলে আমার বই তাঁহাকে পাঠাইব। তৎপূর্বে পাঠাইয়া লাঞ্ছিত হইতে চাহিনা।"

এই পত্রে আবার সজনীকান্তের মানস-জগতের দুটি বিপরীত কোটি একসঙ্গে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার কাজে হেমন্তবালা দেবীকে তিনি নিরুৎসাহ করতে চাইছেন, অন্যদিকে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বই পড়ুন। একদিকে শনিবারের চিঠির সম্পাদক হিসাবে তিনি বুঝতে পারছেন যে, তাঁর কাগজে রবীন্দ্রনাথের 'সত্যমিথ্যা' এত অধিক নিন্দা প্রচার করা হয়েছে যে, তাকে অতিক্রম করে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব, অন্যদিকে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর লেখা পড়লে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারবেন অন্তরে অন্তরে তিনি কত বড় রবীন্দ্রানুরাগী। সজনী-মানসের এই দুই বিপরীত কোটিই তাঁর সারস্বত কীর্তি ও কুকীর্তির মূল কারণ।

তিন

রবীন্দ্রনাথকে সজনীকান্ত সম্পর্কে সরাসরি চিঠি লেখার পূর্বে হেমন্তবালা দেবী কৌশলে গুরু-শিষ্যের মিলন ঘটাবার একটি চেষ্টা করেছিলেন। ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে তিনি সজনীকান্তকে পত্রদূত করে পাঠালেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। পারস্য-ভ্রমণ শেষে কবি দেশে ফিরেছেন ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ (৩রা জুন, ১৯৩২)। দেশে ফিরে এসে তিনি কিছুদিন খড়দহে গঙ্গার ঠিক গা-ঘেঁষে তৈরি-করা একটি প্রাসাদে বাস করছিলেন। ছেলের ওপর মা'র হুকুম হল, কবিকে লেখা তাঁর একটি জরুরি চিঠি নিয়ে খড়দহ

যেতে হবে। সজনীকান্ত যে এই অপূর্ব সুযোগ লাভে মনে মনে খুশি হয়েছিলেন তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তিনি প্রমাদও গণছিলেন। কেন না জয়ন্তী-সংখ্যার পরও তিন-চার মাস শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্র-বিদূষণ অব্যাহত গতিতেই চলছিল। কিন্তু মা'র আদেশ, 'না' বলার উপায় ছিল না। মা পুত্রবধূ মারফত যে হুকুম জারি করেছেন, তা অমান্য করার সাধ্য তাঁর ছিল না। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন, "সুধারাণীর নিকট প্রেরিত তাঁহার চিরকুটগুলির মর্যাদা প্রায় বাদশাহী পাঞ্জার সমান।"

অতএব সজনীকান্তকে দুরুদুরু বুকে খড়দহে কবি-সমীপে যেতে হল। খড়দহে মোহিতলালের এক সাহিত্যরসিক বন্ধু ছিলেন। সজনীকান্ত কলিকাতা থেকে ভোরবেলা রওনা হয়ে তাঁরই গৃহে প্রথমে দর্শন দিলেন। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা পাকা করে গৃহস্বামীর এক বিদুষী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে কবি-সন্দর্শনে যাত্রা করলেন। প্রাসাদে পৌঁছে সংবাদ পাওয়া গেল কবি দ্বিতলে আছেন। তার পরের বর্ণনা সজনীকান্তের ভাষাতেই ভাল মানাবে। তিনি লিখছেন :

"পুত্র রথীন্দ্রনাথ ভূতলে দ্বার রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায় নাই। রথীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে এক খণ্ড মসৃণ চামড়ার উপরে একটি লৌহশলাকার সাহায্যে ফুল তুলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলাম সেই চাহনিতেই ভড়কাইয়া গিয়া আমার সঙ্গিনী অন্তর্ধান হইতেছেন। তখন আর উপায় নাই। বসিয়াই রহিলাম। রথীন্দ্রনাথ খুব ধীর ও শান্ত কণ্ঠে ছোট্ট একটি প্রশ্নের চিমটি কাটিলেন—'কি, খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন?' আমার 'শনিবারের চিঠি'র মেজাজ সঙ্গে সঙ্গেই চাড়া দিয়া উঠিল; বলিয়া ফেলিলাম, 'আজ্ঞে, তার জন্যে এত কষ্ট করে এতখানি পথ আসবার দরকার ছিল না, আপনাদের সব খবর বাজারেই পাওয়া যায়।'" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ১৯৮-৯৯]

সেদিনকার অসংবৃত তরুণ সজনীকান্তের মেজাজ কত চড়া ছিল শেষ বাক্যটিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সজনীকান্ত লিখছেন, "শর নিক্ষেপ করিয়াই লজ্জা হইল, শান্ত কণ্ঠেই বলিলাম, দেখুন, আমি দূত, সুতরাং অবধ্য। রথীন্দ্রনাথের মুখে মৃদু প্রসন্ন হাসি দেখা দিল, বলিলেন, উপরে খবর গেছে, আপনি বসুন।"

অনতিবিলম্বে সংবাদবাহী ভৃত্যের অনুসরণ করে সজনীকান্ত কবি-সমীপে উপনীত হলেন। প্রণাম করে তাঁর হাতে হেমন্তবালা দেবীর পত্রখানি দিলেন। সজনীকান্ত বলছেন, নতমুখ নীরব রবীন্দ্রনাথ যেন একটা অবলম্বন পেয়ে বেঁচে গেলেন। হঠাৎ অপ্রসন্নতার ধাক্কা কাটিয়ে কবি যখন কথা আরম্ভ করলেন, সজনীকান্তের মনে হল, তিনি যেন একা বসে স্বগতোক্তি করছেন। সম্মুখেই ছিল গঙ্গা। নদীপ্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। বর্ষায় স্ফীত গঙ্গার গৈরিক জলধারার দিকে তাকিয়ে কবি বলতে লাগলেন, "এই নদীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ নাড়ির যোগ, আমি গঙ্গার সন্তান। এই গঙ্গা যেখানে পদ্মা হয়েছে, সেখান থেকে দক্ষিণে পাবনা পর্যন্ত এক সময় আমার বিচরণক্ষেত্র ছিল। একটু এগিয়ে এসে নীচে চেয়ে দেখ, আমার সে যুগের বিশ্বস্ত বাহন 'পদ্মা'র সংস্কার হচ্ছে। ওই 'পদ্মা'য় আমি দীর্ঘকাল বাস করেছি, ওকে আমি ভালবাসি, তাই ছাড়তে পারি নে। ও জীবনভোর অনেক খেটেছে, ওকে ছুটি দেওয়াই উচিত ছিল।"

কবির স্মৃতিপথে উদিত হল তাঁর যৌবনদিনের পদ্মাতীরের দিনগুলি। স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে তিনি বলতে লাগলেন, "আমি সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতুম। মাঝ-পদ্মায় কখন বোট থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব তা নিজেও জানতুম না। পুরনো মাঝি-মাল্লারা আমার মুখ-চোখের চেহারা দেখে টের পেত ; ডিঙি নিয়ে তৈরি থাকত তারা। যতক্ষণ দম থাকত মাথা তুলতুম না, শরীর অবশ হয়ে এলিয়ে এলে একটা হাত বাড়িয়ে দিতুম জলের ওপরে, মাঝিরা তৎপরতার সঙ্গে এসে আমাকে ডিঙিতে তুলে নিত। এই ছিল আমার দৈনন্দিন খেলা—সর্বনেশে খেলা, কি বল? ডুবে যে কেন যাই নি আজও তাই ভাবি, ওই মাঝি-মাল্লাদের দয়াতেই।" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ১৯৯-২০০]।

সেদিন ঘণ্টা দুই সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। সাহিত্য কিংবা সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে একটিও কথা রবীন্দ্রনাথ উত্থাপন করেন নি। কবির মন সজনীকান্ত সম্পর্কে যতই অপ্রসন্ন থাক, তাঁর অভিজাতসুলভ আতিথেয়তার বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হয় নি। কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপনমাত্র না করে তিনি সাক্ষাৎকারকে মধুর ও সুন্দর করে তুললেন। নিজের অতীত জীবনের অনেক গল্প বললেন। সজনীকান্ত লিখছেন, শরতের মেঘের মত হালকা মনে প্রসন্ন চিত্তে তিনি ঘরে ফিরে এলেন। এ সাক্ষাৎকারের মধ্যে অপূর্বত্ব

বা অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না, কিন্তু ওরই মধ্যে সজনীকান্ত দূরবিসর্পিত নূতন পথের সন্ধান পেলেন। হেমন্তবালা দেবীর উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হল।

চার

এই সাক্ষাৎকারের মাস তিনেক পরের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথকে লেখা হেমন্তবালা দেবীর চিঠির বিষয় ছিল বিচিত্র! যা তাঁর মনে হত তাই তিনি চিঠিতে লিখতেন। গুরুতর জীবনজিজ্ঞাসা থেকে কন্যা বাসন্তীর সঙ্গে ছেলেমানুষী মান-অভিমান, আদর-আব্দার পর্যন্ত। প্রতিদিন তাঁর আশেপাশে দুঃখের বা কৌতুকের যা কিছু ঘটছে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকত তাঁর চিঠিতে। শনিবারের চিঠির আপিসে কোন কোন সাহিত্যিক আসতেন, কি তাঁরা করতেন তারও বিস্তৃত বিবরণ থাকত। প্রতিবেশী সজনীকান্তের পারিবারিক খবরও কবিকে অনেক শুনতে হত। মায় চাল-ডাল-নুন-তেলের কথাও। হেমন্তবালার এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাহিনী ও বর্ণনা অনুক্ষণ-ব্যস্ত কবিদাদার পক্ষে যে সর্বদা-প্রীতিপ্রদ হত তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এই ভাবেই জননী তাঁর স্নেহভাজন পুত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিত্তের প্রাতিকূল্য ধীরে ধীরে দূরীভূত করার সজ্ঞান ও সচেতন প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৩৩৯ সালের ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিকে তাঁকে লেখা কবির চিঠিগুলি থেকে সজনীকান্ত-প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করলেই রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারা যাবে।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ (২৮? ভাদ্র ১৩৩৯)-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

"তুমি তোমার প্রতিবেশী সজনীকান্ত সম্বন্ধে লিখেচ। আমি চেষ্টা করি মনকে তার সম্বন্ধে সহজ করে রাখি। কারো প্রতি মনের মধ্যে বিরোধ জমিয়ে রাখতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি—আমি জানি সেটা আত্মাবমাননা। কিন্তু মানুষের অহমিকা প্রবল, সেখানে নিরন্তর আঘাত লাগ্‌লে মনকে শান্ত রাখা কঠিন, সেইজন্যে এই সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ থেকে মনকে সরিয়ে রেখে দিই। যেটা যথার্থ ক্ষোভের বিষয় সেটা এই যে, আমার দেশে আমার নিন্দার ব্যবসায়ে জীবিকা ভাল চলে, বুঝতে পারি আমার সম্বন্ধে তীব্র বিদ্বেষ কতদূর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আমার দেশে। আমার প্রতি আঘাত, আমাকে

অবমাননা দেশের লোককে কতই কম বেদনা দেয়। তা যদি না হোত আমার বিরুদ্ধে নিন্দার পণ্য এত লাভজনক হোত না। এটাকে জেনে নিয়ে শান্তভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আমাকে আঘাত করা দেশের লোকের পক্ষে এত নির্মম ভাবে সহজ হয়েছে সেটা হয়তো আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। আমি সত্যরক্ষার দিকে দৃষ্টি করেচি লোকের মন রক্ষার দিকে নয়। বিধাতা আমাকে যত প্রশ্রয় (?) দিয়েচেন এমন অতি অল্প লোককেই দিয়েচেন, অতএব আমার পক্ষে নালিশ শোভা পায় না। এসব কথার আলোচনা ভালো নয়, এতে আত্মলাঘব ঘটে।"

৪ঠা আশ্বিন ১৩৩৯, কবি লিখছেন :

"সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে তোমাদের মেলামেশা আছে বলে আমি বিরক্তি বোধ করি এমন সন্দেহমাত্র আমার পক্ষে অগৌরবের কথা। তোমার পূর্ব চিঠিতে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজনা দেখেই মনে করেছিলুম, আমার সম্বন্ধে লোকের অকারণ দ্রোহভাব পূর্বেও বারম্বার দেখেছি আবার বুঝি তারই লক্ষণ দেখা গেল সেই কথাই বলেছিলুম। আমার বন্ধু * * সজনীকান্তেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমন কি আমার দৃঢ় বিশ্বাস শনিবারের চিঠিকে তিনি আমার বিরুদ্ধে গোপনে উত্তেজিত করতে সহায়তা করেন। ও তাতে আনন্দ বোধও করে থাকেন। সে জন্যে আমি যদি * * র সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করতুম—তাহলে তার চেয়ে লজ্জার কথা আমার পক্ষে কিছু হতে পারত না। * *র সমাজ-মতের সঙ্গে আমার বিরোধ থাকাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে আমি হিন্দুসমাজের শত্রু অতএব কঠিন শাস্তির যোগ্য—অতএব সেই শাস্তির ব্যবস্থা করা তিনি কর্তব্য বলেই মনে করেন। শাস্তির প্রণালী ও রুচি সম্বন্ধে মানুষের স্বভাব ও শিক্ষা দায়িক—সে সম্বন্ধেও আমার আদর্শের সঙ্গে তাঁদের মিল না থাকতে পারে কিন্তু তাই নিয়ে যদি আমি বিবাদ করতে পারি তবে সেইটেই যথার্থ গ্লানির বিষয় হোতো। সজনীকান্ত কল্পনা করচেন তাঁর লেখনী দেশের লোকের মনে আমার বিরুদ্ধে স্থায়ী অবজ্ঞা সৃষ্টি করতে পারে। যদি তা যথার্থ সম্ভব হয় তবে সেটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। বুঝে রাখা ভালো আমার দেশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি। সেটাতে আমার যথার্থ কোনো লাঘবতা নেই। আমার রচনায় যদি কোনো গুণ থাকে সেটা সজনীকান্ত বা আর কারো মতামতের উপর নির্ভর করে না সেটা আমি নিশ্চিত জেনে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। একথাও আমি নিশ্চিত জানি যে বলাকা পূরবী প্রভৃতি আমার আধুনিক রচনা সজনীকান্ত যে সত্যই ভালোবাসেন না তা

নয়—তিনি যে চক্রান্তের মধ্যে আছেন তাতে সহজ মনে আমার এখনকার কিছুই ভালো লাগবার আন্তরিক স্বাধীনতা নেই। আমি তা নিয়ে যদি রাগারাগি করি তবে সেইটেই আমার শাস্তি।"

১লা অক্টোবর ১৯৩২ (১৫ ? আশ্বিন ১৩৩৯)-এর চিঠিতে আছে :

"সজনীকান্তের পরিবারের সঙ্গে তোমাদের সখ্য হয়েছে বলে তুমি যখন আমার অপ্রীতি কল্পনা করেছিলে, তখন বলেছিলেম, আমার মনের এমন বিকার যদি হোত তাহলে লজ্জিত হতুম। আমি কখনো বলিনে যে বিনা কারণে বিনা আমন্ত্রণে অতিশয় ঔদার্যের গরিমা দেখাবার জন্যে তার বাড়িতে হঠাৎ গিয়ে পড়বার জন্যে আমার ব্যগ্রতা আছে। যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করত তবে নিশ্চয় যেতুম—না করলেও অকস্মাৎ তার ওখানে না যাওয়াকে যদি তুমি আমার দুর্বলতা বল তবে নিঃসন্দেহ স্বীকার করব সে দুর্বলতা আমার আছে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তাদের সম্প্রীতি ঘটেচে বলে তোমাদের প্রতি বিমুখ হব সে দুর্বলতা আমার নেই। পূর্বটা আছে বলেই এটাও আমার থাকা উচিত ছিল এই যদি তোমার মত হয় তাহলে তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না এর বেশি আর কি বলব।"

৪ কার্তিক ১৩৩৯-এর চিঠিতে কবি লিখছেন :

"সজনীকান্ত যদি আমাকে চিঠি লিখতে চান নির্ভয়ে লিখতে বোলো। আমি কখনো তাঁকে অসম্মান করব না। যাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল বা মনের মিল নেই তাঁদের সঙ্গে সেই অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক কারণবশত আমার ব্যবহারকে কলুষিত করতে আমি অক্ষম। অনেক সময় দেখতে পাই আমার সঙ্গে সৌহার্দ্যের অভাব অহৈতুক। আমার অবাধ দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও তা দূর হয় না। যেহেতু আমি অতিমানব নই সেইজন্যে সেটা আমাকে বেদনা দেয় কিন্তু তাই বলে আমিও বেদনা দিয়ে তার শোধ নিতে গ্লানি বোধ করি। দৈবাৎ কখনো যদি আত্মবিস্মৃত হই তবে লজ্জা পাই।"

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা অনেক পরের আরেকখানা চিঠির অংশ সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে উদ্ধার করেছেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"হঠাৎ খবর পেলুম আমাদের বংশের কোন লোক সজনীকান্তকে নিন্দা করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে। কিছু দিন আগে সজনীকান্ত…পত্রে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে আমার কাছ থেকে লেখা চাইবার জন্যে আশ্রমে এসেছিলেন। আমি দিতে পারি নি, তাঁকে উপেক্ষা করা তার কারণ নয়।

এই অনুরোধ নিয়ে তাঁর ভাষায় ও ব্যবহারে আত্মলাঘব-জনক কিছুই প্রকাশ পায় নি। লেখার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ জানান নি এমন সম্পাদক অল্পই আছেন, তার দ্বারা তাঁরা আমাকে সম্মান করেচেন কিন্তু আত্ম-সম্মানের হানি করেচেন এমন কথা বলা অসঙ্গত। যা হোক আমাকে জড়িত করে এই রকম অন্যায় কুৎসাবাদের সৃষ্টি করায় আমি অত্যন্ত সংকোচ ও দুঃখ বোধ করচি।" [আত্মস্মৃতি-২ পৃ° ২৫০]।

রবীন্দ্রনাথের এসব চিঠিপত্র থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে হেমন্তবালা দেবী গুরুশিষ্যের বিচ্ছেদরেখা অনেকখানি হ্রস্ব করে এনেছিলেন। অনেকদিনের অস্বস্তিকর গুমোট কেটে গিয়ে এখন থেকে মিলনের সুবাতাস বইতে লাগল।

দশম অধ্যায়

পট পরিবর্তন

এক

১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসটি সজনীকান্তের জীবনে একটি স্মরণীয় মাস। ওরই কোন-একটি মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর "কে জাগে?" কবিতাটি রচিত হয়। সজনীকান্তের সারস্বত সাধনায় ওই কবিতাটি নবযুগারম্ভের সূচনা করে। 'অঙ্গুষ্ঠ'-'মনোদর্পণে'র ব্যঙ্গসুনিপুণ স্যাটায়ারিস্ট সজনীকান্ত ওই কবিতার মধ্য দিয়ে 'রাজহংস'-'মানস সরোবরে'র কবিভাষাটি আবিষ্কার করলেন। বাংলা-সাহিত্যে কবি সজনীকান্তের সত্য পরিচয় 'রাজহংসে'র কবিরূপে। সজনীকান্ত নিজে এই যুগকে বলেছেন তাঁর কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। আমরা বলতে চাই, কবি হিসাবে তাঁর নবজন্ম। রাজহংসের নাম-কবিতার নিম্নোদ্ধৃত কটি পঙ্‌ক্তিতে এই নবজীবনের মূলমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে:

> ধরণীর রাজহংস জীবনের অনন্ত প্রতীক—
> উড়িছে অনন্তকাল মহাকাল-আকাশ-সাগরে,
> নিম্নে কাল-কালিন্দীর তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ
> ডাকিতেছে যুগে যুগে ঝাঁপ দিতে সে তিমির-নীরে।
> ধরিতে পারে না তারে, ঊর্ধ্বে তার বিরাট প্রয়াণ।
> উচ্চে নীচে চলে দুই গতির প্রবাহ,
> চলিবে অনন্ত কাল, মিশিবে না কভু একেবারে।

কোটি কোটি গ্রহ-চন্দ্র, কোটি তারা পাইবে বিলয় ;
লক্ষ সৃষ্টি ধ্বংস হবে, জন্ম লবে সৃষ্টি নবতন।

সজনীকান্ত বলছেন, এক দুর্যোগের দুঃসময়ে তাঁর মানস-সরস্বতী তাঁকে যে মহাজীবন-পথের ইঙ্গিত দিলেন, এর পর থেকে বাকি জীবন সুখে-দুঃখে সেই পথকেই তিনি অবলম্বন করে চলেছেন। সে পথ ক্ষুদ্রের পথ নয়, সে পথ ভূমার পথ।

"কে জাগে ?" কবিতায় এই নতুন কবিদৃষ্টি নিয়ে নবজীবনের পথে সজনীকান্তের শুভযাত্রা শুরু হল। সজনীকান্ত যে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজেরই একজন, এই স্বাক্ষর রয়েছে "কে জাগে ?" কবিতায়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনেক ভুল-ভ্রান্তি, অনেক সংঘাত ও সংগ্রাম পেরিয়ে সজনীকান্ত রবীন্দ্র-গোত্রেই নিজের কবি-পরিচয় খুঁজে পেলেন। সজনীমানসের সেই আত্ম-পরিচয় লাভের ইতিহাসটি এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়।

দুই

১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসটি সজনীকান্তের জীবনে ক্রান্তিলগ্নের মর্যাদা দাবি করে। সজনীকান্তের বয়স তখন বত্রিশ বছর তিন মাস। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হলেন ৮ই অগ্রহায়ণ [১৯৩২-এর ২৪ নবেম্বর]। মাসিক বেতন তিন শো টাকা। আপাতত পাবেন দুশো করে। একশো জমা থাকবে। নিয়োগকর্তা হলেন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল এবং মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্সের আদর্শবাদী শিল্পপতি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। তাঁরই আদর্শপ্রচারের বাহন হিসাবে, তাঁরই পরিচালনাধীনে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত মাসিক 'উপাসনা' মাসিক 'বঙ্গশ্রী' নামে নব-রূপায়ণে প্রকাশিত হবে। সজনীকান্ত হবেন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক এবং মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ। কার্যালয় ৫৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট। 'বঙ্গশ্রী' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের মাঘ মাসে। সজনীকান্ত দু' বছর 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক হিসাবেই সজনীকান্তের সাহিত্যজীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়।

নিয়োগকর্তা ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন কোটালিপাড়ার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার ও সংরক্ষণ এবং

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শের রক্ষণাবেক্ষণ ছিল তাঁর আদর্শনিষ্ঠ জীবনের অন্যতম ব্রত। তাঁর ভাবাদর্শকে ভাষায় রূপায়িত করবার জন্যে তিনি একজন শক্তিশালী লেখকের সন্ধান করছিলেন। 'দৈনিক বসুমতী'র "সাময়িক প্রসঙ্গে" বঙ্কিমপ্রয়াণ দিবসে সজনীকান্তের লেখা "বঙ্কিমপ্রসঙ্গ" পড়ে তিনি সজনীকান্তের প্রতি আকৃষ্ট হন। হয়তো তাঁর আশা ছিল সজনীকান্তের লেখনীমুখে তাঁর ভাবাদর্শ ভাষা পাবে। সজনীকান্ত অবশ্য যে দু-বছর ভট্টাচার্য মহাশয়ের অধীনে চাকরি করেছেন সে দু-বছর যথাশক্তি তাঁর কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রানুশাসনে বিধিবদ্ধ জীবন যাপন করা সেদিন সজনীকান্তের পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল না। তাঁর অশাস্ত্রীয় জীবনচর্যার সঙ্গে ভট্টাচার্য আরোপিত অনুশাসনাবলীর দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠল। "বজ্র-আশীর্বাদ" কবিতায় [আশ্বিন ১৩৪১] সে দ্বন্দ্ব কাব্যচ্ছন্দে ভাষা পেয়েছে। সজনীকান্ত বললেন, "দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী।" বললেন, অন্যের অনুশাসন মেনে চলা তাঁর স্বভাবধর্ম নয়। বললেন :

> ত্রিদিবের অধীশ্বর আমি আছি—আর কেহ নাই,
> সৃজিয়া নিখিল বিশ্ব, সৃষ্টিধ্বংস করি আমি আপন খেয়ালে ;
> জন্ম আর মৃত্যু—এই জগতের সত্য ইতিহাস
> আমিই রচনা করি।
> ভোগ করি, করি ক্ষয়, অপচয়ে আনন্দ আমার—
> অতীতে করি না নতি, ভবিষ্যের করি না সঞ্চয়,
> যাহা আছে যাহা পাই, মুঠি ভরি উড়াই ফুৎকারে,
> অনন্ত কালের বক্ষে ক্ষণিকের বুদ্বুদ-বিলাস।

এই আত্মম্ভরিতা, এই অহংকৃত বিদ্রোহ, এই বেপরোয়া বেহিসেবিপনাই অনুত্তীর্ণযৌবন সজনীকান্তের মানসধর্ম। এদিক দিয়ে তিনি মনেপ্রাণে আধুনিক। কাজেই 'বঙ্গশ্রী'র বিধিনিষেধের মধ্যে তিনি দু' বছরের বেশি সময় কাটাতে পারলেন না। শিকল ছিঁড়ে বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে এলেন।

তিন

কিন্তু 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্তের সংগঠনমূলক সৃজনীশক্তির নবপরিচয় উদ্ঘাটিত হল। বস্তুত, মাসিক 'বিচিত্রা' ও ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'

প্রকাশের পর অমন সুসম্পাদিত পত্রিকা আর দেখা যায় নি। বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাসে 'বঙ্গশ্রী' ধ্রুপদী রীতির শেষ উদাহরণ।

লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবীণ ও নবীন, বাম ও দক্ষিণের অনেকেই মিলিত হলেন 'বঙ্গশ্রী'তে। নিয়মিত বিভাগগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিচিত্র জগৎ), বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে 'অন্তঃপুর'), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (বিদ্যার্থীদের জন্য 'চতুষ্পাঠী'), কিরণকুমার রায় ও শশাঙ্কমোহন চৌধুরী (পৃথিবীর নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংবাদ সম্বলিত 'সন্ধানী'), সম্পাদক স্বয়ং ('সৃষ্টিরহস্য' নামে 'বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ') এবং পরে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (বিজ্ঞান-জগৎ)। সাহিত্য সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধকার হিসাবে এলেন মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ ঘোষ, সুকুমার সেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, নীরদ চৌধুরী, প্রবোধ বাগচী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অমূল্যচন্দ্র সেন, প্রমথ বিশী ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাসাহিত্যে সীতা দেবী, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রবীন্দ্র মৈত্র, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী, বনফুল, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যে মোহিতলাল, সুশীলকুমার, কৃষ্ণধন দে, প্রমথ বিশী, হেম বাগচী ও সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং।

এই নামাবলীর মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'র সবাই যে ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিপক্ষ 'কল্লোল'-'কালিকলম' গোষ্ঠীরও অনেকেই ছিলেন। সজনীকান্ত লিখছেন, "মোটের উপর, বাংলা-সাহিত্যে উদিত ও উদীয়মান প্রায় সকলেই আসিয়া ধরা দিয়াছিলেন; দীনেশরঞ্জন দাস, মুরলীধর বসু ও যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক) সহ গোটা 'কল্লোল'-'কালিকলম' দলটাই আসিয়া জুটিয়াছিলেন, আসেন নাই কেবল অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব।" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ২২৫]। উক্তিটি অবশ্য 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর কথা-সাহিত্যিকদের সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেন না অনাগতদের মধ্যে কবি জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দেও আছেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'বঙ্গশ্রী'র আসরটি। সজনীকান্ত লিখেছেন, "সাহিত্যিকের আড্ডাই সাহিত্য-পত্রিকার প্রাণ; ঢিলাঢালা স্বাচ্ছন্দ্য, তক্তপোশ তাকিয়া তামাক তাম্বূল, অবাধ রাজা-উজিরমারী গল্প অথবা তীক্ষ্ণ কথার তরবারিক্রীড়ার মধ্যেই সাহিত্যের আড্ডা স্ফূর্তি লাভ করে।" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ ২২২]।

৫৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে 'বঙ্গশ্রী'র আসরটি ছিল চার মহল। প্রথম মহলে থাকতেন সহকারী-সম্পাদক কিরণ রায়, তিনি আপ্যায়িত করতেন নতুন আগন্তুকদের। তার পরের মহল ছিল সজনীকান্তের সম্পাদকীয় দপ্তর: এখানেই বসত 'বঙ্গশ্রী'র বিখ্যাত মজলিসটি। তৃতীয় মহলে ছিল সম্পাদকের খাস দরবার। চারিদিকে ঠাসা হাজার পাঁচেক বইয়ের মধ্যে বসে তিনি শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় নানা বিষয়ে লেখাপড়া এবং গভীর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে গুহ্য আলাপ-আলোচনা করতেন। চতুর্থ মহলে ছিল মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিংয়ের শাস্ত্র-প্রকাশবিভাগের সদাচারসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর ফরাস-তাকিয়া-সজ্জিত একটি প্রকাণ্ড হলঘর। তাঁদের কাজ শেষ হলে সেটি পরিণত হত সংগীত-জলসার আসরে। নলিনীকান্ত সরকার ছিলেন এই আসরের গীতিরসের মুখ্য যোগানদার। রাত গভীর হলে কোন-কোনদিন ধূমকেতুর মতন উদিত হতেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর চাদরের পুচ্ছতাড়নায় এবং সংগীতরসপ্রবাহে পবিত্র শাস্ত্রপ্রকাশবিভাগ পবিত্রতর হয়ে উঠত। সঙ্গে থাকতেন পতিতপাবন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

'বঙ্গশ্রী'কে ঘিরে প্রবীণ ও নবীন, বাম ও দক্ষিণ যে একত্র মিলিত হতে পেরেছিল কার কারণ ছিল সম্পাদক সজনীকান্তের উদার সাহিত্যবোধ, অকুণ্ঠ বন্ধুপ্রীতি এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। 'কল্লোল যুগে' সজনীকান্ত প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, "আসলে সজনীকান্ত তো 'কল্লোলে'রই লোক, ভুল করে অন্যপাড়ায় ঘর নিয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন, "শক্তিধর সজনীকান্ত। লেখনীতে তো বটেই, ব্যক্তিত্বেও।"

সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্তের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল ধৈর্য। অখ্যাতনামা নবীন লেখকের গল্প-উপন্যাস ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে শুনে যেতেন। পাঠ্য অপাঠ্য নির্বিচারে অমন বিচিত্রমনা কৌতূহলী পাঠকও খুব কম দেখা যায়। তাঁর আরেকটি বড় গুণ ছিল—তিনি ছিলেন সাহিত্যরসের উৎকৃষ্ট যাচনদার। কবিতাই হোক, আর গল্প উপন্যাস নাটকই হোক, কোন্ রচনাটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ছিল অভ্রান্তভাবে তীক্ষ্ণ। নতুন প্রতিভার আবিষ্কারে তিনি অপরিসীম আনন্দ লাভ করতেন। শক্তিমান তরুণ সাহিত্যিক তাঁর কাছে নিরুৎসাহ হয়েছেন, এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

চার

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁকে বাদ দিয়ে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। অথচ সত্যবাণী দেবীর দৌত্য সত্ত্বেও সজনীকান্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসপ্রতিকূলতা তখনও নিঃশেষে দূরীভূত হয় নি। বরং কবিগুরুর ক্রোধানলে সজনীকান্ত জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে নতুন নতুন ঘৃতাহুতিও দিচ্ছিলেন। ফলে 'শনিবারের চিঠি'র মতই রবীন্দ্রনাথের নামে প্রেরিত 'বঙ্গশ্রী'ও 'রিফিউজড' হয়ে ফিরে এল। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র সজনীকান্ত ছিলেন না। 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশের পনেরো মাস পরে ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের "গদ্য ছন্দ" প্রবন্ধটি 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত হল। ১৩৪০ সালের পূজাবকাশের প্রাক্কালে (সেপ্টেম্বর ১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছন্দ সম্বন্ধে যে দুটি বক্তৃতা দেন তার একটি হল 'গদ্য ছন্দ'। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত এই প্রবন্ধটি সজনীকান্ত সংগ্রহ করেন বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের কাছে। সর্ত ছিল যে, প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। সজনীকান্ত অনুমতির অপেক্ষা না করেই প্রবন্ধটি বৈশাখের 'বঙ্গশ্রী'তে ছেপে দিলেন। অনুমতি প্রার্থনা করে অবশ্য কবিকে পত্র লেখা হল, কিন্তু বৈশাখের তিন তারিখ পর্যন্ত তার কোনও উত্তর না আসায় সম্পাদক সজনীকান্ত বিপন্ন ও বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। মুশকিল আসান হল বৈশাখের চৌঠো। অফিসে গিয়ে সজনীকান্ত পেলেন সচিব-মারফত প্রেরিত কবিগুরুর অনুমতিপত্র। উল্লসিতচিত্তে গুদামজাত বৈশাখের 'বঙ্গশ্রী' বাজারে প্রকাশের ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরে সজনীকান্ত কবিগুরুর অনুমতিপ্রাপ্তির নেপথ্য-রহস্য আবিষ্কার করলেন। এবার কবিগুরুর দাক্ষিণ্যলাভের পথ সুগম করেছিলেন তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী সুধারাণী দেবী। নববর্ষের প্রথম দিনে সুধারাণী কবিগুরুকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার নববর্ষের প্রণাম পেয়েছি, তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

এই মাসের শেষভাগে আমি সিংহলে যাত্রা করব। কলকাতা হয়ে যেতে হবে। তখন সজনীকান্ত যদি কলকাতায় থাকেন তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তোমাকে হয় তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবেন।

বৎসরের আরম্ভে নানা ব্যাপারে আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুধারাণীর নববর্ষের প্রণাম যে কবিগুরুর সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে কোমল করে এনেছে পত্রে তার আভাস ফুটে উঠেছে। সজনীকান্ত লিখছেন, "দীর্ঘ সাত বৎসরের বিরতির পর এই চিঠিতে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম ঘণ্টা পড়িল।" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ২৬৫]। 'বঙ্গশ্রী'র চাকরিতে ততদিন ফাটল ধরেছে। তার জন্যে সজনীকান্ত অনিশ্চয়তাজনিত অস্বস্তি ভোগ করছিলেন। কিন্তু কবিগুরুর আশীর্বাদপত্রে গুরুশিষ্যের পুনর্মিলন সম্ভাবনার মায়াপ্রলেপে সে অস্বস্তির কাঁটাটুকু কোথায় মিলিয়ে গেল। সজনীকান্ত লিখছেন, "রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পাইলে সাহিত্যজীবনে যে-কোনও পরিণতির জন্য আমি প্রস্তুত হইতে পারিব—এই বোধ আমাকে সাহস দিল। আমি নির্ভয় হইলাম।" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ২৬৫]। সজনীকান্তের এই উক্তির আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

পাঁচ

বস্তুত, "কে জাগে ?" কবিতা রচনার পর সজনীকান্তের কাব্যসাধনার যে নবপর্যায়ের সূচনা হল সেখানে সজনীকান্ত একান্তভাবেই রবীন্দ্রশিষ্য। এতদিন তাঁর উপাসনা ছিল শত্রুভাবে। তাঁর তদ্গত চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে তির্যক ভঙ্গিতে—প্যারডি-রচনায়। "কে জাগে ?" কবিতায় রবীন্দ্রানুসরণ স্পষ্ট হল।

এখানে আমাদের বক্তব্যকে বিশদ করার প্রয়োজনে একটু কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের "শিশুতীর্থ" আর সজনীকান্তের "কে জাগে ?" কবিতা দুটির তুলনামূলক আলোচনা করলেই গুরুশিষ্যের সম্পর্কটি বুঝতে পারা যাবে। বুঝতে পারা যাবে সজনীকান্ত কি অর্থে কতটুকু রবীন্দ্রনিষ্ঠ কবি।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি তাঁর ইংরেজী 'দি চাইল্ড' কবিতার স্বকৃত বঙ্গানুবাদ। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে ভ্রমণকালে কবি যীশুখ্রীষ্টের জীবনী অবলম্বনে রচিত বিখ্যাত 'প্যাশন প্লে'টি দেখার পর 'দি চাইল্ড' কবিতাটি ইংরেজিতে রচনা করেন। বাংলায় 'শিশুতীর্থ' শিরোনামায় তার রূপান্তর ঘটে ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে। মানবপুত্র যীশুর জন্মকে প্রেক্ষাপটে

রেখে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় মানুষের চিরন্তন যাত্রার রহস্যরূপটি 'শিশুতীর্থে' পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মহাকালের পটভূমিতে যুগ-যুগান্তরব্যাপী মানবসভ্যতার নিগূঢ় ইতিহাসটিই ওই কবিতায় অভিব্যক্ত। জীবন-মৃত্যুর ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতরূপে নবজীবনের প্রতীক নবজাতকের আবির্ভাবই মানব-ইতিহাসের চিরন্তন সত্য—এই তত্ত্বটিই কবিতার উপজীব্য। ওই নবজাতকের জয়ধ্বনি করেই কবিতাটির উপসংহার রচিত হয়েছে—"জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।"

সজনীকান্তের "কে জাগে?" কবিতার শেষেও ওই নবজাতকেরই জয়ধ্বনি উচ্চারিত।—

শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াশা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসা রোড—
চলে চারিজন ক্লান্ত চরণে ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ,
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে!
সে ক্রূর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল।

সজনীকান্তের কবিতাটি রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থে'র ষোলো মাস পরে। কবিতাটি রচনার পশ্চাতে কবিমানসের যে উপলব্ধি ছিল তার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখছেন:

"মনের এই অবস্থায় নূতন আপিসে সাহিত্যিক হৈ-হৈ হট্টগোলের মজলিসের পর এক-একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে একা পথে বাহির হইয়া পড়িতাম, পায়ে হাঁটিয়া কখনও গঙ্গার ধার, কখনও বালিগঞ্জের লেক পর্যন্ত চলিয়া যাইতাম, অনেক রাত্রে শ্রান্তক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে ফিরিয়া আসিতাম। ফিরিবার পথে মনে হইত, এই কর্মব্যস্ত নগরী, এমন কি নিখিল চরাচর নিদ্রামগ্ন, আমিই একা জাগিয়া আছি। রসা রোড ও রাসবিহারী অ্যাভেনিউ জংশনের কাছে একদিন দেখিলাম, পৌষের নিদারুণ শীতের মধ্যে চারিজন শববাহক কাঁধের বোঝা লইয়া ক্লান্ত চরণে চলিয়াছে, বিবিধ জড়তার মধ্যে তাহাদের "বল হরি হরিবোল" অতি ক্ষীণ ও করুণ শুনাইতেছিল। আমার মন এমনিতেই চড়া সুরে বাঁধা ছিল। আমি তাহারই মধ্যে সমস্ত জীবন ও জগৎকে ব্যঙ্গ করিয়া মহাকালের অট্টহাসি

শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, ইহাই শেষ, ইহাই সমাপ্তি; ইহার পরে আর কিছু নাই; নিঃশেষ মৃত্যুই মানুষের অনিবার্য পরিণতি। অকস্মাৎ নিকটের কোনও দোতলা হইতে সদ্যোজাত শিশুর তীব্রতীক্ষ্ণ ক্রন্দন উত্থিত হইয়া নগরীর ধূম্রধূলিকুয়াশা-লাঞ্ছিত আকাশমণ্ডলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিমূঢ় জড়তাগ্রস্ত আমার চিত্তে বিদ্যুদ্দীপ্তিবৎ নূতন চেতনার সঞ্চার হইল, আমার দেবতা যেন এক নিমেষে আমাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন—মাভৈঃ, এই অনন্ত অখণ্ড প্রবাহের শেষ নাই। প্রতি মুহূর্তেই ধ্বংস ও মৃত্যুকে উপহাস করিয়া নব-জাতকের নূতন জন্ম হইতেছে, নবীন কিশলয় শুষ্ক গলিত পত্রের স্থান লইতেছে। সেই এক মুহূর্তে আমার ব্যর্থ ব্যথিত হতাশ জীবনের নবজন্মান্তর ঘটিল, আমি মরিতে মরিতে আবার বাঁচিয়া গেলাম।"

এই বিবৃতি থেকে "শিশুতীর্থে"র সঙ্গে "কে জাগে?"-র মিল এবং অমিল দুটিই ধরা পড়বে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পটভূমি সারা পৃথিবী। তার কাহিনী মানুষের সমগ্র ইতিহাসকে আশ্রয় করেছে। সজনীকান্তের কবিতাটির পটভূমি কলিকাতা। তার কাহিনী বর্তমান কালের প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় বিধৃত। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে দুটি কবিতা একই সত্যকে প্রকাশ করছে। 'শিশুতীর্থ' সর্বজনপরিচিত কবিতা। তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়বার জন্যে এখানে "কে জাগে?" সমগ্রভাবেই উদ্ধারযোগ্য:

শহরে সবাই ঘুমে অচেতন, জেগে আছে পেট্রোল
বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল—
কারো আঁখি লাল, কারো চোখ দুধ-সাদা;
আর জেগে রয় রাস্তার মোড়ে বীটের পুলিস যত।—
পৌষের শীত রাত্রি দুপুর বাজে।

জেগে আছে যারা পানের দোকানে মদের বেসাতি করে,
বিড়ির দোকানে কোকেন যাহারা বেচে;
চাটের দোকানে প্লেটে সজ্জিত কাঁকড়া, ডিমের ঝাল,
গলদা চিংড়ি, বেসনে পলতা-ভাজা—
শীতের হাওয়ায় শুকায়ে হয়েছে কাঠ।

জেগে আছে তারা এখনও যাদের জোটে নাই খদ্দের,
জুটেছে যাদের—পাখা খুলে দিয়ে ভূতের নৃত্য করে—

মদে আর গানে, চাটে, বাঁয়া-তবলায়।
স্খলিত বচনে ঘন ঘন তারা পানওয়ালারে ডাকে,
অকারণে চুমু খায়, হাসে, কাঁদে, গান গায় অকারণ।
বুদ্বুদ-সম কারেন্সি নোট হাওয়ায় মিলায়ে যায়।

জাগিয়া রয়েছে তাহাদের বধূ যাহারা ফেরে নি ঘরে,
মা-হতভাগিনী স্নেহময়ী কারো জাগে ;
রাত বাড়ে যত শুকাইছে বাড়া-ভাত,
সদর-দরজা খুলে দিতে হবে, ঘুমে ঢুলে আসে আঁখি।
সরিষার তেল প্রলেপ করিয়া চোখে
জাগে বধূ, তার জ্বালা-ধরা চোখ জলে ছলছল করে,
বুকের জ্বালার প্রলেপ পাশের ঘুমানো খোকার ঠোঁটে।
ললাটে তোলে না হাত,
অদৃষ্টেরে ধিক্কার দিলে পাছে লাগে অভিশাপ।
ভাবে ব'সে আর যত্নে লাগায় তালি,
দুইটি মাত্র পরনের শাড়ি ছিঁড়েছে ধোপার ঘরে।

যক্ষ্মার রোগী জাগিয়া কাসিছে ব'সে,
নয়নের জ্যোতি ঝাপসা হতেছে ক্রমে,
চারিদিকে যত মানুষ এবং ঘরবাড়ি গাছপালা
লাগে সুন্দরতর।
আঁকড়ি ধরিতে চাহিছে যখন, মুঠি খুলে খুলে যায়,
নিবে আসে ধীরে মলিন জীবন-বাতি।

তাহারই শিয়রে বসি
ক্লান্ত প্রেয়সী তন্দ্রায় জেগে আছে,
জাগিবে যে কত দিন!
যত জাগে তত সিঁথির সিঁদুর চওড়া ও গাঢ় করে,
হাতের নোয়ায় মনে হয় তার ঠিকরে হীরক-দ্যুতি।

জাগে কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে কাল যার আয়ু শেষ—
যে জন শোনে নি বহুকাল কানে, প্রিয়া ডাকে, "ওগো শোন"

সাধের কন্যা ডাকে, "শোন শোন, বাবা।"
সহসা শিহরি মর্মের মাঝে ডাক শুনে জেগে আছে ;—
কোথায় যেন রে বিনিদ্র ঘরে প্রিয়া ফেলে নিশ্বাস ;
ঘুমায়, তবুও খুকী ছটফট করে।
কম্বলে তার শুয়ে আধখানা, আধখানা গায়ে দিয়ে,
লাপ্‌সি ভুলিয়া আঁধার কক্ষে চেয়ে কড়িকাঠ পানে,
জাগ্রত আঁখি ঝাপসা যাদের হয়—
তারাও জাগিয়া আছে ;
তারা প্রতীক্ষা করে—
প্রিয়া-বাহুপাশ একদা জড়াবে গলে,
সাধের কন্যা কণ্ঠলগ্না হবে,
আছে আশা, আশা মনে তবু কত আছে।

কাল যার আয়ু শেষ—
সে জন জাগিয়া খোঁজে আকাশের তারা,
কঠিন পাষাণে বাধা পেয়ে চোখ দেয়ালে কি যেন খোঁজে,
চটা উঠে গিয়ে এখানে সেখানে ফুটে ওঠে কত ছবি,
কত চেনা মুখ, অচেনা ভঙ্গী কত ;
ভুলে যাওয়া কোন্ বাল্যসখীর ঠিক যেন এলো খোঁপা।
কবন্ধ আর ছিন্নমস্তা-ছায়া
দেয়ালে দেয়ালে জাগে—
চমকি জাগিলে মিলায় পলকপাতে।
মনে প'ড়ে যায়, পাশের বাড়ির মেয়ে
একদা আসিয়া বলেছিল কবে, ভেঙে গেছে পেন্সিল,
বেড়ে দিতে হবে—সকাতর অনুরোধ ;
ধমকিয়া তারে বলেছিল, নাহি হবে।
যে বেদনা-ছায়া নেমেছিল কালো চোখে,
সেই স্মৃতিখানি কেন তার মনে আসে,
কাল যার আয়ু শেষ !
মার আঁখিজল নহে,
কবে কোথা দ্রুত সাইকেলে যেতে, নেহাত অসাবধানে

চাপা পড়েছিল একটি কুকুরছানা,
তাহারই আর্তনাদ।

জাগে পাগলিনী, পাগলা-গারদে গরাদে রাখিয়া হাত,
ঘুম নাই তার চোখে,
মুখে হাসি ঘন-কান্নার মত ঠেকে,
পরনে জীর্ণবাস।
একে একে তার সন্তান যত মরিল কালের ঘায়ে—
জাগ্রত মহাকাল!
তাহাদেরই পথ চেয়ে জেগে আছে জননী উন্মাদিনী—
অন্ধকারের চরণ-শব্দ শোনে নিবিষ্ট মনে,
হঠাৎ হাসিয়া উঠে;
হঠাৎ আর্তনাদে
স্তব্ধ নিশার নিবিড় শান্তি ক্ষণ-বিঘ্নিত করি
ডাকে, আয় বাছা, হাঁটি হাঁটি পায় পায়।
প্রসারিত বাহু ব্যর্থ শীতল হয়,
স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়ে—
ফোঁটা ফোঁটা দুধ কারার ধূলায় পড়ে টপটপ করি—
যুগান্তরের সঞ্চিত কালো ধূলা।
সৃষ্টি শিহরি উঠে,
কাঁদে গতি-বন্যায়।

জাগিয়া রয়েছে কবি,
গগনে গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়,
মলিন যা কিছু যা কিছু অকল্যাণ—
সবারে ঢাকিয়া সেই সুর যেন নিখিল ছাপিয়া উঠে,
নয়ন ভাসিয়া যায়।

আর জাগে ভগবান—
জাগে নির্গুণ, পরম ব্রহ্ম, জাগেন নির্বিকার;
ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর,

অঙ্কুর মেলে পাতা, সেই পাতা শুকায়ে ঝরিয়া পড়ে—
তারে তিনি দেন কোল।
জাগে অশক্ত সর্বশক্তিমান—
জাগ্রত ভগবান।
শুধু হাসে মহাকাল—
হা-হা সেই হাসি শুনিলাম যেন রজনী-দ্বিপ্রহরে,
শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াশা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসারোড—
চলে চারিজন ক্লান্ত চরণে ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ,
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে।
সে ক্রূর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে
সেই জাগে চিরকাল।

ছয়

এই কবিতার সঙ্গে 'শিশুতীর্থ' কবিতার রূপ ও রূপকল্পগত সাদৃশ্যের দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। দুটি কবিতারই আরম্ভ অশুভ রাত্রির বীভৎস ও ভয়ংকর 'ইমেজ' দিয়ে। 'শিশুতীর্থ' কবিতার আরম্ভে আছে :

রাত কত হল ?
উত্তর মেলে না।
কেন না অন্ধ কাল যুগযুগান্তরের
গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের
চক্ষুকোটরের মতো ;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে ;
* * *
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট ;
* * *
কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে,

বলে, হায়, হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান
উচ্ছন্ন গেল।
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত
নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে,
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না।

"কে জাগে?" কবিতার আরম্ভেও এই ইমেজগুলিই কাব্যরূপ পেয়েছে। মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মত পাহাড়তলির অন্ধকারই মহানগরীর নিশীথ-রাত্রির 'বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল'-এর দুধসাদা এবং লাল চোখের রূপ গ্রহণ করেছে। বিকারের প্রলাপের মত যে বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো 'শিশুতীর্থে' অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিহীন উচ্ছিষ্টরূপে কবিদৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে সেই বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলোই বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে সজনীকান্তের কবিতার ষষ্ঠ থেকে দশম পঙ্‌ক্তিতে। বেপরোয়া কামিনীর যৌবনমদবিলসিত অট্টহাস্যই "কে জাগে?"-র একাদশ থেকে ষোড়শ পঙ্‌ক্তির "ভূতের নৃত্য" আর "স্খলিত বচনে"র মধ্যে ধরা দিয়েছে!

এই বীভৎস জীবলীলার পাশেই শিশুতীর্থে "ভক্তে"র আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত
তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;—
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু
খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত,
নিশাচর পাখি চীৎকার শব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই,
মানুষকে মহান বলে জেনো।

"কে জাগে?" কবিতায় রবীন্দ্রনাথের "ভক্ত"ই হয়েছে সজনীকান্তের "কবি"। তিনি বলছেন:

জাগিয়া রয়েছে কবি,
গগনে গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়
মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ—

সবারে ঢাকিয়া সেই সুর যেন
নিখিল ছাপিয়া উঠে,
নয়ন ভাসিয়া যায়।

বলাই বাহুল্য, দুটি কবিতার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু ভাববস্তুতে একটির উপর অন্যটির প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য।

সাত

রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' গদ্যছন্দে লেখা। সজনীকান্তের "কে জাগে ?" অমিল মুক্তবন্ধ ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দে রচিত। রবীন্দ্রনাথের ভাববস্তুকে সজনীকান্ত তাঁর নিজের যুগের উপলব্ধি ও তারই উপযুক্ত অথচ স্বকীয় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যের ঐতিহ্য এই ভাবেই যুগগত ভাষাকে আশ্রয় করে পূর্বাগত রিক্‌থকে যুগ থেকে যুগান্তরে বহন করে নিয়ে যায়। I. M. Parsons "The Progress of Poetry"র ভূমিকায় বলেছেন :

"...So that though it is true that the best poets in any age are those who are most successful in finding an idiom close enough to the world in which they live, it is also true that the poetical progress of any age can only be represented by those poets whose work is a genuine development of what has gone before..."

এই অর্থেই সজনীকান্ত কালের বিচারে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের কবি হয়েও ভাবাদর্শের বিচারে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যেরই কবি। তিনি একদিকে যেমন যুগচেতনার উপযুক্ত কবিভাষার সন্ধান পেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর কবিকৃতি পূর্ববর্তী যুগেরই স্বাভাবিক পরিণাম। এই অর্থেই "কে জাগে ?" থেকে সজনীকান্তের সারস্বত জীবনের উত্তর পর্যায়ের সূত্রপাত। তাঁর মানসলোকে রবীন্দ্রবিরোধিতার অবসান হয়ে রবীন্দ্রানুগত্যের সুবাতাস প্রবাহিত হতে লাগল। 'অঙ্গুষ্ঠ'-'মনোদর্পণে'র কবির চিত্তলোকে 'রাজহংস'-'মানস সরোবরে'র কবির জন্ম হল।

একাদশ অধ্যায়

কবিস্বীকৃতি

এক

সজনীকান্তের 'রাজহংস' কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল ১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে, ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে। কবির বয়স তখন পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে ছত্রিশ চলছে। আমরা বলেছি, বাংলা সাহিত্যে কবি সজনীকান্তের সত্য পরিচয় 'রাজহংসে'র কবিরূপে। 'রাজহংসে'র মুক্তবন্ধ ধ্বনিপ্রধান ছন্দেই সজনীকান্ত তাঁর স্বকীয় কবিভাষাটি আবিষ্কার করেছিলেন। 'রাজহংসে'র ছন্দ মুক্তবন্ধ। তানপ্রধান রীতির কয়েকটি কবিতাও ওতে আছে। সেগুলি 'বলাকা'রই অমিল অনুসরণ। ধ্বনি-প্রধান মুক্তবন্ধের রূপটি সজনীকান্তেরই আবিষ্কার— এ কথা বলা অবশ্য ঠিক হবে না। নজরুলের 'অগ্নিবীণা'র "বিদ্রোহী"তে তার প্রথম মুক্তিসম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তারপর কিছুদিন নিশিকান্ত 'বিচিত্রা'য় এই ছন্দমুক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। সজনীকান্ত প্রথমে 'শনিবারের চিঠি'তে "টুকরি" শীর্ষক কবিতাবলীতে তাঁর কল্পনার এই নবীন পক্ষিরাজকে লঘু-চটুল ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখলেন। 'শনিবারের চিঠি'র "রবীন্দ্র জয়ন্তী" সংখ্যায় প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথ" কবিতায় বাহনপরীক্ষার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হল। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু "কে জাগে ?" কবিতায়। তারপর রাজহংসের পাখায় ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতি উন্মুক্ত নীলাকাশে উদার মুক্তিলাভ করল। এই ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধানের অমিল মুক্তবন্ধ রূপটিই সজনীকান্তের বিশিষ্ট ছন্দবাহন।

'রাজহংস' প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সজনীকান্ত গ্রন্থখানিকে কবিগুরুর কাছে পাঠালেন। সরাসরি নয়, মধ্যস্থ হলেন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। কবি প্রমথনাথ বিশী দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ছাত্র। কবিগুরুর বিশেষ স্নেহের পাত্র। 'শনিবারের চিঠি' ও 'বঙ্গশ্রী'র অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর একজন। কাজেই সজনীকান্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থখানিকে কবিগুরুর কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে প্রমথনাথের শরণ নিলেন। রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের কবিত্ব-শক্তিকে স্বীকার করলেন। "রাজহংস বইখানি ভাল হয়েছে" বলে প্রশংসাও করলেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথকে লেখা কবিগুরুর পত্রখানি উদ্ধারযোগ্য :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অভিমত দিতে আমি একান্ত নারাজ—ভালোই বলি আর মন্দই বলি এতে দেশের দুর্মুখকে জাগিয়ে তোলা হয়। বড়ো অশান্তি, আমার বয়সে এই দুর্বিপাক থেকে নিষ্কৃতি দাবী করতে পারি। তোকে গোপনে বলি, রাজহংস বইখানি ভালো হয়েছে। আমার মতে কবিতার দুই জাত আছে ভালো এবং মন্দ। মাঝখানে যে সংকরবর্ণের আবির্ভাব দেখা যায় তাদের জাতিনির্ণয় করতে বৃথা পরিশ্রম না করাই শ্রেয়। এই ইসারাটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হলুম, এ নিয়ে হট্টগোল করিস নে।

ছন্দ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে গদ্য এবং পদ্য—কাব্যের এই দুই ছন্দ আছে। রাজহংসের ছন্দ স্পষ্টতই পদ্যছন্দ, তাকে তোর চিঠিতে গদ্যছন্দ কেন আখ্যা দিয়েছিলি বুঝতে পারলুম না। আমি আজকাল অনেকসময়ে গদ্যছন্দে কবিতা লিখি—আর কোনো ছন্দে ঠিক এই সকল ভাব বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই আমার এই অধ্যবসায়। কাজটা কিছুমাত্র সহজ নয় এ কথা জানিয়ে রাখলুম। সহজ মনে করে যদি প্রবৃত্ত হোস তবে হঠাৎ ঘাটের থেকে পড়বি পাঁকের মধ্যে। ইতি ১৯ এপ্রিল ১৯৩৬

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রখানি সজনীকান্তের আত্মশ্লাঘার যোগ্য বটে। যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত প্রকাশ্যে বলতে কুণ্ঠিত হয়েছেন, প্রমথনাথকে লিখেছেন, "ইসারাটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হলুম, এ নিয়ে হট্টগোল করিস নে", তবু এ কথা অস্পষ্ট রইল না যে, রবীন্দ্রনাথের মতে 'রাজহংসে'র কবিতাগুলি ভালো জাতের কবিতা।

দুই

সজনীকান্তের আত্মশ্লাঘার এর চেয়েও বড় হেতু রয়েছে অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথ 'জন্মদিনে'র "ঐকতান" কবিতায় বলেছেন :

"সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে
নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।"

রবীন্দ্রনাথের চিরগ্রহিষ্ণু মনের স্বীকরণ-ক্ষমতা ছিল অসামান্য। উত্তরসূরিবৃন্দের

মধ্যে নতুন কোন কবিকৃতি সার্থক হয়েছে দেখলেই তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হতেন। কখনও কখনও নিজের কাব্যসাধনায় তাকে গ্রহণও করেছেন। এমন কি যাঁরা "পথ রুধি বসি আছ রবীন্দ্র ঠাকুর" বলে তাঁদের কাব্যসাধনা আরম্ভ করেছেন সেই রবীন্দ্রবিদ্রোহী তরুণ-কবিসমাজের কাছেও ভাব ও প্রকাশরীতির অভিনবত্বের সন্ধান পেলে কবি তা গ্রহণ করতে পশ্চাৎপদ হন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের কবিসমাজকে প্রভাবিত করেছেন—এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের কবিগণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছেন —এ কথা যতই আপাত-বিস্ময়কর বলে মনে হোক না কেন, তা ঐতিহাসিক সত্য। 'পরবর্তী যুগ' বলতে অবশ্য আমরা কালের কথা চিন্তা করছি না, কবিমানস ও কাব্যধর্মের কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করছি। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য বা শিষ্যোপম, তন্নিষ্ঠ বা বিদ্রোহী, যে-সব কবির সারস্বত সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ নিজের সারস্বত সাধনায় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা শুধু সৌভাগ্যবানই নন, তাঁরা সেই সৌভাগ্যকে তাঁদের সারস্বত জীবনের পরম গৌরব ও চরম সার্থকতা বলেও মনে করতে পারেন।

বিষয়টি বিস্তৃত গবেষণা সাপেক্ষ। আমরা এখানে একটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা করব। রবীন্দ্র-বিদ্রোহী কল্লোল-যুগের অন্যতম কবিপ্রতিনিধি হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবিতাটি তাঁরই। নাম "নগর-প্রার্থনা"।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "নগর-প্রার্থনা" তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'প্রথমা'য় আছে। 'প্রথমা' ১৯৩০-এর আগে প্রকাশিত হয়েছে, সাময়িক পত্রিকায় কবিতাটির প্রকাশ তারও আগে। রবীন্দ্রনাথ 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থের "কলুষিত" কবিতাটি লিখেছেন ১৪ ভাদ্র ১৩৪২। অর্থাৎ 'প্রথমা' গ্রন্থাকারে প্রকাশের অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পরে। "কলুষিত" কবিতা রচনায় "নগর-প্রার্থনা"র প্রভাব প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। প্রভাবটি অবশ্য অন্যোন্য। "নগর-প্রার্থনা"র ভাব রবীন্দ্রানুসারী। কবিতাটি পড়লেই 'চৈতালি'র "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর" শীর্ষ-পঙ্‌ক্তিক সনেটকল্প কবিতাটি মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে 'মানসী'র "বধূ" কবিতাটিও। মনে পড়ে পাষাণকায়া রাজধানীর "ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট, নাইকো ভালোবাসা নাইকো খেলা"। সভ্যতার প্রতি সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হে নব-সভ্যতা, তুমি তোমার "লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর" ফিরিয়ে

নাও। নাগরিক সভ্যতার এই রূপই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পনায় হয়েছে লৌহ-কাষ্ঠ-শিলার কারাগার। তার চেয়েও বড় কথা, "নগর-প্রার্থনা"র সবচেয়ে উজ্জ্বল বাক্‌প্রতিমাটি প্রেমেন্দ্র মিত্র পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথেরই কাছে। নগরীকে তিনি বলেছেন, "উন্মত্তা নারী-কাপালিক"। সে পতিতা। তার শাপমুক্তির প্রার্থনায় কবি ভরতবচন উচ্চারণ করে বলছেন :

যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি,
ভেদ করি, ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি,
—সৌম্য-শুচি কুমার-সন্ন্যাসী
হে পতিতা তোমার আলয়ে।

পতিতার আলয়ে সৌম্যশুচি কুমার-সন্ন্যাসী-রূপে প্রভাতের আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের 'কথা'-কাব্যগ্রন্থের "অভিসার" কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় নগরী হয়েছে উন্মত্তা নারী-কাপালিক, রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় নগরীর নটী ছিল যৌবনমদে-মত্তা। 'অভিসারে'র শাপ-মোচনকারী সন্ন্যাসী 'কুমার কিশোর'। তাঁর 'নবীন গৌরকান্তি' আর 'সৌম্য সহাস করুণ বয়ান'ই প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রভাতকে 'সৌম্য-শুচি কুমার-সন্ন্যাসী'তে পরিণত করেছে। কিন্তু, এই অপূর্ব-সুন্দর বাক্‌প্রতিমাটি রবীন্দ্র-নাথের কাব্যলোক থেকে আহরিত হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে যেন নবজন্ম লাভ করেছে। কবিতার মূল ভাবটিও, রাবীন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও, প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবসৃষ্টি। এই নবসৃষ্টির নবীনতাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। তাই তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাক্‌প্রতিমাকে সানন্দে অনুসরণ করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাটি তানপ্রধান অমিল মুক্তবন্ধ ছন্দে লেখা। পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ৫৫। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিও তানপ্রধান মুক্তবন্ধ, কিন্তু সমিল, পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৬২। 'হে নগরী' সম্বোধনে দুটি কবিতারই আরম্ভ। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন :

আজি এই প্রভাতের আশীর্বাদখানি
লও তব মাথে,
হে নগরী,
লও তব ধূলি-ধূম-ধূম্র-জটা-বিভূষিত শিরে,
তব লৌহ কাষ্ঠ-শিলা কারাগার হতে,

রক্তমসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জরিত তব
কর দুটি জুড়ি
আজি এই প্রভাতেরে কর নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথও কলুষিত নগরীকে সম্বোধন করে কাব্যারম্ভে বলেছেন :

শ্যামল প্রাণের উৎস হতে
অবারিত পুণ্যস্রোতে
ধৌত হয় এ বিশ্বধরণী
দিবস-রজনী।
হে নগরী, আপনারে বঞ্চিত করেছ সেই স্নানে,
রচিয়াছ আবরণ কঠিন পাষাণে।
আছ নিত্য মলিন অশুচি,
তোমার ললাট হতে গেছে ঘুচি
প্রকৃতির স্বহস্তের লিখা
আশীর্বাদটিকা।
উষা দিব্যদীপ্তিহারা
তোমার দিগন্তে এসে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন :

তোমার ব্যথিত বক্ষে,
অন্ধকারে যেথা
অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড জ্বলে দিকে-দিকে,
হারায় কংকাল-পথ
বিকারের পয়োনালী মাঝে,
লুকায় সুড়ঙ্গ লাজভরে মৃত্তিকার তলে,
লোভ হিংসা ফেরে ছদ্মবেশে
অন্ধকারে নিঃশব্দ লোলুপ,—

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই ছদ্মবেশী 'লোভ হিংসা'ই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হয়েছে 'দ্বেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষ'। তিনি বলছেন :

দ্বেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষে
আলোহীন অন্তরের গুহাতলে হেথা রাখে পুষে
ইতরের অহংকার ;
গোপন দংশন তার ;

অশ্লীল তাহার ক্লিন্ন ভাষা
সৌজন্য-সংযম-নাশা।
দুর্গন্ধ পঙ্কের দিয়ে দাগা
মুখোসের অন্তরালে করে শ্লাঘা ;
সুরঙ্গ যেমন করে,
ব্যাপি দেয় নিন্দা ক্ষতি প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে।

বলাই বাহুল্য, দুটি কবিতার ভাব, বিষয়বস্তু, এমন কি ভাষাও প্রায় অভিন্ন। রূপকল্পগুলি অবিকল এক। দুই কবিতাতেই দেখতে পাওয়া যায়, অভিশপ্তা নগরী সুন্দরকে ভুলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহজ প্রাণকে ভুলে সে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে নিয়েছে। দুজনেই দেখেছেন যন্ত্রের জটিল পথে বিকলাঙ্গ জীবনের ব্যঙ্গ-সমারোহ। পার্থক্য এই যে, কলুষিত নগরীর শাপমোচনের জন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র এনেছেন প্রভাতের সৌম্য-শুচি কুমার-সন্ন্যাসীকে ; আর রবীন্দ্রনাথ এনেছেন রুদ্রের জটাবন্ধ হতে মুক্ত আকাশগঙ্গার প্লাবনকে। কিন্তু এই ব্যবধান সত্ত্বেও দুটি কবিতা একই প্রেরণা থেকে উৎসারিত। সমকালীন দুজন কবি একজন আরেকজনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আর, ভাবতে বিস্ময় লাগে, এ ক্ষেত্রে উত্তরসূরিই দাতা, পূর্বসূরি গ্রহীতা।

তিন

সজনীকান্তের ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান মুক্তবন্ধ ছন্দটিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'শ্যামলী'র উৎসর্গ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। উৎসর্গ কবিতাটি "কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাণী মহলানবীশ"-এর উদ্দেশে লেখা। পূর্বেই বলা হয়েছে, সজনীকান্তের 'রাজহংস' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪২ সালের চৈত্র মাসে। 'শ্যামলী'র উৎসর্গ-কবিতাটি লেখা ১৩৪৩ সালের ১লা ভাদ্র। 'শ্যামলী' রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে লেখা গ্রন্থ-চতুষ্টয়ের শেষ গ্রন্থ। কিন্তু উৎসর্গ-কবিতাটি লেখা হয়েছে পদ্যছন্দে—সজনীকান্তের ধ্বনিপ্রধান মুক্তবন্ধ রীতিতে। রবীন্দ্রনাথ এর পূর্বে ষণ্মাত্রিক মুক্তবন্ধ ধ্বনিপ্রধান রীতিতে কোন কবিতা রচনা করেন নি। কাজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অন্যায় হবে না যে, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তফাৎ এই যে, সজনীকান্তের কবিতাগুলিতে

অন্ত্যানুপ্রাস নেই, এই অর্থে সেগুলি অমিত্রাক্ষর; আর রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে অন্ত্যানুপ্রাস আছে—এই অর্থে তা মিত্রাক্ষর।

শুধু ছন্দের দিক দিয়েই যে রাজহংসের কবিতাগুলির সঙ্গে 'শ্যামলী'র উৎসর্গ-কবিতাটির মিল আছে তা নয়, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাচনভঙ্গির দিক দিয়েও একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়। 'রাজহংসে'র "পান্থপাদপ" কবিতাটির সঙ্গে 'শ্যামলী'র "উৎসর্গ" কবিতাটির ভাবগত নৈকট্য একটু বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "পান্থপাদপ" কবিতায় সজনীকান্ত তাঁর কবিমানসে আবির্ভূতা বিভিন্না নায়িকার আলো-আঁধারি লীলার স্মৃতিচিত্র রচনা করেছেন। কবি বলছেন:

রজনী যখন আঁধারিয়া আসে, গগনে ঘনায় কালো,
দূরে কোথা শুধু প্রহরী পেচক জাগে,
মেঘে মেঘে যবে ধূসর আকাশ, আলো আব্‌ছায়া হয়,
অবিরল ধারে আকাশের ধারা ঝরে;
একাকী আমার বাতায়নে বসি, মন-বাতায়নে সখী,
স্তব্ধ পুলকে দেখি চলিয়াছ সবে—

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিও একটি স্মৃতিচিত্র। ইঁটকাঠে গড়া নীরস খাঁচা থেকে শ্রীমতী মহলানবীশ একদিন কবিকে "নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ নিরালায়" ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারই কথা স্মরণ করে শান্তিনিকেতনে বসে কবি কবিতাটি রচনা করেছেন। কবি বলছেন:

বসি যবে বাতায়নে
কলমি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে।
বিকেল বেলার আলো
জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।
ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে
আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে।

সজনীকান্ত তাঁর একটি নায়িকার প্রসঙ্গ শেষ করে বলছেন:

তারপর দূর, বহু দূরে সখী, সুগভীর বনভূমি,
পাহাড়ে ও বনে চোখে অবসাদ জাগে;
সেথা তব বধূবেশ;

গুণ্ঠন শিরে, চাহিছ ভুলিতে কবে কি ঘটেছে ভুল।
আমার মনের বনে—
একদা যে শাখী শাখা মেলেছিল, যদিও শুকায়ে গেছে
দখিন বাতাসে আজিও তাহার মর্মর-ধ্বনি শুনি ;
যদি কভু দেখা হয়—
তোমার প্রণাম সহজে লইব, সখী।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন,
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ।
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব প্রণতি-ভরা
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।

বলা প্রয়োজন যে, ভাবানুষঙ্গের দিক দিয়ে আলোচ্য দুটি কবিতার গরমিল অনেকখানি। সজনীকান্তের কবিতায় আছে পরকীয়া ও স্বকীয়া প্রেমের স্মৃতিচারণা ; আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে বাংলাদেশের গৃহিণীর নীরব প্রণতিভরা সেবার অর্ঘ্য। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই প্রীতিরসে স্মৃতির পাত্রটি পূর্ণ। কিন্তু স্বাদে ও সুরভিতে দুটি কবিতার জাত আলাদা। তবু বাচনভঙ্গির দিক দিয়ে কী আশ্চর্য মিল রয়েছে দুটি কবিতাতে! সজনীকান্তের 'মনের বন' হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বনপ্রকৃতির মন'। সজনীকান্ত বলেছেন :

মেঘে মেঘে যবে ধূসর আকাশ, আলো আবছায়া হয়,

*   *   *

একাকী আমার বাতায়নে বসি, মন-বাতায়নে সখী,
স্তব্ধ পুলকে দেখি চলিয়াছ সবে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

বসি যবে বাতায়নে
কলমি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে।

*   *   *

ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।

সজনীকান্ত স্মৃতির সরণি বেয়ে তাঁর মানস-পরিক্রমা শেষ করে কবিতার উপসংহারে বলছেন :

আঁধি আসে আর আঁধি সরে সরে যায়—
ধূ ধূ মরুভূমি পড়ে থাকে সীমাহীন।
তোমরা এসেছ, তোমরা গিয়েছ সরে,
একে একে সখী, সব ছায়া রোদ হবে,
সব আঁধি পিছে পথের মতন পিছনে রহিবে পড়ে।

* * *

আমার জীবনে শুধু
তোমা সবাকার খণ্ড খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।
এর বেশি কিছু নহে,
আমি তোমাদের নহি—
চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিতার উপসংহারে প্রায় একই সুরে বলছেন :

কালের লীলায় দিয়ে যাব সায়, খেদ রাখিব না চিতে,
এ ছবিখানি তো মন হতে ধনী পারিবে না কেড়ে নিতে।
তোমার বাগানে দেখেছি তোমারে কাননলক্ষ্মীসম,—
তাহারি স্মরণ মম
শীতের রৌদ্রে, মুখর বর্ষারাতে
কুলায়বিহীন পাখির মতন মিলিবে মেঘের সাথে।

সজনীকান্তের কবিতায় আছে যৌবনবেদনা, আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রৌঢ়-মানসের প্রশান্তি। জীবনবোধেও পার্থক্য আছে। কিন্তু বাচনভঙ্গিতে দুটি কবিতাই এক। আর, ভাবতে বিস্ময় লাগে, এখানে পূর্বসূরিই গ্রহণ করেছেন উত্তরসূরিকে। সজনীকান্তের কাব্যসাধনার এর চেয়ে মহত্তর গৌরব আর কী হতে পারে যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দ ও বাচনভঙ্গিকে নিজের কাব্যরচনায় গ্রহণ করেছেন, তাঁর সারস্বত সাধনাকে স্বীকরণের দ্বারা পরম স্বীকৃতি দান করেছেন।

চার

রবীন্দ্রনাথ কেন প্রকাশ্যে 'রাজহংসে'র প্রশংসা করতে চান নি তার হেতু-নির্ণয় দুঃসাধ্য নয়। রবীন্দ্র-বিদূষণে 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত শালীনতার সমস্ত সীমানাই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রভক্ত-মহলে তাই তিনি ছিলেন বিগ্রহবিধ্বংসী কালাপাহাড়। তাঁর প্রশংসা অন্তরঙ্গজনকে বিক্ষুব্ধ করবে বলে রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকাই দুর্বিপাক থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রকৃষ্ট পথ বলে মনে করেছেন।

কিন্তু নিন্দা রবীন্দ্রনাথের আজীবন সঙ্গী ছিল। সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হবার পর 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনার উত্তরে তিনি যে প্রতিভাষণ পাঠ করেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি। এও আমার খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি।" [দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, অবতরণিকা, পৃ° ১।/০।]

এই উদ্ধৃতির উপান্ত বাক্যটির বাগ্‌ভঙ্গি লক্ষণীয়। "এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা"! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এও তাঁর খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এই বিশ্বাসেই তিনি তাঁর নিন্দুকদেরও শেষ পর্যন্ত ক্ষমার চক্ষেই দেখেছেন। আর এ ক্ষেত্রে সজনীকান্তই প্রথম ব্যক্তি নন। তা ছাড়া, পূর্বেই বলা হয়েছে, সজনীকান্তের মানসলোকে দুই সজনীকান্ত পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতই বাস করেন। একজন রবীন্দ্রনিষ্ঠ কবি, আর-একজন দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনায় 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ-সাহিত্যের দুর্মুখ লেখক ও দুর্ধর্ষ সম্পাদক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম ক্ষমা; তাই বার বার তিনি এই পথভ্রান্ত ভক্তকে ক্ষমা করে তাঁর উদার দাক্ষিণ্যের স্নেহচ্ছায়ায় আহ্বান করেছেন। তা ছাড়া সারস্বত ক্ষেত্রে শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে গুণীর গুণকীর্তন করা রবীন্দ্রনাথের সহজাত ধর্ম। তাই রাজহংসের প্রশংসায় পরাঙ্মুখ হলেও স্বগতভাষী অন্তরঙ্গ আলাপনে তাঁর মনোভাবটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

'রাজহংস' কবির হাতে পৌঁছবার পর এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবটি জানবার প্রথম সুযোগ হয়েছিল শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র করের। কর-

মহাশয় নিজে কবি। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের প্রতিদিনকার রচনাসংগ্রহ এবং গ্রন্থাদি মুদ্রণ ও প্রকাশনের অনেকখানি দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর ওপর। যেদিন ডাকযোগে 'রাজহংস' শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছয় সেদিনকার প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ঃ

"স্মৃতিসূত্রে টান প'ড়ে এই প্রসঙ্গে মনে আসছে আর একদিনের কথা। ১৩৪৩ সনের বৈশাখ। চলছে কবির 'পত্রপুট' কাব্যের পালা। তার তের নম্বর কবিতাটি সেই দিনই কি তার আগের দু-একদিনের মধ্যেই লেখা হয়েছে। কপি করে এনে দেওয়া গেল কবির হাতে। কবি তখন 'কোনার্ক'-বাসী। 'কোনার্ক' গৃহের বারান্দার সামনে যে শিমুল গাছটি আছে, তার তলায় বসেছেন কবি সকালবেলার কাজে। লেখার টেবিল পাতা রয়েছে সামনে। সদ্য রচিত উপরোক্ত কবিতার কথাই চলছিল। খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাব্যোপহার ['রাজহংস'] এসে পৌঁছেছে হাতে, সেই ডাকেই। প্যাকেট থেকে বই খুলে উল্টেপাল্টে দেখলেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি পারি নি, কিন্তু এ পেরেছে, যা বলতে চেয়েছি—এর মধ্যে দেখছি কত সবল সুন্দর তার প্রকাশ।' বিশ্বকে সর্ব অনুভবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে লেখা কবির 'পত্রপুটে'র সেই তের নম্বরের কবিতাটি। সে বেদনা তাঁকে এমন পেয়ে বসেছে, দিনরাত ওই ভাবছেন আর লিখছেন, কাটছেন, যোগ করছেন; কবিতা লিখেও মনের ভার কমে নি, একটার পর আর একটা লিখছেন। বারো নম্বরের কবিতাটিতে তার আগে মর্মান্তিক বেদনা জানিয়েছেন। বিশ্ব-জীবনের বিশেষ বিশেষ বাস্তব অভিজ্ঞতায় অক্ষমতা নিয়ে। তাতে শেষটায় লিখেছেন—

'মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চ'লে।
... ...
ব্যূহ ভেদ করে
স্থান নিই নি যুধ্যমান দেবলোকের
সংগ্রাম-সহকারিতায়।

কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরু গুরু,
কেবল সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন
মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।
যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়-জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশ্যে ;
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।'

এতেও হয় নি, আরো সুনির্দিষ্ট যথাযথ সতেজ রূপ দেওয়ার কথাই মনে ঘুরছে, বয়ঃকনিষ্ঠ কবির মধ্যে স্বীয় অনুভবের সার্থকতার সাড়া পেয়ে নিজের শিল্পক্ষুণ্ণ চেতনার বেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছিল সেই অপরের প্রশস্তিবাদ অকুণ্ঠ উৎসাহে।" ["রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-জীবন", যুগান্তর, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫।]

রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের 'রাজহংসে' "স্বীয় অনুভবের সার্থকতার সাড়া" পেয়েছিলেন—কবির নিত্যসঙ্গী কর-মহাশয়ের এই উক্তিটি সজনীকান্তের কবি-কীর্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণীয়। উদ্ধৃত কবিতার সঙ্গে 'রাজহংসে'র "কালকূট" কবিতাটি মিলিয়ে পড়লেই রসিক বোদ্ধা কর-মহাশয়ের বক্তব্যটি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, গদ্যকবিতার সৃষ্টিযুগ পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন পুনরায় পদ্যচ্ছন্দে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করলেন তখন একাধিক কবিতায় তিনি ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মুক্তবন্ধ রূপটিকে তাঁর ভাবের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 'সেঁজুতি' গ্রন্থের "যাবার মুখে" কবিতায় এই ছন্দ ব্যবহৃত। কবি বলছেন :

নিঃশেষ যবে হয় যত কিছু ফাঁকি
তবুও যা রয় বাকি—
জগতের সেই
সকল-কিছুর অবশেষেতেই
কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়,
মন-ভোলাবার অকারণ গানে কাজ-ভোলাবার খেলায়।

সেখানে যাহারা এসেছিল মোর পাশে
তারা কেহ নয় তারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে।
শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে,
অমরাবতীর নৃত্য-নূপুর বাজিয়ে গিয়েছে মনে।
দখিনহাওয়ার পথ দিয়ে তারা উঁকি মেরে গেছে দ্বারে,
কোনো কথা দিয়ে তাদের কথা যে বুঝাতে পারিনি কারে।

*　　*　　*

অজানা পথের নামহারা ওরা লজ্জা দিয়েছে মোরে
হাটে বাটে যবে ফিরেছি কেবল নামের বেসাতি ক'রে।

কবিতাটি ১৩৪৩ সালের ২২ মাঘ বিরচিত। এই কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের "পান্থপাদপ" বলা যেতে পারে। চিরপথিক সজনীকান্ত তাঁর জীবনের "অজানা যাত্রাপথে"র সঙ্গিনীদের কথাই বলেছেন তাঁর "পান্থপাদপে"। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পথিক-জীবনে যারা "মন-ভোলাবার অকারণ গানে কাজ-ভোলাবার খেলায়" কবিমনকে ভুলিয়েছিল সেই-সব "অজানা পথের নামহারা"দের কথাই বলেছেন "যাবার মুখে" কবিতায়।

'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থের "নিঃশেষ" কবিতায়ও কবি এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন —"শরৎবেলার বিত্তবিহীন মেঘ / হারায়েছে তার ধারাবর্ষণ-বেগ ;" [রচনা-তারিখ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল]; 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা "নবজাতক" [নবীন আগন্তুক, নবযুগ তব যাত্রার পথে চেয়ে আছে উৎসুক], এবং "প্রায়শ্চিত্ত" [উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো], "পক্ষীমানব" [যন্ত্রদানব, মানবে করিল পাখি] কবিতায় এই ছন্দ ব্যবহৃত। 'সানাই' গ্রন্থের "জানালায়" [বেলা হয়ে গেল তোমার জানালা-'পরে], "সম্পূর্ণ" [প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার বোনের বিয়ের বাসরে], "উদ্বৃত্ত" [তব দক্ষিণ হাতের পরশ কর নি সমর্পণ] এবং "বিমুখতা" [মন যে তাহার হঠাৎ প্লাবনী নদীর প্রায়] কবিতায় কবি এই ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান মুক্তবন্ধ ছন্দটিকে তাঁর বিচিত্র ভাবপ্রকাশের বাহন করেছিলেন। এসব উদাহরণ থেকে এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, 'রাজহংসে'র এই বিশেষ ছন্দরূপটি রবীন্দ্রনাথের গোধূলিলগ্নের কাব্যে একাধিকবার দেখা দিয়েছে। বাংলা ছন্দ-মুক্তির সাধনায় সজনীকান্তের সিদ্ধি কবিগুরুর হাতে পরম মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

আরেক সজনীকান্ত

এক

বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশনারী কলেজে ছাত্রাবস্থায় সজনীকান্ত প্রথম নিজের সারস্বত শক্তিকে আবিষ্কার করলেন। তাঁর এই উপলব্ধি হল যে, তিনি ব্যঙ্গে বা স্যাটায়ারে প্রতিপক্ষকে মর্মান্তিক আঘাত হানতে পারেন। সেদিন তিনি ছিলেন প্রগতিশীল শিবিরের নির্মম যোদ্ধা। ছাত্রাবাসে টিকিওয়ালাদের ছুঁৎমার্গ ও গোঁড়ামি ছিল তাঁর মর্মবিদারী আক্রমণের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের নবাবিষ্কৃত 'বলাকা'র ছন্দ ছিল তাঁর বাহন। সেদিন রক্ষণশীলতার দুর্গ তাঁর স্যাটায়ারের অব্যর্থলক্ষ্য কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হয়েছিল। কলিকাতার কুরুক্ষেত্রে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হিসাবে তাঁর সেই অস্ত্রই শাণিত হয়ে প্রতিপক্ষের প্রতিরোধকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে লাগল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই সারস্বত কুরুক্ষেত্রে সজনীকান্ত রক্ষণশীল শিবিরের প্রধান সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তখন তিনি প্রতিবিপ্লবের অধিনেতা। ১৩৩৪ থেকে ১৩৩৯—এই যুগার্ধকাল, অর্থাৎ সাতাশ থেকে বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সজনীকান্তের মুখ্য পরিচয় হল ব্যঙ্গরসিক কবি ও 'শনিবারের চিঠি'র দুর্ধর্ষ সম্পাদক। সেদিন তিনি ছিলেন, দাদাঠাকুরের ভাষায়, 'নিপাতনে সিদ্ধ'। অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রের বড় বড় মহারথীদের নিপাতিত করাই ছিল তাঁর মহৎ ব্যসন। ভাষা ও ছন্দে তিনি ছিলেন অসামান্য শক্তির অধিকারী। সেদিন তিনি খেলাচ্ছলেই সেই শক্তিকে ব্যবহার করেছেন। প্রতিপক্ষের ওপর আঘাত হেনেছেন নির্মমতম হিংস্রতায়। কিন্তু সেও খেলাচ্ছলে।

তারপর এল অভিশাপ-মুক্তির লগ্ন। বত্রিশ বৎসর বয়সে সজনীকান্ত আবিষ্কার করলেন নিজের কবি-প্রতিভার মহৎ সম্ভাবনাকে। লিখলেন 'কে জাগে?' কবিতা। 'রাজহংসে'র কবির জন্ম হল। জীবনের মহাকুরুক্ষেত্রের পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেখা দিল নবসৃষ্টির নবাঙ্কুর। চিত্তে বিশ-শতকীয় প্রথম-সমরোত্তর বিপর্যস্ত-জীবনের করাল অভিজ্ঞতা, কণ্ঠে বেপরোয়া যৌবনের দুঃসাহসী প্রমত্ততার তিক্ত হলাহল, প্রেরণামূলে মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নাথের বিশাল সারস্বত ঐতিহ্য—সজনীকান্ত নবীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম

কবি-প্রতিনিধিরূপে দেখা দিলেন। ভাষা দিলেন নবযুগের চেতনাকে। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক প্রবীণ কবি বললেন, "আমি পারি নি, কিন্তু এ পেরেছে, যা বলতে চেয়েছি—এর মধ্যে দেখছি কত সবল সুন্দর তার প্রকাশ।"

ধীরে ধীরে সজনীকান্তের সারস্বত সত্তার স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠল। বাঙালী ও বাংলার মহৎ ঐতিহ্যের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা তার একটি মুখ্য উপাদান। আধুনিক যুগের মানুষ তিনি,—আধুনিকতার আশীর্বাদ ও অভিশাপ সমান ভাবে তাঁর ভাবে ও ভাবনায়, স্বপ্নে ও চর্যায় ক্রিয়াশীল। কিন্তু ভাবকল্পনায় সজনীকান্ত ঐতিহ্যনিষ্ঠ কবি। তাঁর এই ঐতিহ্যনিষ্ঠাই তাঁকে সারস্বত তীর্থের অনুসন্ধিৎসু গবেষকে পরিণত করেছে। সজনীকান্তের সারস্বত সাধনার নূতন পরিচয় পাওয়া গেল সাহিত্যের গবেষণায় তাঁর সশ্রদ্ধ আগ্রহ ও শ্রমসাধ্য অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে। 'বঙ্গশ্রী'র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁকে আহ্বান করেছিলেন অতীতের পুনরুজ্জীবনের যজ্ঞশালায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী কায়স্থ আদর্শনিষ্ঠ ভট্টাচার্যের অনুশাসন স্বীকার করে নিতে পারেন নি। আচারে ও আচরণে সমকালীন শিল্প-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। কাজেই 'বঙ্গশ্রী'র ধর্মানুশাসিত পবিত্র-পরিবেশ ছাড়তে তিনি বাধ্য হলেন। কিন্তু 'বঙ্গশ্রী'র অনুত্তীর্ণ দুটি বৎসর তাঁর জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত করে দিল। নিজের সংগঠনশক্তির গৌরবান্বিত মহিমার সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। পেলেন সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্যকে রক্ষণ ও লালনের প্রেরণা। তারপরে সজনীকান্ত যখন আবার 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করলেন তখন খেলাচ্ছলে নির্বিচার আক্রমণের মনোভাব আর তাঁর রইল না। 'শনিবারের চিঠি'কে রক্ষা করতে হলে 'সংবাদ-সাহিত্য'কে রক্ষা করতে হয়। তাই চিঠির এই 'যুদ্ধং দেহি' বিভাগটি থাকল বটে, কিন্তু আক্রমণের ক্ষেত্র সীমায়িত হল। সাহিত্যের উচ্চ আদর্শকে সম্মুখে স্থাপন করে তারই কঠিন অনুশাসনে নূতন রচনাকে যাচাই করে ব্যর্থ সৃষ্টিকে ধিক্কার দেওয়াই হল এখন থেকে 'সংবাদ-সাহিত্যে'র লক্ষ্য। সম্পাদক সর্বক্ষেত্রে এই আদর্শ রক্ষা করতে পেরেছেন—এমন কথা বলা যাবে না। খেলাচ্ছলে শুধু রঙ্গরসিকতা শুধু ঠাট্টা-মশকরার মনোবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। 'বঙ্গশ্রী'র যুগেও যাঁরা পূর্বশত্রুতার কথা স্মরণ করে দূরে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের প্রতি চিত্তের প্রাতিকূল্য নিঃশেষে অপসারিত করাও সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু সজনীকান্তের

মানসহংস তখন আকাশের আলো ডানায় মেখে মানসসরোবরের উদ্দেশে উধাও হয়েছে। মর্ত্যের মৃত্তিকাবিহারী মানুষের পারস্পরিক ঈর্ষা ও অসূয়া, বিদ্বেষ ও হানাহানির প্রতি তার আর আসক্তি নেই। কাজেই 'শনিবারের চিঠি'র নবীন সত্রে ধ্বংসের পাশেই নবসৃষ্টি, বিসর্জনের পাশেই প্রতিষ্ঠার আবাহনমন্ত্র উচ্চারিত হল। 'বঙ্গশ্রী'-সম্পাদকের সংগঠনশক্তি নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত সব্যসাচী-মূর্তিতে দেখা দিলেন। এক হস্ত গঠনকার্যে, এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালিয়ে রাখার কাজও তাঁর, অন্যদিকে ধূম ও ভস্মরাশি দূর করবার ভারও তাঁর।

'আনন্দমঠে'র-উপসংহারে সত্যানন্দকে মহাপুরুষ বলেছিলেন, "চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়-শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্তি দেখাইব।" সজনীকান্তের কবিমানসে সত্যানন্দ ও মহাপুরুষ পাশাপাশি বাস করেন। কাজেই হিমালয়-শিখরস্থিত মাতৃমন্দিরে সারস্বত-সন্তানের আরাধ্যা মাতৃমূর্তি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

'আনন্দমঠে' মাতৃমূর্তির সন্ধানে মহাপুরুষ যখন সত্যানন্দের হাত ধরলেন তখনকার মিলনদৃশ্যটির ধ্যান করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "কি অপূর্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন।"

সজনীকান্তের সারস্বত সাধনায় মহাপুরুষ এসে সত্যানন্দের হাত ধরলেন। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আরেক সজনীকান্তের আবির্ভাব হল। একাধারে নবযুগের কবি ও বিগত যুগের গবেষক। বহুশ্রুতি সজনীকান্তের সারস্বত চেতনাকে পরিশীলিত করেছে। সহজাত সাহিত্যরসবোধ আসল ও নকলের মূল্যনিরূপণে সহায়ক হয়েছে। ঐতিহ্যনিষ্ঠা পূর্বসূরিবৃন্দের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে সুগভীর শ্রদ্ধা। সাহিত্যের গবেষণাকর্মে কুশলী কর্মীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী নিয়ে সজনীকান্ত দেখা দিলেন সারস্বত সত্রের নূতন ভূমিকায়। প্রথম যুগে তাঁর মন্ত্র ছিল অশিববিনাশ। দ্বিতীয় যুগে তাঁর স্বপ্ন ছিল নবসৃষ্টি। তৃতীয় যুগে তাঁর লক্ষ্য হল ইতিহাসের অবলুপ্ত কক্ষে সত্যের সন্ধান। কালজয়ী সাহিত্য-সাধকগণের কীর্তিরক্ষা।

দুই

বৈষ্ণব পদাবলীর একখানি প্রাচীন পুথিকে অবলম্বন করেই সজনীকান্তের সাহিত্যিক গবেষণার সূত্রপাত। কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময়ই বর্ধমান ও বীরভূম জেলার প্রাচীন পুথি সংগ্রহের দিকে তাঁর কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছিল। এ কাজে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে যে-সব পুথি সংগৃহীত হল তার মধ্যে একখানা ছিল মহাজন পদাবলীর সংকলন। পুথিটির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রত্যেক পৃষ্ঠার শিরোনামায় নকল করার তারিখ লিপিবদ্ধ ছিল। এইসব তারিখ থেকে সজনীকান্ত সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে এই পুথিখানি পদাবলী সংকলন পুথিসমূহের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নকল করা। অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর ব্রজবুলি বিষয়ক গ্রন্থে এই পুথির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছেন। তিনি এই পুথিকে বলেছেন 'দাস ম্যানাস্ক্রিপ্ট'। বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রেরণায় সজনীকান্ত এই পুথি নিয়ে কাজ শুরু করেন। এই গবেষণাকর্মে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, একটার পর একটা ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে এই মহাজন-পদাবলী-সম্পাদনার কাজটি আর সমাপ্ত হয় নি।

'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনা কালে সজনীকান্ত নিয়মিত গবেষণাকর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। এ বিষয়ে তাঁর গুরু, পথপ্রদর্শক ও পরবর্তী জীবনে সহযোগী ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজি ১৯৩৩, বাংলা ১৩৪০ সালের কথা। বৎসরটি রামমোহনের মৃত্যুর শততম বৎসর। ব্রজেন্দ্রনাথ রামমোহন নিয়ে গবেষণা করে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। এ নিয়ে প্রচণ্ড তর্কবিতর্কের শুরু হয়েছিল। একটা সমস্যা ছিল রামরাম বসুকে নিয়ে। তৎকালপ্রচলিত ধারণা ছিল, রামমোহন রামরাম বসুর গুরু। 'লিপিমালা'র প্রারম্ভে রামরাম যে এক-ঈশ্বরের প্রশস্তি রচনা করেছেন তা রামমোহনেরই একেশ্বরবাদের প্রভাবসঞ্জাত বলে অনুমিত। ব্রজেন্দ্রনাথ এই প্রচলিত মতের বিরোধী ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নথিপত্র থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে রামরাম রামমোহন অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু রামরাম বসু সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত কাগজপত্র থেকে নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে নিযুক্ত করলেন। সজনীকান্তের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি যেমন

বিশাল ছিল তেমনি বহুবিচিত্র বিষয় সম্পর্কে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহের প্রতি ছিল তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণ। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহে সুদক্ষ সজনীকান্ত উৎসাহের সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজের গ্রন্থাগারে গবেষণাকর্ম শুরু করলেন। সজনীকান্তের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল 'প্রণিপাত',—অর্থাৎ নিজেকে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করা। 'কার্যং বা সাধয়েয়ং শরীরং বা পাতয়েয়ং' : মহাকবি মধুসূদনের এই মূলমন্ত্রটি সজনীকান্তেরও জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সজনীকান্ত গবেষণাকর্মে ডুবে গেলেন। একনাগাড় প্রায় ছ-মাস কাল সপ্তাহে দু-তিন দিন করে শ্রীরামপুর কলেজ-গ্রন্থাগারে সকাল দশটা থেকে রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত চলল তাঁর তথ্যানুসন্ধান। পুরনো ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা বই, কালি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, বইয়ের পাতা জীর্ণ, পরকলা কাচের সাহায্যে বহুকষ্টে তার পাঠোদ্ধার, উইলিয়ম কেরির লেখা পলিগ্লট ডিক্‌শ্‌নারির পাণ্ডুলিপি, টমাস কেরি ওয়ার্ড মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারি সাহেবদের চিঠিপত্র ও জার্নাল প্রভৃতি পড়তে পড়তে সজনীকান্ত বাংলা গদ্যসাহিত্যের 'শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ' সম্পর্কে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান পেলেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফল 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল। এবং পরে তা 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড'রূপে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হল। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় বলেছেন, এই গবেষণাকার্যে "রসিকের ধর্মের সহিত পণ্ডিতের ধর্মের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে।" গবেষক-সজনীকান্ত সম্পর্কে এই যুগের গবেষণায় পথিকৃৎ ডক্টর দের অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত ভূমিকায় তিনি আরও বলেছেন :

"সজনীকান্ত অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার সহিত বাংলা গদ্যের এই ভিত্তিমূলের যতদূর সম্ভব নিখুঁত ও নিরপেক্ষ বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার রস-পিপাসা কোথাও তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। পথিকৃৎ না হইলেও সজনীকান্তের রচনা তাঁহার পূর্বগামীদের রচনার পূরণ ও সংশোধন হিসাবে বহু অজ্ঞাত ও মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। শ্রীরামপুর কলেজের ও অন্যান্য স্থলের বিক্ষিপ্ত দপ্তরে অনেক পুরাতন কাগজপত্র পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য তিনি পাইয়াছেন, যাহা তাঁহার পূর্বগামীদের নাগাল ও নজরের বাহিরে পড়িয়া ছিল। নূতন তথ্যের উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে, রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা ও উইলিয়ম কেরি সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন কথা বলিতে পারিয়াছেন, মিলার ও আপজনের পুস্তক তিনি প্রথম আবিষ্কার করিয়া আমাদের গোচরে

আসিয়াছেন। এই গ্রন্থটিকে বিশেষজ্ঞের সংকলন মাত্র অথবা গবেষকের প্রমাণপঞ্জী বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। সজনীকান্তের লেখনী-নৈপুণ্য শুধু তথ্যমাত্রসন্ধানী নয়, নীরস বস্তুকে অপরূপ সরসতায় অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতাও রাখে।"

তিন

সাহিত্যের গবেষণায় সজনীকান্ত আপন শক্তিমত্তার অভ্রান্ত পরিচয় দিলেন। কবি ও সম্পাদক সজনীকান্ত গবেষক হিসাবেও যে কারও পশ্চাতে নন তা প্রমাণিত হল। ইংরেজি ১৯৩৭, অর্থাৎ বাংলা ১৩৪৪ সালের ১৩ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী সভার সভাপতি হিসাবে সজনীকান্ত একটি প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবটির ফলাফল সুদূরপ্রসারী। তাই এখানে তা বিশেষ উল্লেখের দাবি করে। সভাপতি-পদে বৃত হয়ে সজনীকান্ত বীরসিংহের সারস্বত তীর্থের উদ্দেশে কলিকাতা থেকে যাত্রা করলেন। শ্রাবণ মাস। নিদারুণ বর্ষা। মেদিনীপুর থেকে প্রায় ষাট মাইল মোটরে। শেষ দু-তিন মাইল তখন ছিল কাঁচা রাস্তা। কাদায় জলে প্রায় দুর্গম। মাঠ ভেঙে হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে সভাপতি যখন বহু বিলম্বে সভামণ্ডপে উপস্থিত হলেন তখন সভা শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচিত সভাপতির বিলম্ব দেখে সভার উদ্যোক্তারা তৎকালীন জেলাশাসক বিনয়রঞ্জন সেনকে সভাপতির আসনে বসিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। সভার আয়োজন হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার উদ্যোগে। সজনীকান্ত সভায় উপস্থিত হবার পর কর্মকর্তারা নূতন আকারে সভার অনুষ্ঠান শুরু করলেন। সজনীকান্ত তাঁর লিখিত ভাষণ সভায় পাঠ করলেন। জনবিরল স্থানে স্মৃতিমন্দিরের পিছনে অযথা অর্থব্যয় না করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্তিরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর গ্রন্থাবলীর পুনঃপ্রচারের জন্যে ব্যাকুল আবেদন জানালেন তিনি। স্বনামে বেনামে লেখা তাঁর প্রচলিত ও অপ্রচলিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও বিস্মৃত রচনাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাও তিনি সভায় দাখিল করলেন। সভান্তে জেলাশাসক বিনয়রঞ্জন সজনীকান্তের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

অদ্ভুতকর্মা বিনয়রঞ্জনের বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতির সঙ্গে মিলেছিল তাঁর অসামান্য

সংগঠন-নৈপুণ্য। মেদিনীপুরের অন্যতম কংগ্রেসনেতা চিত্তরঞ্জন রায়ের গঠনমূলক দেশ-হিতৈষণা বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-তর্পণে তাঁর সহায়ক হল। উভয়ের চেষ্টায় ঝাড়গ্রামের কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর প্রমুখ মেদিনীপুরের সুসন্তানগণের বদান্যতায় শুরু হল বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী পুনঃপ্রকাশের কাজ। বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে ঝাড়গ্রামের অর্থানুকূল্যে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্তের সম্পাদনায় রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে পরিচ্ছন্ন বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হল। 'সাহিত্য', 'সমাজ' এবং 'শিক্ষা ও বিবিধ'—এই তিন খণ্ডে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ রচনাবলী ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩৪৬ সালের চৈত্রের মধ্যে মুদ্রিত হল। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের সারস্বত কীর্তিরক্ষার এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের দ্বারা সজনীকান্ত গ্রন্থ-সম্পাদনার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন তার পরবর্তী ইতিহাস বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত।

১৯৩৮ সনে এল বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী। বিনয়রঞ্জন প্রস্তাব করলেন বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর মত যদি রঞ্জন প্রকাশালয় বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রকাশেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে তিনি ঝাড়গ্রামরাজের আনুকূল্যে দশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হলে সজনীকান্তের ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের হেতু হতে পারত। কিন্তু সজনীকান্ত ব্যক্তিগত লাভের লোভ সংবরণ করে বিনয়রঞ্জনের প্রস্তাবিত অর্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভাণ্ডারে অর্পণ করতে বললেন। পরিষদের আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। বার্ষিক মাত্র বারো শত টাকার সরকারী সাহায্য এবং সভ্যগণের মাসিক চাঁদার উপর নির্ভর করে পরিষদের দৈনন্দিন কৃত্যাদিও চালিয়ে যাওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠেছিল। সজনীকান্তের প্রস্তাব অনুসারে বিনয়রঞ্জনের বদান্যতায় ঝাড়গ্রাম-রাজ প্রদত্ত দশ হাজার টাকা দিয়ে পরিষদের 'ঝাড়গ্রাম তহবিল' তৈরি হল। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের যুগ্ম-সম্পাদনায় পরিষৎ কর্তৃক নয় খণ্ডে বঙ্কিম-রচনাবলী প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৩৪৫-এর আষাঢ়, শেষ খণ্ডের মুদ্রণ-শেষ ১৩৪৮-এর পৌষ। আচার্য যদুনাথ সরকার বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর ঐতিহাসিক অংশের ভূমিকা লিখে দিলেন। গ্রন্থ-সম্পাদনার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী ও বঙ্কিম-রচনাবলীর প্রকাশ বাংলা গ্রন্থপ্রকাশের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের মিলিত নেতৃত্বে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরও নবযুগ সূচিত হল। এতদিন সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের হস্তলিখিত পুথি অবলম্বনে গ্রন্থাদি সম্পাদনা ও মুদ্রণের দিকেই বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের নেতৃত্বে পরিষৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিক-এর পুনর্মুদ্রণে অগ্রণী হলেন। পরিষদের তৎকালীন সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পরিষৎ-প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক-সংস্করণের "বিজ্ঞপ্তি"তে সত্যই বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীর্তি পুনরুদ্ধারের কার্যে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত যশস্বী হয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন পরিষদের শুধু সম্পাদকই ছিলেন না, ছিলেন এই সারস্বত মন্দিরের প্রাণপুরুষ। সজনীকান্তও ১৩৪০ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, পরে গ্রন্থাধ্যক্ষ ও পত্রিকাধ্যক্ষ, ১৩৫২ থেকে ১৩৫৫ সাল পর্যন্ত সম্পাদক, ৫৬-৫৭ সালে অন্যতম সহকারী সভাপতি এবং সর্বশেষে ১৩৫৮ সাল থেকে পর পর পাঁচ বৎসর পরিষদের সভাপতি পদে বৃত হয়ে সজনীকান্ত সাহিত্য-পরিষদের সেবা করে গেছেন। ঝাড়গ্রাম তহবিলের অর্থানুকূল্যে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের যুগ্ম সম্পাদনায় ভারতচন্দ্র, রামমোহন, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, পাঁচকড়ি, রামেন্দ্রসুন্দর ও বলেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থাবলী পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর সজনীকান্তের একক সম্পাদনায় অক্ষয়কুমার বড়ালের গ্রন্থাবলী, রামেন্দ্রসুন্দরের ষষ্ঠ খণ্ড এবং নবীনচন্দ্রের রচনাবলীও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি যুগান্তকারী গ্রন্থও স্বতন্ত্র ভাবে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছে। রঞ্জন পাবলিশিং থেকে তাঁর পরিচালনায় "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র প্রকাশও এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। সজনীকান্তই রঞ্জন পাবলিশিং থেকে 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র সম্পাদনা করে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের এই অদ্ভুতকর্মা শিল্পীর যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পণ্ডিত-সমাজে উদ্ঘাটিত করেছেন। সজনীকান্তের সারস্বত সাধনার এই দিকটি তাঁর জীবন-ইতিহাসে নগণ্য নয়। এই গবেষণা-কর্মের দ্বারাই তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টি নূতন করে আকর্ষণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ্য বাল্যরচনাবলীর আবিষ্কারেও তাঁর গবেষণা ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দক্ষিণাবর্ত বহ্নি

এক

'অল্‌স্‌ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্‌ ওয়েল'। সব ভাল যার শেষ ভাল। শেষ পর্বে এসে রবীন্দ্র-সজনীকান্ত-সম্পর্ক সমস্ত মালিন্য ও তিক্ততা থেকে মুক্ত হয়ে পুনর্মিলনের মাধুর্যে ও আনন্দে ভরে উঠেছে। কবিগুরুর কাছে সারস্বত মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তাঁর একলব্য শিষ্য তাঁর কবি-জীবন শুরু করেছিলেন। তারপর দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনায় মতিচ্ছন্ন হয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলল তাঁর গুরুদ্রোহ। সজনীকান্তের সৌভাগ্য যে কবিগুরুর তিরোধানের তিন বৎসর পূর্বে তাঁর শুভবুদ্ধি জাগ্রত হল। তখন তাঁর বয়স ৩৮ বৎসর। জীবনের বাকি চব্বিশ বৎসর তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সঙ্গে তাঁর গুরুকৃত্য পালন করে গেছেন।

মোটামুটিভাবে বলা চলে, ১৩৩৫ সালের আশ্বিনে শনিবারের চিঠির নবপর্যায়ের শুরু থেকে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত দশ বৎসর সজনীকান্তের জীবনের রবীন্দ্র-বিদূষণপর্ব। এই পর্বের শিরোনামা হতে পারে গুরুদ্রোহ। ১৩৪৫ সাল থেকে ১৩৬৮ সাল—সজনীকান্তের জীবনের এই শেষ চব্বিশ বৎসরকে বলা যাবে রবীন্দ্রানুশীলন পর্ব। নিষ্ঠা ও সেবাময়ী গুরুভক্তিই এ-যুগের সামান্য-লক্ষণ। এই শেষ চব্বিশ বৎসরও দু-ভাগে বিভক্ত; প্রথম পর্বাধ্যায় ১৩৪৫ থেকে ১৩৪৮ সালে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান পর্যন্ত—তিন বৎসর। শেষ পর্বাধ্যায় ১৩৪৮ সাল থেকে ১৩৬৮ সাল পর্যন্ত একুশ বৎসর।

১৩৪৫ সাল [ইংরেজি ১৯৩৮] সজনীকান্তের জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। সুদীর্ঘ দশ বৎসর ধরে অ-ক্ষমার্হ রবীন্দ্র বিদূষণের পরও গুরুদেবের অপরিসীম ক্ষমা ও স্নেহের গুণেই সজনীকান্ত পুনরায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশ্রয় ফিরে পেলেন। এত কাণ্ড ও কেলেঙ্কারির পরও যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্রোহী শিষ্যকে কাছে ডাকতে পেরেছিলেন তার মূল কারণ নিশ্চয়ই তাঁর চারিত্রিক উদারতা। কিন্তু এ বিষয়ে সজনীকান্তের কৃতিত্বও কম নয়। শত্রুতায় যেমন তিনি দুর্ধর্ষ, অনুরক্তিতেও তেমনি তিনি সর্বচিত্তজয়ী। সাহিত্যসাধনায় তাঁর শক্তিমত্তা, কর্তব্যপালনে তাঁর চিত্তাকর্ষক ঐকান্তিকতা, সর্বোপরি তঁ'র অকৃত্রিম গুরুভক্তিই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হল। কি করে এই অসম্ভব সম্ভব

হয়েছিল তার ইতিহাস দুর্নিরীক্ষ্য। কিন্তু গুরুদ্রোহী শিষ্য সব শেষে তাঁর গুরুভক্তির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের চিত্ত জয় করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের পুনর্মিলন যে সদাচারসম্মত সৌজন্যের স্তর পেরিয়ে সারস্বত ক্ষেত্রেও নিগূঢ় যোগাযোগ সৃষ্টি করেছিল তার একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবিগুরুর ৭৭-৭৮ বৎসর বয়সে লেখা ভাষা সংক্রান্ত এই গ্রন্থে একটিমাত্র সূত্রনির্দেশক পাদটীকা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ৫৪ পৃষ্ঠায় "পুরোনো বাংলা গদ্যের একটু নমুনা" উদ্ধৃত আছে। এই উদ্ধৃতির সূত্রনির্দেশ করা আছে পাদটীকায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস লিখিত বাংলা গদ্যের প্রথম প্রবন্ধ থেকে তুলে দেওয়া হোলো।" পরবর্তী পৃষ্ঠায় "ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গদ্য দেখা দিয়েছিল" তারও নমুনা রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন "সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ থেকে।" সজনীকান্তের 'রাজহংস' কাব্যগ্রন্থ পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমি পারি নি। কিন্তু এ পেরেছে।" কবিগুরুর এই সস্নেহ উক্তিতে যেমন কবি সজনীকান্তের গৌরব করবার কারণ ছিল, তেমনি 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থ রচনায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের গবেষক সজনীকান্তকে যে সম্মান দিলেন তাও তাঁর পক্ষে কম শ্লাঘার নয়। তার চেয়েও বড় কথা, সজনীকান্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ যদি আন্তরিক না হত তাহলে এ ভাবে তিনি তাঁর গ্রন্থরচনায় সজনীকান্তের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন না। লক্ষ্য করতে হবে যে, উক্ত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পুরনো বাংলা গদ্য এবং বঙ্কিমের প্রথম যুগের অচলিত গদ্যের নমুনা দুটি সজনীকান্তের রচনা থেকেই গ্রহণ করেছেন। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, সমগ্র গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অন্য কোনও প্রাবন্ধিকের উল্লেখমাত্র করেন নি। একমাত্র সজনীকান্তকেই তিনি সে সম্মান দিয়েছেন।

দুই

১৩৪৫ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯৩৮ জুলাই) রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বাংলা কাব্যপরিচয়' নামে বাংলা কবিতার একখানি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যসংকলনের পরিকল্পনা-পর্ব থেকে শুরু করে আদ্য মধ্য ও অন্ত্যপর্বের ইতিহাস বিশেষ চিত্তাকর্ষক। সে ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনার স্থান ও সুযোগ এখানে নেই। কবিতার প্রাথমিক নির্বাচনের ভার পড়েছিল

বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের তৎকালীন কর্মকর্তা কিশোরীমোহন সাঁতরা এবং অধ্যাপক হিরণকুমার সান্যালের ওপর। তাঁদের সহকর্মীরূপে নিযুক্ত হন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৭ সনে কবিতা সংগ্রহ ও নির্বাচনের কাজ চলে। '৩৮ সনে মুদ্রণ শুরু হয় এবং জুলাই মাসে কাব্যসংকলনখানি প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন কবি স্বয়ং। একটি 'পরিশিষ্ট' ছিল নন্দগোপাল সেনগুপ্তের লেখা।

এই কাব্যসংকলনের প্রাথমিক স্তরে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল প্রভূত। প্রাথমিক নির্বাচনের পর তিনি কবিতাগুলি দেখে চূড়ান্তভাবে তাঁর সম্মতি বা অসম্মতি দান করতেন। কিন্তু সংকলনকার্য যতই অগ্রসর হতে লাগল ততই নানা কারণে কবির উদ্বেগ বেড়ে চলল। লোকান্তরিত কবিদের নিয়ে বিশেষ ঝামেলা ছিল না, কিন্তু জীবিতদের নিয়েই শুরু হল নানা রকম হাঙ্গামা। কবিগুরুর নামে কাব্যসংকলন,—সুতরাং সবার প্রতি সমান সুবিচার করতে হবে, সবাইকে সন্তুষ্ট করতে হবে, অথচ সংকলনখানি হবে উঁচু দরের। এই তিন দিক সামলানো যে অসম্ভব ব্যাপার তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাবনার অন্ত রইল না। 'পরিশিষ্ট' লিখেছিলেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। তাতে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশিত হওয়াই স্বাভাবিক। বলাই বাহুল্য, তা সব সময় সবার পক্ষে সুপাচ্য হবার কথা নয়। কিন্তু অন্তিম দায়িত্ব সংকলনের সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের। তিনি পরিশিষ্টকে কাটছাঁট করে ছাপতে দিলেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নন্দগোপালকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি বলছেন, "হেমচন্দ্র ও বৈষ্ণব কবি প্রভৃতি সম্বন্ধে কাব্য-পরিচয়ের পরিশিষ্টে তোমার অভিমত পড়ে প্রকাশক-সঙ্ঘ বিচলিত হয়েছেন। তাঁরা বলেন এতে বাঙালী পাঠক অসুস্থ ও অশান্ত হয়ে পড়বে, যেহেতু এ বই সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর জন্যে, সে কারণে অপ্রিয় সত্য এর উপযোগী নয়। বিদ্যালয় পাঠ্যরূপে গ্রাহ্য হবারও নিশ্চিত বাধা ঘটবে। তাই আমি বিস্ফোরক লাইনগুলি তুলে দিলাম। বিশ্বের শান্তি রক্ষার জন্যে এ রকম সতর্কতা প্রবলপ্রতাপ রাষ্ট্র-সভাতেও দেখেছি।" [১৩৪৫-এর ৩ জ্যৈষ্ঠ তারিখের চিঠি; দ্রষ্টব্য, নন্দ-গোপাল সেনগুপ্ত রচিত 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ']।

শুধু পরিশিষ্টই নয়, কবিগুরুর সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভূমিকাটির কোন কোন মন্তব্য সম্পর্কেও কেউ কেউ খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। 'নিবেদনে' কবি লিখেছিলেন, "অনেক কবিতা চোখে পড়েনি। অনেক নির্বাচন যোগ্যতর

হতে পারত। যে সংকলনে রচয়িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হননি তাঁদের নির্দেশ পালন করলে হয়তো তা সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা থাকত।” কিন্তু কবিগুরুর এ সব বিনয়বচন সত্ত্বেও ‘বাংলা কাব্যপরিচয়’ কবিসমাজে সমাদৃত হয় নি। কিছু বই ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সহ প্রকাশিত হয়েছিল। বাকিগুলিতে ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট—দুই-ই বর্জিত হল।

যাই হোক, সংকলনখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এর সংস্কার ও নবসংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এই সংস্কারকার্যে তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে পাঁচজন সদস্যের একটি পরিষৎ তিনি গঠন করলেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য ছাড়া এই পরিষদের অন্যান্য চারজন সদস্য হলেন সজনীকান্ত দাস, হিরণকুমার সান্যাল, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও কিশোরীমোহন সাঁতরা।

রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্রটি হল এই :

> I hereby appoint a Board consisting of Sjs. Sajanikanta Das, Hiron Kumar Sanyal, Nanda Gopal Sen Gupta, and Kishori Mohan Santra with Sj. Charu Chandra Bhattacharjee as secretary to advise me in the selection of poems for the revised second edition of “বাংলা কাব্যপরিচয়”. I hope they will kindly accept the office.
>
> 25. 7. '38 Rabindranath Tagore

এই নিয়োগের পূর্বদিন প্রাতে, ১৯৩৮ সনের ২৪ জুলাই রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে ডেকে পাঠালেন জোড়াসাঁকো-ভবনে। সেই বৈঠকে নিশ্চয়ই কাব্যপরিচয়ের সংস্কার-কর্ম নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। তারই ফলে পরদিন সদস্য-পঞ্চক নিয়ে পরিষৎ গঠিত হয়ে থাকবে। গুরুদেবের এই সস্নেহ আহ্বান সজনীকান্তকে অভিভূত করল। তিনি আনন্দে উল্লসিত হয়ে কাব্যপরিচয়ের সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন।

উল্লসিত হবার হেতু সজনীকান্তের অবশ্যই ছিল। তিনি ব্যঙ্গরসিক কবি ও বিদূষণ-দক্ষ পত্রিকা-সম্পাদক হিসাবে সাহিত্যিক সমাজের সসম্ভ্রম স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিখ্যাতি তাঁর অনুরাগী বন্ধুমহলের বাইরে তখনও বেশিদূর প্রসারিত হয় নি। বাংলা কাব্যপরিচয় সংকলনে রবীন্দ্রনাথ কবি সজনীকান্তকে পূর্ণ স্বীকৃতি দান করলেন। কাব্যপরিচয় গ্রন্থখানি আয়তনে খুব বড় ছিল না। কোন কবির একাধিক কবিতাকে স্থান

দেবার মত পরিসর ওতে অল্প ছিল। জীবিত কবিদের মধ্যে যাঁদের একাধিক কবিতা ওতে স্থান পেয়েছে সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে সজনীকান্তও অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের "অন্তত গোটা তিনেক" কবিতা দিতে চেয়েছিলেন। অন্তত কিশোরীমোহনকে লেখা ১৩৪৪ সালের ৩০ বৈশাখের চিঠিতে কবির এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে। পরে সম্ভবত গ্রন্থের আয়তন লঘু করার জন্যে দুটি কবিতা দেওয়া হয়েছিল। নিজের এই কবিস্বীকৃতিতে সজনীকান্ত নিশ্চয়ই খুশী হয়েছিলেন। তা ছাড়া, এতদিন পরে কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি জয়লাভ করলেন। কবিতা নির্বাচন ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁর ওপরই নির্ভর করলেন। কেন না, সহায়ক-পরিষদেব সদস্য-পঞ্চকের মধ্যে হিরণকুমার নন্দগোপাল ও কিশোরীমোহন প্রথম সংস্করণের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিশ্বভারতীর গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের সঙ্গে তখন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কাজেই কবিতা পুনর্নির্বাচন কর্মে প্রকৃতপক্ষে একমাত্র নবাগত হলেন সজনীকান্ত।

তিন

১৯৩৮ সনটিকে আমরা সজনীকান্তের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৎসর বলেছি। ২৫এ জুলাই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কাব্যপরিচয়-পুনঃসংস্কার-পরিষদের সদস্যপদে নিয়োগপত্র পাবার পর বৎসরের শেষার্ধে গুরুশিষ্যের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। ঘন ঘন পত্রালাপ এবং শান্তিনিকেতনে সজনীকান্তের পৌনঃপুনিক যাতায়াত থেকে এই ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৩৪৫-এর আশ্বিন থেকে (সেপ্টেম্বর ১৯৩৮) ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের অর্থে ও পরিচালনায় "অলকা" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত তার সম্পাদকপদে বৃত হয়েছিলেন। পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ন' মাস সজনীকান্ত 'অলকা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম সংখ্যা 'অলকা'র জন্যে রবীন্দ্র-নাথের একটি লেখা সংগ্রহের বাসনায় সম্পাদক সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর কাছে উপস্থিত হলেন। কাব্যপরিচয়ের আলোচনা তো আছেই। আরেকটি জরুরি বিষয়ও ছিল। মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিনয়রঞ্জন সেনের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের সম্পাদনায় বিদ্যাসাগর

গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪৪-এর ফাল্গুন মাসে। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বিনয়রঞ্জনকে ১৩৪৫-এর ৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে এক পত্রে লিখলেন, "বিদ্যাসাগরের বেদীমূলে নিবেদন করবার উপযুক্ত এই অর্ঘ্য রচনা। আমরা সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি দ্বারাই তাঁর স্বদেশবাসীরূপে তাঁর গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি তাতে নিজেদের শোচনীয় হীনতারই পরিচয় হবে।"

বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সমিতির পক্ষ থেকে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উৎসব হবে ২৪ ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন দার্শনিক অধ্যাপক [পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি] ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি প্রশস্তি-কবিতা কবিগুরুর কাছে আদায় করবার জন্যে বিনয়রঞ্জনের তাগিদে সজনীকান্ত গেলেন শান্তিনিকেতনে। ১৪ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) শান্তিনিকেতনে পৌঁছে তিনি দেখলেন কবিগুরু আসর জমিয়ে বসেছেন। "মুক্তির উপায়" নামক গল্পটিকে তিনি সদ্য নাট্যরূপ দিয়েছেন। সেটা অন্তরঙ্গ জনদের পড়ে শোনাচ্ছিলেন। পড়া কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল। সজনীকান্ত উপস্থিত হওয়ায় তাঁর সম্মানার্থে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলেন। এই হাস্য-রসাত্মক গল্প-প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথ নাট্যাকারে সরসতর করে পরিবেশন করেছেন। তার ওপর কবির অতুলনীয় পঠনভঙ্গি। পড়া তো নয় একাই যেন সমস্ত নাটকখানি অভিনয় করে গেলেন। হাসতে হাসতে শ্রোতাদের পেটে খিল ধরার যোগাড় হল।

সম্পাদক সজনীকান্ত এই দুর্লভ মাহেন্দ্রক্ষণের সুযোগটি হারালেন না। অলকার জন্যে 'মুক্তির উপায়' নাটকটি প্রার্থনা করলেন। কবির কাছে লেখা চেয়ে প্রার্থী বিফলমনোরথ হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল। সজনীকান্তের প্রার্থনা পূর্ণ হল। হৃষ্টচিত্তে তিনি কলিকাতা ফিরে এলেন। দুদিন পরে কবিগুরুকে তিনি বিদ্যাসাগর-প্রশস্তি কবিতা এবং 'মুক্তির উপায়ে'র জন্য স্মারকপত্র পাঠালেন। উত্তরে ৬।৯।৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু,

ভুলেই গিয়েছিলুম। তোমার চিঠি পেয়ে আজ আমি কয়েক লাইন লিখে মেদিনীপুরে কালেক্টরকে পাঠিয়ে দিয়েছি। মুক্তির উপায় থেকে

বোধ হচ্চে আমার মুক্তির উপায় নেই। আচ্ছা কপি করিয়ে পাঠিয়ে দেব। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী বলচে পালিশ করে দেওয়া দরকার, আমার মন বলচে আর তো পারা যায় না। যারা জন্মায় কুঁড়ে হয়ে তারা মরে খাটতে খাটতে। ইতি ৬।৯।৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যে চতুর্দশপদীটি লিখে পাঠালেন তার প্রথম পঙ্‌ক্তি হল "বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে।" যথাদিনে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। সজনীকান্ত এই উপলক্ষে মেদিনীপুর গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন অলকার জন্যে 'মুক্তির উপায়' আসে নি। সঙ্গে সঙ্গেই কবির কাছে দ্বিতীয় আবেদনপত্র পাঠালেন। উত্তরে ১৫।৯।৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু,

আমার দোষ নেই। কপি করিয়ে ঠিক করে রেখেছিলুম লেখাটা—যাঁরা আমার পরিমণ্ডল, তাঁরা আরো কপি করানো কর্তব্য বোধ করলেন—যাঁরা কপি করেন তাঁরাও ক্ষিপ্রকারিতার জন্যে বিখ্যাত নন। রেজেস্ট্রি ডাকে কাল রওনা হয়ে গেছে বলে অনুমান করি। লেখাটার মধ্যে সকলের চেয়ে ব্যবহার্য হচ্ছে আমার দস্তখৎ—সেইটের ছাপ দেখিয়ে ডুবো মাল যদি তোমরা চালাও বাজারে, তবে তার দায় তোমরা কবুল কোরো সাধারণের দরবারে।

ভূমিকায় পুষ্পমালার উপরে অগুরুবনদাহনের ব্রত আরোপ করেছি—সে অংশ তুলে দিয়ো—লোকে ভাববে বইটা প্রপাগ্যাণ্ডা—সেটা সত্য নয়। এটা বিশুদ্ধ উচ্চহাস্য।

কাব্যপরিচয়ের পরিমার্জিত রূপের জন্যে অপেক্ষা করে আছি। দ্বিতীয় খণ্ডে আদিরসের বাহনটিকেও প্রয়োজন আছে। দিলীপকুমার তাঁর কবিতার নির্বাচনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, আমি তাঁকে জানিয়েছি দ্বিতীয় সংস্করণের দায়িত্ব আমি নেব না। তোমার নাম করি নি তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ইতি

১৫।৯।৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২শে তারিখেই পুনরায় জরুরি তারযোগে আহূত হয়ে সজনীকান্ত

শান্তিনিকেতনে গেলেন। স্থির হয়েছে 'মুক্তির উপায়' অভিনীত হবে। তারই মহড়া চলছে। অলকা তখনও বেরোয় নি। সজনীকান্ত 'মুক্তির উপায়ে'র দশ সেট প্রুফ নিয়ে সন্ধ্যার দিকে শান্তিনিকেতন পৌঁছলেন। কবি মহাখুশি। অভিনয় নিয়ে হৈ হৈ কাণ্ড চলছে। কিন্তু পরদিনই মহালয়া। কলিকাতায় ফিরে অলকা বের করতে হবে। সুতরাং সজনীকান্ত তাড়াহুড়ো করে কলিকাতা ফিরে এলেন। যথাকালে অলকা প্রকাশের পর শান্তিনিকেতনে প্রেরিত হল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু,

দুখণ্ড অলকা পেয়েছি। বিতরণ হয়ে গেছে। এখন ছুটির সময় আর পাঠাতে হবে না। যদি কোন কারণে পরে দরকার হয় জানাব। আশা করি তোমার পাঠকদের মেজাজ বিগ্‌ড়িয়ে যায় নি।

কাব্য সংকলন উপলক্ষ্যে .....উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাকে ঠাণ্ডা করতে পার তো কোরো। এই বইয়ে......সেনের বিরহ তাকে বেজেছে। ......দুঃখিত। ......ক্ষাপ্পা। তাদের কবিতা তাদের দিয়েই বাছাই করতে দেওয়া চলে কিনা ভেবে দেখো। ইতি

২৮ ৯।৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কাব্যপরিচয়ের প্রসঙ্গ এসেছে। কবি ও কবিতা নির্বাচন নিয়ে তরুণ কবিরা যে কতটা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তার আভাস ওতে পাওয়া যাবে। স্থির ছিল পূজার অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় এলে সেখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কাব্য-পরিচয়-প্রসঙ্গ আলোচিত হবে। কেউ কেউ সংকলনে ঐতিহাসিক কালক্রম রক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। তারই ইঙ্গিত পাওয়া যাবে কবির পরবর্তী চিঠিতে। তিনি লিখছেন :

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু,

আমি পলাতকা। চলেছি পাহাড়ের দিকে। স্বভাব-সঙ্গত অভ্যাসে ভুল করেছি—উলটা বুঝেছি—গরম যখন দুঃসহ ছিল তখন শীতের সন্ধানে

বেরব বলে মন স্থির করতে করতে ভাদ্দ্বরে গরমের ফ্রন্টিয়ারে এসে পড়েছি। আয়োজনটা যখন পাকা হয়েছে প্রয়োজনটা তখন পরিহাস করতে উদ্যত, কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে মন বদলাতে গেলে পরিচিতবর্গের পক্ষে সেটা কৌতুক-জনক হবে জেনে দৃঢ়তার সঙ্গে জেদ বজায় রাখ্‌তে হোলো। কাল যাব কলকাতায়, সোমবারে যাব কালিম্পঙ।

কাব্যসাহিত্যকে আমি ইতিহাসের গণ্ডি দিতে চাই নি—আমার ও বুদ্ধি নেই। কবিতা যদি যেমন তেমন করে আসন নেয়, তাতে তার রসের ক্ষতি বা মর্যাদার হানি হয় না। ওদিকে আমি চিন্তাই করি নি। এর থেকে বুঝবে আমার সংকলন-কর্মের অযোগ্যতা। কোনো কোনো কবি ফরমাস করেছেন এবারে যেন আমি ভালো কবিতা বাছাই করি অর্থাৎ তাঁদের মতের অনুসরণ করি। মত কি তা জানার সম্ভাবনা নেই, থাকলেও হয়তো মানার সম্ভাবনা আরো দুঃসাধ্য। কবি সম্প্রদায়ের মেজাজ আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু বোধ হচ্চে দেবা ন জানন্তি। যাই হোক এখন থেকে শত হস্তেন কবিনাম্। তোমার সাহস আছে—বয়সও অল্প, এই বিপদজনক অধ্যবসায় তোমাকেই সাজবে।

ফিরে আসি তার পরে মোকাবিলায় কাজের কথার আলোচনা করব। ইতি

৭।১০ ৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চার

রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি রচনার একটি ইতিহাস আছে। শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীর কথা "সত্যবাণী দেবীর দৌত্য" অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। হেমন্তবালার কন্যা বাসন্তী দেবীর প্রথম সন্তান কিশোর-কান্তের জন্ম উপলক্ষে কবিতাটি রচিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় অবশ্য যৎসামান্য অদলবদল হয়েছে। কবিতাটি রচনার তারিখ ৩০ জুলাই ১৯৩৮।

কিশোরকান্তের ডাকনাম নাচন। কবিতাটি পেয়ে হেমন্তবালা কবিকে যে পত্র লেখেন সেই পত্রখানি সজনীকান্তই কবির কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিলাষ ছিল, কবিতা ও তার উত্তর, দুটিই তিনি শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ করেন। কবির কাছে তাঁর এ প্রার্থনা মঞ্জুরও

হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে "নবজাতক" কবিতাটি কিশোরপত্রিকা 'পাঠশালা'য় প্রকাশিত হওয়ায় সজনীকান্ত একটু অনুযোগের সুরে ১৪ অক্টোবর কবিকে একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার জন্যও রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা পাবার আবেদন করেছিলেন। সঙ্গে সদ্য-আবিষ্কৃত বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি চিঠিও ছিল। তারই উত্তরে ২১ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মস্ত একটা ছিদ্র আছে আমার রচনার ঘটে। একদিক থেকে যা ভর্তি হয় অন্য দিক থেকে তা নিষ্ক্রান্ত হতে বিলম্ব করে না। কিশোরকান্তর অভিনন্দন পত্রখানা কবে পৌঁছেছে গিয়ে 'পাঠশালা'য় তা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। বোধ হচ্ছে যেন নাচনের নামে হেমন্তবালা আমাকে যে পত্রখানা লিখেছিলেন সেইটের সঙ্গে জড়িয়ে কবিতাটা তুমি ছাপতে ইচ্ছা করেছিলে—তা যদি হয় তাহলে সেই প্রসঙ্গে পূর্ব প্রকাশিত কবিতা আবার প্রকাশ করলে দোষ হবে না। আমি আজ নাচনের উদ্দেশ্যে যে পত্রখানি লিখেছি সেটা ব্যবহার করলে চক্রটা সম্পূর্ণ হতে পারবে। যে পত্র বাহনরূপে তুমি এনেছিলে আমার কাছে, সেই পত্রের উত্তরটিও তোমাকে পাঠাই, তুমি যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ো। কাগজে প্রকাশ করবার পক্ষে এটা যদি কটুস্বাদ হয়ে থাকে তবে চেপে যেয়ো।

বঙ্কিমের চিঠিখানি চমৎকার। কোনো এক অবকাশে কাজে লাগাতে পারব।

সাহিত্য পরিষদের জন্যে লেখা চেয়েছ। আমার পুরোনো লেখনীতে নতুন লেখা সরচে না। কী জীবনে কী রচনায় থামবার টর্মিনস লেখনী জোর করে পেরোতে গেলেই দুর্গতি ঘটায়।

'ভাষা পরিচয়ে'র ভূমিকাটা তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু ঐ বইটার 'পরে অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের। শ্যামাপ্রসাদের কাছ থেকে যদি সম্মতি নিতে পারো তাহলে বাধা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে বোধ হয় আপত্তি হবে না।

কাব্যপরিচয় নিয়ে কবিদের মন সাংঘাতিক হয়ে উঠেচে। চেম্বারলেনি পদ্ধতিতে কাটা ছেঁড়া করে এই হিটলারি সম্প্রদায়ের উষ্মা নিবারণ করতে যদি পার তাহলে আমার পরিত্রাণের উপায় হবে।

মুক্তির উপায় যখন তোমাকে দিয়েছিলুম আমার মন ছিল নিষ্কাম। যদি দক্ষিণা দিতে চাও আমার নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিলে পুণ্যলাভ করবে। ইতি ২১।১০।৩৮

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বাংলাভাষা-পরিচয়ে'র ভূমিকাটি ১৩৪৫-এর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন আচার্য সুনীতিকুমারকে। উৎসর্গপত্রে তিনি সুনীতিকুমার প্রসঙ্গে "ভাষাচার্য" কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শনিবারের চিঠির উপদেষ্টা মণ্ডলীর একজন ছিলেন। শনিবারের চিঠির পক্ষে তিনি কবিগুরুর কাছে অনেক ওকালতিও করেছেন। তা ছাড়া বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য-সফর সম্পর্কে তাঁর প্রতিকূল মনোভাব তিনি স্পষ্টভাষাতেই কবিগুরুকে জানিয়ে ছিলেন। এসব কারণে উভয় পক্ষে ঈষৎ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গুণীর সমাদর করতে কোনদিনই পশ্চাৎপদ হন নি। অল্পদিন পূর্বে প্রকাশিত প্রাথমিক বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখা তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ তিনি বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে উৎসর্গ করেন। বাংলাভাষা পরিচয় গ্রন্থখানিও ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের নামে উৎসর্গ করার ইচ্ছা একই মনোভাব থেকে উৎসারিত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অচিরকালের মধ্যে প্রকাশিত তিনখানি বইয়ের নামকরণে "পরিচয়" শব্দটি লক্ষ্য করবার মত। বিশ্বপরিচয়, বাংলা কাব্যপরিচয়, বাংলাভাষা-পরিচয়।

সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় জানতে পেরে কবি ও ভাষাতাত্ত্বিকের মিলনের সূত্রযোজনা করলেন। তাঁর চিঠির উত্তরে ২৭ অক্টোবরের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু,

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্বন্ধে কয়েক লাইন লিখে পাঠালাম।

পিওনের পদ পেয়ে পথের মধ্যে তুমি ডাক মেরেছ এজন্যে হেমন্তবালার কাছে তোমার জবাবদিহী, আমার কর্তব্য আমি করেছি।

সুনীতিকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এখানে আসবার সঙ্কল্প করেছ শুনে খুশি হলুম। ভাষা সম্বন্ধে আমার বইখানি তাঁর নামেই উৎসর্গ করচি। তাঁকে দেখিয়ে রাখব বলে অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলুম। তিনি ছিলেন প্রবাসে। ছাপা আরম্ভ হয়ে গেছে, তবু এখনো সময় উত্তীর্ণ হয় নি। তিনি এলে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারবেন। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাবলীতে ভুক্ত হবে। আনাড়ি হাতের ভুলচুক না থাকাই উচিত। তোমাদের যখন অবকাশ এসো। বেশি সঙ্গী এনো না, বিদ্যালয় খোলবার মুখে অভিভাবকদের ভিড় হবে। ইতি ২৭।১০।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এদিকে অলকায় 'মুক্তির উপায়' প্রকাশের জন্য যৎসামান্য দক্ষিণা রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয়েছিল। উত্তরে কবি যে চিঠি লেখেন তা কৌতূহলোদ্দীপক বলে এখানে প্রকাশ করা গেল।—

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

সর্বত্রই লেখা দিয়ে থাকি নিস্পৃহভাবে। পরিবর্তে মূল্য যদি পাই সম্মানের কথা বিচার করিনে। কেননা সে কথা বিচার করতে গেলে অহংকারকে প্রশ্রয় দেবার আশঙ্কা থাকে। কাজ কী। অলকা থেকে যে পরিমাণ দক্ষিণা পেয়েছি সেটা সেই পরিমাণ কাজে লাগবে, ধন্যবাদ দিতে রাজি আছি তার চেয়ে বেশি পরিমাণে। তোমরা শনিবারে আসবে শুনে খুশি হলুম।

নাচনের চিঠিখানি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছ আশা করি। ইতি ৩১।১০।৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁচ

৫ই নভেম্বর ভোরের ট্রেনে সস্ত্রীক সুনীতিকুমার ও সজনীকান্ত বোলপুর পৌঁছলেন। সঙ্গে বিখ্যাত আলোক-চিত্রশিল্পী শম্ভু সাহাও ছিলেন। কবিগুরুর সঙ্গে সুনীতিকুমার ও সজনীকান্তের এই সাক্ষাৎকারের কয়েকটি আলোকচিত্র শম্ভুবাবু তুলেছিলেন।

. সেবার সুনীতিকুমারের সঙ্গে সজনীকান্ত দু'দিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। প্রায় সর্বক্ষণ কবির ঘনিষ্ঠ সঙ্গ ও সান্নিধ্য লাভ করে সবাই যে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা কাব্যপরিচয় নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনায় সজনীকান্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সংকলন প্রকাশের ব্যাপারে নানা দিক থেকে আঘাতে আঘাতে কবির মন জর্জরিত হয়ে উঠেছে। বেশী বাধা কবির অন্তরঙ্গ মহল থেকেই এসেছিল বলে সজনীকান্তের ধারণা হয়। যাই হোক, ততদিনে আদি ও মধ্য যুগের কবিতা নির্বাচন শেষ হয়ে এসেছে। অন্ত্যযুগও সমাপ্তপ্রায়। 'মুক্তির উপায়' নাটকের মহড়া তখনো হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর মঞ্চস্থ হয় নি। ১১।১১।৩৮ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রঙ্গমঞ্চে 'মুক্তির উপায়ে'র মুক্তিসাধন ঘটল না। প্রয়োগকুশল নটের অভাব।

কাব্যপরিচয়ের আদ্য এবং মধ্যদের শ্রাদ্ধ সমাধা হয়ে গেছে—সুতরাং তাঁরা অশান্তি ঘটাবেন না। অন্ত্যরা ভয়াবহ। আমি শান্তিপ্রয়াসী, খর রসনার আস্ফালনে ভীত। সাহিত্যে অত্যন্ত যাঁরা প্রত্যন্ত দেশীয় তাঁরাও আমাকে ভয় করেন না। সেইজন্যেই অন্ত্যবর্গের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার তোমারই উপরে। তোমার চর্মে খর নখরের প্রখরতা প্রতিহত হবে জানি। কবির দল বরযাত্রদলের মতো, সংকলনকর্তা কন্যাকর্তার সমপর্যায়ের। মাথা হেঁট করেও বোধ হয় তুষ্টিসাধন করতে হবে। তাই বলে মাথা ধুলোয় লুটিয়ো না। এই অনুষ্ঠানে হিটলার চেম্বারলেনী পালার সাহিত্যিক রূপ দেখতে পাব আশা করচি। অর্থাৎ নিজের মানহানি করেও যতটা পারো সব দাবীই মেনে চলতে হবে না। কিন্তু তাঁরা যাঁদের চার্চহিল কৃপার বলে

ত্যাজ্য করতে চান তর্জনের ভয়ে তাঁদের বর্জন করাটা অবৈধ হবে। এ গ্রন্থে রবাহূত অনাহূতদেরও যথাসম্ভব পাত পেড়ে দেবার আমি পক্ষপাতী। যাই হোক এবার যে লড়াই হবে আমি দূর থেকে তাই দেখব—তাতে কৌতুক আছে। ইতি ১১।১১।৩৮

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এবার যে লড়াই হবে আমি দূর থেকে তাই দেখব।" লড়াই কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হলই না। বিরাটপর্বের পরে উদ্যোগপর্বেই বাংলা গীতিকাব্য-সংকলনরূপ মহাভারত-রচনা অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রইল। ভীষ্মপর্ব পর্যন্ত আর পৌঁছল না। নভেম্বরের শেষ দিনে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে লিখলেন :

"সজনীকান্ত,

কাব্যপরিচয়ের দ্বিতীয় দেহান্তর কাল কতদূরে। পত্রখানি তোমার দৃষ্টি জন্য পাঠাই। তোমাদের কাজ শেষ হবে কিন্তু পত্রের পথ বন্ধ হবে না।

সুফিয়া হোসেনের কবিতার বই সম্প্রতি হাতে পড়ল। বিশেষ সমাদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ

এই চিঠিতে যে "পত্রখানি"র উল্লেখ আছে তা আয়তনে যেমন দীর্ঘ, বক্তব্যে তেমনি অত্যন্ত ঝাঁজালো। লিখেছিলেন একজন আধুনিক কবি। কাব্য-পরিচয়ের পাণ্ডুলিপি ডিসেম্বরের গোড়াতেই প্রেসে যাবার কথা ছিল। যথাকালে সজনীকান্ত বাংলা কাব্যপরিচয় নবসংস্করণের পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগের কর্মকর্তা কিশোরীমোহন সাঁতরার হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। 'বাংলা কাব্যপরিচয়' নবরূপে আর প্রকাশিত হল না। কেন হল না তার উত্তর বর্তমান লেখকের জানা নেই।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুরুদক্ষিণা

এক

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২২শে নভেম্বর কলিকাতার প্রভাতী সংবাদপত্রে 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা' আবিষ্কারের সংবাদ ঘোষিত হয়ে রবীন্দ্র-রসিক-সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। আবিষ্কর্তার নাম সজনীকান্ত দাস। গবেষক সজনীকান্ত তখন রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছেন। 'শনিবারের চিঠি'তে ১৩৪৬-এর কার্তিক থেকে 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' প্রকাশিত হচ্ছে। পুরনো তত্ত্ববোধিনী, ভারতী, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকা ঘেঁটে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের অনামা ও বেনামা লেখাগুলি আবিষ্কারের নেশায় মশগুল হয়ে আছেন। কোন নামহীন বা কল্পিত নামাঙ্কিত লেখা পেলেই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নিচ্ছেন।

ওদিকে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসৌধের নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্মৃতি-সমিতির কর্তারা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করাতে চান। কবিগুরুর সঙ্গে সজনীকান্তের তখন খুব দহরম-মহরম চলছে। তাই তাঁরা কবিগুরুর সম্মতি আদায়ের জন্য সজনীকান্তকেই আবার ধরলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন মংপুতে হাওয়া-বদল করতে গেছেন। সজনীকান্ত মংপুতেই পত্রযোগে তাঁর আবেদনপত্র পাঠালেন। তাতে রচনাপঞ্জী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং মেদিনীপুরের আবেদন এক সঙ্গে যুক্ত হল। তারই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

ওঁ

মংপু
দার্জিলিঙ

কল্যাণীয়েষু,

পূজোর ছুটি এখানে কাটিয়ে তবে স্বস্থানে ফিরব। আমার রচনাপঞ্জী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাও কোরো কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাবার আশা রেখো না। আমার পঞ্জিকার তারিখ আন্দাজের দ্বারা চালিত। তার কারণ আমার মনে ঘটনার পূর্বাপরতাবোধ তথ্যমূলক নয়, অনুভূতির স্পষ্টতা অনুসারে তারা আপনার পংক্তি গ্রহণ করে।

আমার শরীর সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা বোধ হয় তোমাদের ইচ্ছানুবর্তী। এ ঘর থেকে ও ঘর আমার পক্ষে বিদেশ। একে চলতে হয় সাবধানে, অভ্যস্ত

নিয়ম আঁকড়ে ধরে—নতুন যায়গায় সেটা সহজসাধ্য হয় না, কষ্টকর হয়। মেদিনীপুর যেতে হলে আমার পক্ষে একটা দৈহিক বিপ্লব হবে। কলিকাতায় তোমার সঙ্গে দেখা হলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব। বস্তুত যথার্থ হিসাবমতে আমি অতীতের পর্যায়ভুক্ত, কোনোমতে বর্তমানে আমার টিকে থাকা যাকে বলে এনাক্রনিজ্‌ম্‌, অর্থাৎ সময়লঙ্ঘন দোষ। ইতি ১।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সজনীকান্ত 'তত্ত্ববোধিনী', 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' এবং 'ভারতী' পত্রিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের সম্ভাব্য রচনাগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কবিগুরুর চিঠি পেয়ে সেই তালিকা তিনি মংপুতে পাঠিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, উপনয়নের পর যখন তিনি পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ের ডালহৌসি পাহাড়ে মাস চারেকের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন মহর্ষিদেব অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রক্টারের লেখা সরলপাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষ্‌গ্রন্থ থেকে অনেক বিষয় মুখে মুখে বালক-পুত্রকে বুঝিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ তা বাংলায় লিখে রাখতেন। তাঁর ধারণা ছিল এই লেখাগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ধারণা অনুসারে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত জ্যোতিষবিষয়ক লেখাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গদ্যরচনা। কিন্তু সজনীকান্ত অনুসন্ধান করে দেখলেন যে, ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠমাস থেকে পরবর্তী ছ' সংখ্যায় "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠমাস ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন। ১৮৭৩-এর এপ্রিল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের সঙ্গে ডালহৌসিতে ছিলেন। তত্ত্ববোধিনীতে সে সময় জ্যোতিষ বিষয়ক অন্য কোন রচনা প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং এই সুদীর্ঘ রচনাটিকেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা বলে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু প্রবন্ধটি পড়ে সজনীকান্ত দেখলেন, প্রবন্ধটি ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ কোনও প্রবীণ ব্যক্তির রচনা। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনামূলক বহু আঙ্কিক সিদ্ধান্তও ওতে রয়েছে। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বক্তব্য লিখে পাঠান ১৫ অক্টোবর ১৯৩৯-এর চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি আমাকে মুস্কিলে ফেললে। তোমার পঞ্জীতে যে লেখাগুলি উদ্ধৃত করেছ তার অধিকাংশ মনে আনতে পারচি নে। অর্থাৎ এদের পক্ষে বা

বিপক্ষে হলফ পড়ে সাক্ষ্য দেবার মত স্পষ্ট ধারণা আমার নেই। অতএব তোমাদের তরফ থেকে আমার পঞ্জীতে এদের যদি স্থান দেও উচ্ছেদ করবার মতো জোর আমার নেই। বাল্য-লীলায় এ রকম প্রলাপোক্তিকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। অতএব তোমাদের প্রমাণগুলিকে অঙ্গীকার করে নেওয়া গেল। প্রথম লর্ড লিটনের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে যে কবিতা লিখেছিলুম হিতৈষীদের সতর্কতা মান্য করে সেটা লোপ করে দেওয়া হয়েছিল। মনে আছে কেউ কেউ সেটা হাতে লিখে প্রচার করে বেড়াতেন।

পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্যরূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোনো অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না।—ঝান্সির রাণী ও সান্ত্বনা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে নেই। ইতি ১৫।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠি পাওয়ার পর সজনীকান্ত তাঁর পুনশ্চ বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের কাছে নিবেদন করলেন। সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হেমন্তবালা দেবীর একটি লেখাও প্রেরিত হল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এখান থেকে ৫ই নবেম্বর নাগাদ কলকাতায় ফেরবার সংকল্প করেছি। তখন তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় আলোচনা হবে।

হেমন্তকুমারীর লেখাটি খুব ভালো লাগল, রচনাটি সুনিপুণ এবং আধুনিক জবানীতে যাকে বলে "সাবলীল"। ইতি [illegible]।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অক্টোবরের শেষে হাওয়া বদল করতে সজনীকান্ত দেওঘর গিয়েছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের চিঠি ঠিকানা বদল হয়ে তাঁর হাতে পৌঁছল—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

৫ই নবেম্বর এখান থেকে আমার যাত্রা সুনিশ্চিত। অদৃষ্ট অনিশ্চয়তার জাল ফেলে যে ধীবরবৃত্তি করেন সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে সাহস করিনে। ইতি ২৩।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সজনীকান্ত নবেম্বরের মাঝামাঝি দেওঘর থেকে ফিরে এলেন কলিকাতায়। কলিকাতায় এসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ ১৭৯৬ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের (১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর) ১৪৮-৫০ পৃষ্ঠায় "অভিলাষ" শীর্ষক কবিতাটি তিনি আবিষ্কার করলেন। লেখকের নামের স্থলে লেখা আছে "দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত।" কবিতাটি অমিল পয়ারের চার পংক্তির স্তবকে গ্রথিত। সবসুদ্ধ ৩৯টি স্তবকে সম্পূর্ণ। পড়লেই বুঝতে পারা যায়, বালক-কবি হেমচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সজনীকান্ত এই কবিতার সঙ্গে পর-বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নাম-স্বাক্ষরিত প্রথম রচনা "হিন্দু মেলার উপহার" কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন দুটি কবিতা একই কবির লেখা।

এই আবিষ্কারে উল্লসিত সজনীকান্ত দিগ্‌বিজয়ী বীরের মনোভাব নিয়ে ২১শে নবেম্বর (১৯৩৯) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সঙ্গে করে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলেন। তার পরের ঘটনা তাঁরই মুখে শোনা যাক—

"বিলম্ব সহিতেছিল না। সুতরাং বমাল শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলাম। সেদিন ২১ নবেম্বর তারিখ। দ্বিপ্রহরেই খাইবার টেবিলে পুঁথিপত্র লইয়া বসিলাম। বলিলাম, আপনাকে একটি কবিতা শুনাইব, শুনুন তো। পত্রিকাটি একটু আড়ালে রাখিয়া "অভিলাষ" পড়িতে লাগিলাম। খানিকটা পড়িবার পরই বৃদ্ধের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ও তো আমার লেখা হে, তুমি কোথায় পেলে? পত্রিকাটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম। তিনি সবটা দেখিয়া উল্লাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, তাই তো, এ তো দেখছি আমারই লেখা।

"সংবাদ শান্তিনিকেতনে রটিতে বিলম্ব হইল না। কলিকাতার সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিরা সেখানে ছিলেন। তাঁহারা টেলিগ্রাম-যোগে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা আবিষ্কারের সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

যাবতীয় সংবাদপত্রে বড় বড় হেডিংয়ে, আমার নামের সহিত যুক্ত হইয়া সংবাদ প্রচারিত হইল।”

[শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৬২, পৃ° ৩৯৬]

দুই

শুধু “অভিলাষ”ই নয়, সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের আরেকটি অনামা বাল্যরচনা আবিষ্কারের গৌরব দাবি করতে পারেন। সেটিও একটি দীর্ঘ কবিতা। নাম “প্রকৃতির খেদ।” এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে “হিন্দু মেলার উপহার” কবিতাটি আবিষ্কার করেন। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের স্বনামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার কলিকাতার পার্সিবাগানে অনুষ্ঠিত জাতীয় বা হিন্দু মেলার নবম অধিবেশনে পাঠ করেন। কবিতাটি ১২ স্তবকে লেখা। প্রতি স্তবক চার পংক্তিতে গঠিত। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৩ বৎসর ৯ মাস। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত কবিতাটি স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত কবিতার মধ্যে “হিন্দু মেলার উপহারে”র স্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থানের অধিকারী “অভিলাষ”। তৃতীয় স্থানাধিকারী হল “প্রকৃতির খেদ”। ১৭৯৭ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে। “অভিলাষে”র মতো ওতেও লেখকের নাম ছিল না। সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে কবিতাটি পড়ে শোনালেন। “রবীন্দ্রনাথ—জীবন ও সাহিত্য” গ্রন্থে তিনি লিখছেন, “আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন।”

[পৃ° ২০২]

‘প্রকৃতির খেদ’ কবিতাটি ঠাকুর-বাড়ির ‘বিদ্বজ্জন সমাগম’ সভার ১২৮২ বঙ্গাব্দের বৈশাখের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত “সাধারণী” পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে, “বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘প্রকৃতির খেদ’ নামে স্বরচিত একটি পদ্য-প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারত-ভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইতেছিল।” [সাধারণী, জ্যৈষ্ঠ ৩, ১২৮২]।

'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ বৎসর। সজনীকান্ত বলেছেন, "একজন চতুর্দশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এরূপ রচনা miracle-পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।" কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, এই বয়সেই রবীন্দ্রনাথ 'বনফুল' কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন। 'বনফুল' 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক মাসিকপত্রে ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ থেকে এক বৎসর কাল ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালের কিছু আগে কবি 'বনফুল' রচনা শুরু করেছিলেন ধরে নিলে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি 'বনফুলে'র প্রায় সমসাময়িক রচনা বলেই স্বীকার করতে হবে।

যাই হোক্, সজনাকান্ত কর্তৃক আবিষ্কৃত নিজের বাল্য রচনাবলীর পুনরুদ্ধারে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়ে যে অভিজ্ঞানপত্র লিখে দিলেন তা নিম্নে উদ্ধার করা হল :—

শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাল্য ও কৈশোরের বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমার সর্ব প্রথম মুদ্রিত রচনা "অভিলাষ" তাঁর অভিনব আবিষ্কার! এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার প্রথম চারটি নাটকের অধিকাংশ কবিতা ও গান যে আমার রচনা তা সজনীকান্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। হিন্দু মেলায় দিল্লী দরবার সম্বন্ধে আমার পঠিত কবিতাটি "স্বপ্নময়ী"তে আত্মগোপন করে ছিল সেটাও সজনীকান্তের ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে।...আমি যে দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য ও অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর ইত্যাদি ছদ্মনামে এককালে অনেক লেখাই লিখেছি তা জেনেও বেশ কৌতুক বোধ করছি। এখানে বলা আবশ্যক শেষোক্ত নামটি কোনো লেখক অন্য কোনো রচনায় আত্মসাৎ করেছেন বলে আমার সন্দেহ হচ্চে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন ২১।১১।৩৯

এই নষ্টোদ্ধারের ফলে রবীন্দ্রনাথ এত খুশি হয়ে উঠলেন যে, সজনীকান্তকে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যরূপে গ্রহণ করা হল। ১৯৩৯-এর অক্টোবর থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত শুধু তার সম্পাদকমণ্ডলীতেই স্থান পেলেন না, রবীন্দ্রনাথের 'অচলিত' রচনাবলী সম্পাদনের ভার বিশেষ ভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ওপর ন্যস্ত হল।

তিন

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রকাশিত হোক—এই ছিল সজনীকান্তের প্রস্তাব। কৈশোর ও প্রথম-যৌবনে যে-সব রচনা একবার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে দ্বিতীয়বার প্রকাশের পাত্তা পায় নি, কবি কর্তৃক নির্মমভাবে পরিত্যক্ত সেই সব গ্রন্থ তো থাকবেই, উপরন্তু থাকবে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ, গীতবিতানের সমস্ত গান এবং রবীন্দ্রনাথের বিপুল অনুবাদসাহিত্য।

ভালো-মন্দ নির্বিশেষে কবি যা-কিছু লিখেছেন সবই তাঁর রচনাসংগ্রহে সন্নিবিষ্ট হবে—এই প্রস্তাব শুধু সমীচীনই নয়, ইংরেজি সাহিত্যে সামগ্রিকতা রক্ষায় এই নীতিই অনুসৃত হয়ে থাকে। এমন কি অসমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত দু এক পঙ্‌ক্তি লেখাও এদিক দিয়ে দুর্মূল্য বলে বিবেচিত হয়। কেন না তার মধ্যে ক্বচিৎ-বিদ্যুদ্বিকাশের মত কবিমানসের দুর্জ্ঞেয় কিংবা অজ্ঞেয় কোন একটা রহস্য হঠাৎ ধরা পড়ে যায়।

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কী ছিল তা জানার কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'ভূমিকা'য় কবি লিখেছেন, "কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পারে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেইগুলিই কাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। * *

"আমার আয়ু এখন পরিণামের দিকে এসেছে। আমার মতে আমার শেষ কর্তব্য হচ্ছে, যে লেখাগুলিকে মনে করি সাহিত্যের লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে তাদের রক্ষা করে বাকিগুলোকে বর্জন করা। কেন না রসসৃষ্টির সত্য পরিচয়ের সেই একমাত্র উপায়। সব কিছুকে নির্বিচারে রাশীকৃত করলে সমগ্রকে চেনা যায় না। সাহিত্যরচয়িতারূপে আমার চিত্তের যে একটি চেহারা আছে সেইটেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যেতে পারলেই আমার সার্থকতা। অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।"

রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগকালে বিশ্বভারতী প্রকাশনী-বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে কবি যে কথা জানান প্রথম খণ্ডের 'নিবেদনে' তা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"ভূরিপরিমাণ যে সকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি আপনাদের

সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম-স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবী কালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না। আপনারা তর্ক করে থাকেন ইতিহাসের আবর্জনা দিয়ে যে গাধার টুপিটা বানানো হয় ইতিহাসের খাতিরে সেটা মহাকালের আসরে পরে আসতেই হবে। কবির তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের দেহে যে একটা লম্বমান প্রত্যঙ্গ ছিল সেটাকে সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, এ কথা মানবসন্তান মাত্রেই স্বীকার করে থাকে।"

কবির এই মনোভাব প্রথম খণ্ড রচনাবলী প্রকাশের সোয়া চার বৎসর পূর্বে রচিত 'অবর্জিত' কবিতায় [নবজাতক গ্রন্থে সংকলিত] পরিহাস-সরস ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি কবিকে রচনাবলীর সম্পাদক-মণ্ডলীর সঙ্গে একটা আপস-নিষ্পত্তি করতে হল। 'অচলিত' নাম দিয়ে কবির বাল্যকালের লেখা রচনাবলীতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা হল। কবির জীবদ্দশাতেই রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা কবি লিখে দিয়েছিলেন। তারই উপসংহারে তিনি বলছেন ঃ

"প্রকৃতির সৃষ্টিতে যা ত্যাজ্য, প্রবল তার সম্মার্জনী। মানুষের রচনার জন্যেও আছে সম্মার্জনী, সেটা ঝেঁটিয়ে ফিরিয়েও আনে। তার প্রভাব মানতেই হবে। প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছয় নি তারও মূল্য আছে হয়তো, ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে ; তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পাসপোর্ট পেয়ে থাকে।"

শুধু বাল্য কৈশোর ও প্রথম-যৌবনের প্রচলিত রচনা সম্পর্কেই নয়, অন্যান্য বিষয়েও যে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে পাওয়া যাবে। রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'নিবেদনে' চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, "বিভিন্ন সংস্করণে অনেক গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবি অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়াছেন। বর্তমানে যে পাঠ তাঁহার অনুমোদিত, এই রচনাবলীতে সেই পাঠই অনুসৃত হইল।"

সম্পাদক-মণ্ডলীর বৈঠকে সজনীকান্ত প্রস্তাব করলেন যে, রচনাবলী সংস্করণে বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদগুলিও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া প্রয়োজন।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পুলিনবিহারী সেনকে ২৩।১১।৩৯ তারিখে এক পত্রে লিখলেন :

"সজনীকান্তের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছি যে রাজা ও রানী ও বিসর্জনের পাঠান্তরগুলি দ্বিতীয় খণ্ডেরই পরিশিষ্ট ভাগে প্রকাশ করা কর্তব্য— নইলে তার উপযোগিতা ব্যর্থ হবে।"

এক সপ্তাহ পরে ৩০।১১।৩৯ তারিখে লেখা চিঠিতে সজনীকান্তকে কবি লিখছেন :

"রচনাবলী সম্বন্ধে সমস্যা তোমার দফতরে জমে উঠছে। তাই নিয়ে পত্রযোগে কথা চালাচালি আমার পক্ষে বড় দুঃসাধ্য। সেই কারণে একটা প্রস্তাব আমার মাথায় এসেছে। তোমরা ঠিক করেছিলে সময় বাঁচাবার জন্য হাওড়ায় যান পরিবর্তন করা যাবে। আমি মনে করি তা না করে রচনাবলী প্রভৃতি নানা পরামর্শ মোকাবিলায় ঐ সময়ে চুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দেহটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকা আমার পক্ষে হয়ত শ্রেয় হতে পারে।"

পত্রের এই অংশে হাওড়ায় যান পরিবর্তন সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে তা হল বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে শান্তিনিকেতন থেকে মেদিনীপুর যাওয়ার পথে হাওড়ায় গাড়ি বদলের কথা। সে প্রসঙ্গ পরে আসবে। রচনাবলীতে কবির গানগুলি কিভাবে স্থান পাবে, সে সম্পর্কে আলোচ্য পত্রেই কবি লিখছেন :

"গানগুলো কালানুক্রম অনুসরণ করে মাঝে মাঝে দিলেই তো ভাল হয়। সেটাও বেশী উপভোগ্য হবে। পাঠান্তরগুলো তৃতীয় খণ্ড থেকে মূল গ্রন্থের সঙ্গে রেখে ছাপালেই সঙ্গত হবে। এমন কি আমার মতে রাজা ও রানী ও বিসর্জনের বর্জিত অংশ তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়াই উচিত। তাদের দর্শন-প্রাপ্তির জন্যে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করা বিড়ম্বনা। ছোটখাট পাঠান্তর পাদটীকায় দিলে কি দোষ আছে? এই প্রণালীতেই পাঠকেরা যথার্থ উপকৃত হবে।"

দুঃখের বিষয়, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অভিমত প্রকাশকদের নিকট গ্রাহ্য হয় নি। রবীন্দ্রনাথের কোন রচনা-সংগ্রহই সম্পূর্ণ হতে পারে না যদি না তাতে তাঁর ইংরেজি লেখাও সমগ্রভাবে সংকলিত হয়। কবির ইচ্ছা ছিল তাঁর ইংরেজি লেখাগুলিও রচনাবলী সংস্করণে স্থান পায়। সজনীকান্তকে

৪।১।৪০ তারিখের চিঠিতে কবি লিখছেন : "চারুবাবুকে [চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য] একবার জিজ্ঞাসা কোরো আমার যে সব ইংরেজি রচনা ম্যাকমিলানের স্বত্ববহির্ভূত সেগুলোকে তোমাদের প্রকাশযজ্ঞে আহুতি দেওয়া চলবে কি না। বাঙালির রচনা বলেই সেগুলি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয় এমনতর জনশ্রুতি আছে।"

দুঃখের বিষয়, কবির এই ইচ্ছাও পূর্ণ হয় নি। রবীন্দ্র-রচনাবলী শতবার্ষিক সংস্করণেও ইংরেজি গ্রন্থগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। অথচ ইংরেজি লেখায় রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক কথা বলেছেন যা বাংলায় বলেন নি। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে বোঝবার পক্ষে তাঁর ইংরেজি রচনাবলীও অপরিহার্য।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ-রচনার কথাও অনিবার্যভাবেই আসে। সংস্কৃত ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা থেকে রবীন্দ্রনাথ যেসব কবিতাদি অনুবাদ করেছেন তার পরিমাণও নগণ্য নয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের এই বিপুলায়তন অনুবাদ-সাহিত্যের অনুপস্থিতিও বেদনাদায়ক।

অথচ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল তাঁর কৃত অনুবাদগুলিও রচনাবলীতে স্থান পায়। অনুবাদ সম্পর্কে এই প্রস্তাবটি আমিও কবির কাছে উপস্থাপিত করেছিলাম। আমার প্রস্তাবের উত্তরে কবি মংপু থেকে ৩০।৯।৩৯ তারিখে আমাকে লেখেন :

"আমার অনুবাদগুলি যদি প্রকাশযোগ্য মনে করো তাহলে কিশোরী-মোহনের যোগে চারুবাবুর কাছে এ প্রস্তাব করে দেখো। আমিও তাঁকে চিঠি লিখে দেব।..."

দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছাও বিশ্বভারতী পূরণ করেন নি।

চার

মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদঘাটন মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ সারস্বতকৃত্য বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যাসাগরের ভক্ত। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি নিজেকে [চারিত্রপূজা গ্রন্থের 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রবন্ধে] বিদ্যাসাগরের "অযোগ্য ভক্ত" বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বিদ্যাসাগরকে বলেছেন "অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ"। বস্তুত চারিত্র-পূজার বিদ্যাসাগরচরিত সম্পর্কে

লেখা প্রবন্ধ দুটি পড়লে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় বিদ্যাসাগরের "অজেয় পৌরুষ" ও "অক্ষয় মনুষ্যত্ব"কে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে শ্রদ্ধা করতেন তেমন শ্রদ্ধা আর কারও প্রতিই তাঁর ছিল না।

কবির সেই আদর্শ পুরুষের পুণ্য নামে উৎসর্গ-করা স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্যে যখন আমন্ত্রণ এল তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলাশাসক বিনয়রঞ্জন সেনই ছিলেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু কবির সম্মতি আদায়ের ভার ছিল সজনীকান্তের ওপর। সে কৃত্য তিনি পালন করলেন এবং মেদিনীপুর যাত্রার উদ্যোগ আয়োজনের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। এই দ্বারোদ্ঘাটন সভায় রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন। ভাষণটি যাতে যথাকালে মুদ্রণের জন্য উদ্যোক্তাদের হাতে পৌঁছয় তৎপ্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি যে পত্র লিখলেন, তার উত্তরে ৩০.১১.৩৯ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

"তোমার কাছ থেকে তাড়া পাবার বহু পূর্বেই অভিভাষণ শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।"

বস্তুত, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের চারিত্রধর্ম। চারুশীলন ও শুচিশীলনে তাঁর তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যথাকালে যথাকৃত্য পালনে তিনি নিত্যতৎপর ছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর (৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, শনিবার) সকালবেলা দশটার সময় মেদিনীপুর শহরে হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে কবিকর্তৃক বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানটি তৎকালীন বঙ্গ-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত কবি পূর্বদিন অর্থাৎ পনেরো ডিসেম্বর ভোরবেলা শান্তিনিকেতন থেকে রওনা হলেন। মেদিনীপুরে পৌঁছে তাঁর থাকা-খাওয়া কোথায় কিভাবে হবে সে-বিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থা তদারক করবার জন্যে কবির অন্তরঙ্গতর একান্তসচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে কয়েকদিন পূর্বেই মেদিনীপুর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কর্তাকে জানালেন যে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে জেলাশাসকের গৃহে। বিনয়রঞ্জনের সহধর্মিণী শ্রীমতী চিরপ্রভা সেন ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী। শ্রীমতী সেনের স্বাভাবিক আগ্রহাতিশয্যেই এই ব্যবস্থা হয়ে থাকবে। কিন্তু কবি তাতে বিব্রত বোধ করলেন। ৪।১২।৩৯ তারিখে তিনি শ্রীমতী সেনকে এক পত্রে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অসুবিধার কথা জানিয়ে লিখলেন :

· তোমাদের দূত সজনীকান্তের সঙ্গে এই কথা স্থির করেছি যে আমাকে একলা কোন বাড়িতে যেন রেখে দেওয়া হয়—আমার অভ্যেস সম্পূর্ণ নিরালায় থাকা—এখানেও আমি একখানা বাড়িতে একলা থাকি। সজনী তাই বলেছিলেন—আমাকে স্বতন্ত্র বাড়িতে স্থান দেবেন, তাতে আমার অনেকটা ক্লান্তি দূর হবে।..."

শ্রীমতী সেনকে এই চিঠি লিখেই কবি নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না, মেদিনীপুরের 'দূত' সজনীকান্তকে ৬।১২।৩৯ তারিখে লিখলেন :

"সুধাকান্তকে বাহন করে তুমি এখানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করবে কথা ছিল। সে সম্বন্ধে তোমাদের উভয় পক্ষের কাছ থেকে কোনো কথা পাওয়া গেল না। এদিকে কর্পোরেশন পথের মধ্যে থেকে আমাকে হরণ করে নেবেন রব উঠেছে, প্রস্তাবটার নিষ্পত্তি করবেন সুধাকান্ত তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে এই ছিল কথা, মন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো খবর পাই নি। এটা বিজনেসলাইক নয়। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের দর্শন দেবেন কিনা তারও কোনো আভাস পাই নি। চির (শ্রীমতী সেন) তাঁর বাড়িতে আমাকে অতিথিরূপে পেতে চান, আমি একটি সম্পূর্ণ নিরালা বাড়ির দাবি জানিয়েছি। তুমি তো সেই রকম আশ্বাস দিয়েছিলে। এখন কি ব্যবস্থা পরিবর্তনের আশঙ্কা আছে না কি। তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় সব কথা পরিষ্কার হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।..."

এই পত্রাংশে কর্পোরেশন কর্তৃক কবিকে "পথের মধ্যে থেকে হরণ করে" নেবার উল্লেখ রয়েছে। পনেরোই ডিসেম্বর কলিকাতা পৌরসভা কর্তৃক আয়োজিত "খাদ্য ও পুষ্টি" প্রদর্শনীর উন্মোচন-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কবি সে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন। ঠিক হল শান্তিনিকেতন থেকে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছবার পর হাওড়া থেকে মেদিনীপুরগামী ট্রেন ছাড়বার মাঝখানে যে সময় থাকবে সেই সময়ের মধ্যে কবি পৌর-প্রতিষ্ঠানের পৌরোহিত্য-কর্ম সম্পন্ন করে আসবেন।

কবিকে শান্তিনিকেতন থেকে মেদিনীপুর নিয়ে যাবার দায়িত্ব স্মৃতিমন্দিরের উদ্যোক্তারা সজনীকান্তের ওপর দিয়েছিলেন। সজনীকান্ত ১৩ই ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলেন। পনেরো তারিখ শান্তিনিকেতন থেকে রওনা হবার পর ট্রেনের একটি ঘটনা সজনীকান্তের অনবদ্য ভাষায় অপূর্বতা পেয়েছে। কবির বয়স তখন আটাত্তর পেরিয়ে উনআশি। সেই বয়সে তিনি ট্রেনযাত্রায় সহগামীদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা স্বহস্তে করছেন—এই

বর্ণনাটি শুধু ভোজ্যরসে নয় মানবিকতার রসেও স্বাদু। সজনীকান্ত লিখছেন :

"১৫ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে পূর্ব বন্দোবস্ত মত একটি ফার্স্ট ক্লাস বগি বোলপুর স্টেশনের সাইডিঙে হাজির করা হইল। বিপুল রাজকীয় সমারোহে সপারিষদ্ কবি তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন ; অনিলচন্দ্র, অমিয় চক্রবর্তী, কৃষ্ণ কৃপালনী প্রভৃতি আমরা কয়েকজন, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথের নিকট ঠেলিয়া দিয়া পাশের কামরায় গুলতানি করিতে করিতে চলিলাম। গুসকরায় কবির কক্ষে আমাদের ডাক পড়িল। দেখিলাম তিনি মহা উৎসাহে নানা ধরনের টিফিন কেরিয়ারের বাটি খুলিয়া সকলের প্রাতরাশের ব্যবস্থায় মাতিয়াছেন। পরোটা আলুর দম ও হালুয়া প্রধান উপকরণ। তিনি স্বয়ং প্রত্যেকের হাতে হাতে ভোজ্য বাঁটিয়া দিলেন। আমরা দুই-এক টুকরো পরোটা গলাধঃকরণ করিলে সকৌতুকে প্রশ্ন করিলেন, পরোটা কেমন লাগছে হে ? এইরূপ প্রশ্নের কারণ সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, মৃদুহাস্যের সহিত তিনি বলিলেন, ক্যাষ্টর অয়েলে ভাজা অথচ তোমরা কেউ ধরতেই পারলে না। অনিল ও আমি "মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে"র দল--ইহাতে মোটেই ভয় পাইলাম না। বরঞ্চ আর দুইখানা করিয়া পরোটা যাচিয়া লইয়া কবির আনন্দবিধান করিলাম। কিন্তু দেখিলাম পেলবদেহী অমিয় চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ কৃপালনী রীতিমত ভড়কাইয়াছেন।" [শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩৬২, পৃ° ৪৬৬]

শান্তিনিকেতন থেকে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছবার পর কলিকাতা পৌরসভার কর্তৃপক্ষ তৎকালীন মেয়র নিশীথ সেনের নেতৃত্বে কবিকে তাঁদের প্রদর্শনী উন্মোচন অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলেন। বিকেলের দিকে কলকাতা থেকে মেদিনীপুর তীর্থযাত্রীরা একে একে হাওড়ায় মিলিত হতে লাগলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য যদুনাথ সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর), নলিনীকান্ত সরকার, রামকমল সিংহ, পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শান্তি পাল প্রমুখ বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক সে তীর্থযাত্রায় কবির অনুগামী হয়েছিলেন। সজনীকান্ত তাঁর অভ্যস্ত সরসতার সঙ্গে লিখছেন : "পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী এই ফাঁকে কলকাতায় তাঁহার শুভাগমন প্রত্যাশায় মুলতুবি-রাখা কয়েকটি দৈনিক বিবাহের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যও করিয়া আসিলেন। মোটের উপর, এমন অপূর্ব জমায়েৎ আমাদের কালে কদাচিৎ

ঘটিতে দেখিয়াছি। রাজেন্দ্র-সঙ্গমে শুধু দীনেরাই নন, নবীন ও প্রবীণেরা সোল্লাস কোলাহলে তীর্থযাত্রায় চলিলেন।”

রাত দশটায় ট্রেন মেদিনীপুর স্টেশনে পৌঁছল। স্টেশনে এই শীতের রাত্রেও কবিকে দেখবার জন্যে স্বভাবতই বহু সহস্র লোকের সমাগম হয়েছিল। পরদিন দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবেও লোকে লোকারণ্য। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগের “জল পড়ে পাতা নড়ে”ই তাঁর জীবনে “আদিকবির প্রথম কবিতা।” নবজাগ্রত বাংলার সেই প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষাগুরুর উদ্দেশে তাঁর যোগ্যতম উত্তরসূরি সেদিন যে-ভাষায় তাঁর শেষ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন তা যেমন উদাত্তগম্ভীর তেমনি মর্মস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণে বললেন:

“...আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্তব্যপালনের সুযোগ ঘটাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের জন্মপ্রদেশে এই যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আমি তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করি। পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এই সঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ্য ঘটল যে, বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।...”

কবি আরও বললেন:

“আমি আয়ুর শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। এইটাই আমার শেষকৃত্য, শেষ উপহার, শেষ উৎসর্গ। মেদিনীপুর তীর্থরূপ নিয়ে আমাকে আহ্বান করছে এই পুণ্যক্ষেত্রে।...বঙ্গ-সাহিত্যের উদয়-শিখরে যে দীপ্তিমানের আবির্ভাব হয়েছিল, অস্তদিগন্তের প্রান্ত থেকে আমি প্রণাম প্রেরণ করছি তাঁর কাছে। যাবার সময় এইটাই আমার শেষ কাজ মনে করুন। ভবিষ্যতে আপনারা মনে করবেন, কবি শেষ কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য আপনাদের মাঝে এসে নিবেদন করে গেছেন—যিনি চিরকালের মত আমাদের দেশে গৌরবান্বিত—তাঁরই উদ্দেশে।...”

রবীন্দ্রনাথের এই পবিত্রকৃত্যের কথা স্মরণ করে সজনীকান্ত লিখেছেন,

"এই ঐতিহাসিক পূজা দর্শন করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলাম বলিয়াই নয়, সংঘটনকারীদের একজন ছিলাম বলিয়া আমি চিরদিন গৌরব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিব।" সজনীকান্তের এই আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গত হেতু নিশ্চয়ই ছিল।

পাঁচ

১৯৩৯ পেরিয়ে ১৯৪০ সন এল। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি পেলেন। চিঠিখানি ৪।১।৪০ তারিখে লেখা। কবি লিখছেন:

"নাৎনির অতলস্পর্শ শুভোদ্বাহকর্মণি কয়দিন হাবুডুবু খেয়েছি। স্থির করেছিলুম এবার নৈষ্কর্ম্য সাধন করব—কিন্তু শনৈশ্চরের দয়ামায়া নেই, নানাপ্রকার দাবীর উল্কাবর্ষণ চলছে। আজকাল আমার স্প্রিং-ভাঙা কলম নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, তবু কি এই পথেই অন্তিমকুতোর হলকর্ষণ চলবে, উত্তরগোষ্ঠের কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না?

"তোমার সময়মত একবার এসো, বানানের মন্ত্রণাসভা বসানো যাবে। রচনাবলী সম্বন্ধেও পরামর্শের প্রয়োজন থাকতে পারে। সুধাকান্ত জ্বরে শয্যাগত।

* * *

"মনোরমা সম্বন্ধেও কয়েক লাইন লিখে দিলুম ক্লান্ত অবকাশের 'সাবলীল' আলস্যভরে।"

নাৎনি অর্থাৎ নন্দিনী। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা। ডাকনাম পুপে। বম্বের অজিতসিং খাটাউ-এর সঙ্গে নন্দিনীর বিবাহ হয় ১৯৩৯-এর ৩০ ডিসেম্বর। বিপুল সমারোহ এবং আড়ম্বরের সঙ্গে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।

পত্রের শেষে 'মনোরমা' সম্বন্ধে যে কয়েক লাইন লেখার উল্লেখ আছে তা হল অমলা দেবী ছদ্ম-নামে লিখিত সজনীকান্তের বাল্য-বন্ধু, বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ললিতানন্দ গুপ্তের লেখা সম্বন্ধে কবির মতামত। কবির সমালোচনাটি 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল। অমলা দেবী নাম সত্ত্বেও লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন, এ লেখা কোনও নারীর হাত থেকে বেরোতেই পারে না। 'মনোরমা' পড়ে লেখকের লেখার অসাধারণ মুন্‌শীয়ানার প্রশংসা করে কবি বলেছিলেন "আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

কয়েকবার সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে এসেছি। সব দেশের সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তরই পরিচয় আছে, কিন্তু কোথাও বাপু, নারীর কলম দিয়ে এমন নিষ্ঠুর লেখা বেরতে দেখিনি।" সমালোচনায় তাই কবি 'লেখিকা' না বলে 'লেখক'ই বলেছিলেন।

রবীন্দ্র-রচনাবলী নিয়ে ঘনঘন পরামর্শ তখনও চলছে। ২।২।৪০ তারিখে সজনীকান্ত কবির নিকট থেকে এক জরুরি তলবপত্র পেলেন। তাতে কবি লিখছেন :

"কল্যাণীয়েষু,

আগামী রবিবারে পুলিন আসবেন রচনাবলী উপলক্ষ্যে। ঐ আলোচনা-ক্ষেত্রে তোমার উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। আমি একাকী অসহায়— আমাকে যদি সাহায্য না কর আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে। ইতি বৃহস্পতিবার

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

পুলিন অর্থাৎ পুলিনবিহারী সেন। তখন অসুস্থ কিশোরীমোহনের স্থলাভিষিক্ত। চিঠি পাওয়ার পরদিনই সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে কবি-সকাশে উপস্থিত হলেন। গুরুশিষ্যের সম্পর্ক কতটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে তা ওই ক্ষুদ্র চিঠিখানির সস্নেহ ভাষণের মধ্যেই ধরা পড়বে। সজনীকান্তের লেখনীও কবিপ্রণামে উচ্ছ্বসিত। মাস কয় পূর্বে [আশ্বিন ১৩৪৬] তিনি কবিগুরুর উদ্দেশে যে চতুর্দশপদীটি রচনা করেন তার শেষ পঙ্‌ক্তি-ষট্‌ক হল :

হে রবি, তোমার দীপ্তি উজলিল বিশ্বের আকাশ,
একাকী করিলে পূর্ণ পাঁচ কোটি নিঃস্বের ভাণ্ডার ;
তোমার সংগীত যেন মুমূর্ষুর জীবন-নিঃশ্বাস,
আনিল নিরাশ-প্রাণে জীবনের পূর্ণ অধিকার।
তোমারে প্রণাম করি, বাঙালীর হে রবীন্দ্রনাথ,
রহ চির-দীপ্তিমান, হোক চির-যামিনী প্রভাত।

ছয়

বোলপুর আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিজের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাসত্রের আর্থিক অনটন চিরদিন কবির উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। বিশ্বভারতী রূপে এই শিক্ষানিকেতন যতই দিনে দিনে পরিবর্ধমান হয়েছে ততই আশ্রমগুরুর

দুর্ভাবনার মাত্রাও বেড়ে চলেছে। বিশ্বভারতীর অর্থকষ্ট ঘোচাবার জন্যে কবিকে পরিণত বার্ধক্যেও নৃত্য-নাট্যের দল নিয়ে ভারতের বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও অভিনয়ের বিরাট বাহিনী নিয়ে কবিগুরুকে উত্তর-ভারতের বড় বড় শহরে যেতে হয়েছে। পাটনা এলাহাবাদ লাহোর হয়ে রবীন্দ্রনাথ অবশেষে দিল্লী পৌঁছলেন ১৯৩৬ সনের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে। কবি যেদিন দিল্লীতে পৌঁছেছিলেন, সেদিনই সন্ধ্যায় সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। গুরুদেব যে বিশ্বভারতীর শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করবার অসম্ভব চেষ্টা করছেন তা গান্ধীজির অজানা ছিল না। তিনি কবির হাতে ষাট হাজার টাকার একখানি চেক দিয়ে বলেন, কবির যে বয়স তাতে তাঁর পক্ষে এভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়ানো সমীচীন হবে না। সেই জন্যেই মহাত্মাজি এই টাকা সংগ্রহ করে দিলেন। তিনি আশা করেন এতে বিশ্বভারতীর ঋণ পরিশোধ হবে।

এই অপ্রত্যাশিত দান মহাত্মাজীর মারফত পেয়ে কবি যে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। অভিনয়ের দল নিয়ে অন্যান্য শহরে যাবার যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তা বাতিল করে দেওয়া হল। কেবল মিরাটে কবি-সংবর্ধনার বিশেষ আয়োজন হয়েছিল বলে সেখানে তাঁকে যেতে হয়েছিল।

এই ঘটনার চার বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক শেষবারের মত শান্তি-নিকেতনে আসেন ১৯৪০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। গুরুদেব এবং তাঁর শিক্ষানিকেতনের প্রতি গান্ধীজির শ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত। এখানে সে ইতিহাসের বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গান্ধীজি হরিজন আন্দোলনের সাফল্য কামনায় আত্মশুদ্ধির জন্য যখন অনশন করেছিলেন তখন গুরুদেব তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, এই পুণ্যব্রতে তিনিও তাঁর যথাসাধ্য করবেন। হরিজন-প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সে সময়কার বহু কবিতা তাঁর 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। গান্ধীজির জন্য উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে 'চণ্ডালিকা' নৃত্য-নাট্যের অভিনয় হল। গান্ধীজি প্রাণভরে সে নাটক দেখে পরিতৃপ্ত হলেন।

শান্তিনিকেতন পরিক্রমা শেষ করে নিজের আশ্রমে ফিরে গিয়ে সেবার গান্ধীজি বলেছিলেন, "The visit to Santiniketan was pilgrimage to me." রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিলেন তাঁর জীবদ্দশা শেষ হয়ে আসছে। মর্ত্যলীলা সংবরণের পূর্বে তিনি তাঁর বহু-সাধের শান্তিনিকেতন সম্পর্কে চিন্তামুক্ত হতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর খোলাখুলি

অনেক আলোচনা হল। কিন্তু তাতেও তৃপ্ত না হয়ে শান্তিনিকেতন থেকে গান্ধীজি যখন বিদায় গ্রহণ করছেন তখন গুরুদেব তাঁর হাতে নীরবে একখানি চিঠি তুলে দিলেন। এই সম্পর্কে টেণ্ডুলকরের গান্ধী-জীবনী 'মহাত্মা'-গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে, ২৩৯ পৃষ্ঠায় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাতে গান্ধীজি বলছেন :

"I saw that Gurudev was living for his dearest creation Visva-Bharati. He wants it to prosper and to feel sure of its future. He had a long talk about it with me but that was not enough for him, and so as we parted he put into my hands the following precious letter."

গুরুদেবের আবেগগর্ভ সেই 'মূল্যবান' পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হল—

"Dear Mahatmaji,

You have just had a bird's-eye view this morning of Visva-Bharati centre of activities. I do not know what estimate you have formed of its merit. You know that though this institution is national in its immediate aspect, it is international in its spirit, offering according to the best of its means India's hospitality of culture to the rest of the world. At one of its critical moments, you have saved it from an utter breakdown and helped it to its legs. We are ever thankful to you for this act of friendliness. And, now, before you take your leave of Santiniketan, I make my fervent appeal to you. Accept this institution under your protection, giving it an assurance of permanence if you consider it to be a national asset. Visva-Bharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure, and I hope it may claim special care from my countrymen for its preservation."

কলিকাতার পথে ট্রেনে গান্ধীজি কবির পত্রখানি পাঠ করেন এবং তখনই তার উত্তর লেখেন। তাতে গান্ধীজি তাঁর স্বভাবসুলভ ঈশ্বর-নির্ভরতার সুরে বলেছিলেন :

"Who am I to take this institution under my protection? It carries God's protection, because it is the creation of an earnest soul..."

শেষ বাক্যটি শুধু গান্ধীজিই বলতে পারতেন। তিনি নিজেও ছিলেন শিক্ষাগুরু। কাজেই আরেক সহযাত্রী শিক্ষাগুরুর পবিত্র ব্রত সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি মিতভাষণেও অনবদ্য। পত্রশেষে গান্ধীজি অবশ্য তাঁর প্রিয় গুরুদেবকে জানান যে, বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিষয়ে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করবেন। কলিকাতায় পৌঁছে কবির চিঠিখানি গান্ধীজি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে দেখান। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর মৌলানা সাহেব যখন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী তখন কবিগুরু-প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষানিকেতন একটি পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু সে ঘটনা রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের দশ বৎসর পরে সংঘটিত হয়েছিল।

জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-তীর্থের দুর্বহ আর্থিক বোঝার হাত থেকে মুক্তি পান নি। কবির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করে সজনীকান্তও বিশ্বভারতীর এই অর্থ-কৃচ্ছ্রতার কথা জানতে পারেন। এই সম্পর্কে তিনি লিখছেন :

"ঠিক এই সময়ে [জানুয়ারি ১৯৪০] বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কোন দিক দিয়া ঠেকা না দিলে খাড়া রাখাই মুশকিল হইতেছিল। অমিয় চক্রবর্তী তখন বেতনভোগী, তাঁহার বেতন যোগানও কঠিন হইয়াছিল। আমি ১০ই জানুয়ারি আবার শান্তিনিকেতন গেলে কবি আমাকে এই দুই বিষয়েই সচেতন করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, যদি যোগাযোগ ঘটাতে পার তোমাকে যে "অবচেতনার অবদান" ছবিটি এঁকে দিয়েছি তার উপর একটি কবিতা লিখে দেব। কলিকাতায় ফিরিয়া এই দুই বিষয়েই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কথা ছিল টাকার জন্য ঝাড়গ্রাম-রাজের নিকট এবং অমিয় চক্রবর্তীর জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দরবার করিব। ঝাড়গ্রামরাজকে ঠিক এই সময়ে ঝাড়গ্রামে বীরসিংহে ও মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষাব্যপদেশে একটু অতিরিক্ত রকম দোহন করা হইয়াছে; বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রকাশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে সদ্য দশ হাজার টাকা দিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা তখন সত্য সত্যই অনুকূল নয়। এখানে বিফল হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সফল হইলাম। ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় [পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল] তখন ইংরেজি বিভাগের কর্তা। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করেন। দেখিলাম তিনি নানা কারণে চক্রবর্তী মহাশয়ের পক্ষপাতী নহেন। তবু রবীন্দ্রনাথের দোহাই পাড়িয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে রাজী করাইলাম এবং সে কথা পত্রযোগে কবিকে জানাইলাম।

অর্ধেক সফলতার জন্য "অবচেতনার অবদান" দাবি করিলাম।" [শনিবারের চিঠি, চৈত্র, ১৩৬৫, পৃষ্ঠা ৪৬৮]। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

অবচেতনার অবদান সম্বন্ধে তোমাকে মুখে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম তার কোন আইনসঙ্গত দাম নেই। লেখনযোগে পাকা দলিলে দিতে পারি যদি এখানে ঝাড়গাঁর সংশ্রব লাভ করি। অতএব সেজন্যে সবুর করতে হবে। যদি ফসকে যায় তাহলে মন অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠবে, অবচেতনা যাবে অবচেতনায় তলিয়ে।

অমিয় ভাগলপুরে। আজ তাকে টেলিগ্রাফ করেছি আসতে, যথাসময়ের পূর্বেই যাতে যথোচিত উপায় করা হয় তার ব্যবস্থা করা যাবে, কিন্তু "বিজয়ায় সঞ্জয়" আশা করচিনে। আমাদের বোধ হচ্চে নৌকোডুবি হোলো, যদি হয় সেটা ইতিহাসে অভূতপূর্ব, ক্ষতিপূরণের ভার তোমাদেরই নিতে হবে। এটা যে দুঃশাসনের বস্ত্র হরণ, লজ্জা নিবারণ কে করবে? ইতি

২০।১।৪০ রবীন্দ্রনাথ"

এই চিঠি লেখার একমাস পরেই গান্ধীজি আসেন শান্তিনিকেতনে। তখন রবীন্দ্রনাথের মন নৌকোডুবির আশঙ্কায় মুহ্যমান। কবির সেই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে গান্ধীজির হাতে চুপি চুপি তুলে দেওয়া তাঁর গোপন চিঠিতে।

সাত

৪।১।৪০ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে স্নেহের সুরে ছদ্মভর্ৎসনার ভঙ্গিতে লিখেছিলেন, "শনৈশ্চরের দয়ামায়া নেই, নানাপ্রকার দাবীর উল্কাবর্ষণ চলছে।" বস্তুত সজনীকান্ত তখন নানা ভাবে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যগ্র হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি পদ গ্রহণে স্বীকৃতি দান করুন—এই ছিল সজনীকান্তের একটি নূতন আবদার। তখন পরিষদের সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তিনি অবসর গ্রহণ করছেন, ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির কর্মাধ্যক্ষ-মনোনয়ন-সভায় নূতন সভাপতির নাম প্রস্তাব করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ পরিষদের সূত্রপাত থেকে পরবর্তী কয়েক বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। কখনও সভাপতি হন নি। এবার সুযোগ পেয়ে সজনীকান্ত কবির সম্মতি

আদায়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন। কবির তৎকালীন স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে প্রস্তাবটি অসম্ভব জেনেও তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল:

"কল্যাণীয়েষু

ন খলু ন খলু বাণঃ
সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি কবিশরীরে—

তোমরা জান কোনো রকম পতিত্ব করবারই বয়স আমার নয়—দোহাই তোমাদের, এই ধূলো-ওড়ানো ঝোড়ো দেশে কোনো উচ্চ চূড়ায় আমাকে চড়িয়ে দিয়ে মজা দেখ না। সভাপতিত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত কুলীন সাহিত্যিক বাংলা দেশে অনেক আছে—সম্মার্জনী থেকে আরম্ভ করে বরমাল্য পর্যন্ত তাঁদের সহ্য করবার অভ্যাস আছে, আমি ভীরু, দেহে মনে আমি দুর্বল-যে কটা দিন বেঁচে আছি আমি শান্তি চাই।

আপাতত চললুম বাঁকুড়ায়—চাণ্ডীদাসিক চক্রবাত্যার কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে থাকব। ফিরে আসব চৌঠো [মার্চ, ১৯৪০] নাগাদ—তার পরে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রইল—

রবীন্দ্রনাথ"

"বাঁকুড়ায় চাণ্ডীদাসিক চক্রবাত্যা"র একটু পূর্বরঙ্গ আছে। বাঁকুড়ার সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানের জন্য কবির কাছে আমন্ত্রণ আসে। তখন সুধীন্দ্রকুমার হালদার বাঁকুড়ার জেলাশাসক। সুধীন্দ্রকুমার বিখ্যাত অধ্যাপক হীরালাল হালদারের পুত্র। তাঁর পত্নী উষা দেবী বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের কন্যা—কবির একান্ত স্নেহের পাত্রী। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে কবি বাঁকুড়া যেতে সম্মতি দান করেন। প্রথম যখন প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় তখন সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে ছিলেন। উদ্যোক্তাদের প্রার্থনা 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ-অনুরোধের দ্বারা সমর্থিত ছিল। তখন চণ্ডীদাসকে নিয়ে বীরভূমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে বাঁকুড়া। বীরভৌমিক সজনীকান্ত অনুমান করলেন, বাঁকুড়ায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়ে ছাতনাপন্থীরা তাঁর সমর্থন আদায়ের চক্রান্ত করছেন। সজনীকান্ত অন্তরঙ্গ অবসরে এ বিষয়ে কবিকে সচেতন করিয়ে দিলেন। তারই ইঙ্গিত রয়েছে "চণ্ডীদাসিক চক্রবাত্যা"র মধ্যে।

বাঁকুড়ায় সেবার কবির যাতায়াত খুবই আয়াসসাধ্য হয়েছিল। বোলপুর

থেকে ট্রেনযোগে খানা জংশনে পৌঁছে সেখান থেকে মোটরে করে রানীগঞ্জের পথে কবি যান বাঁকুড়ায়। পথে কবির দর্শনপ্রার্থী জনতার ভিড় হয়েছিল। রানীগঞ্জে জনতার চাপে মোটরগাড়ি ভাঙবার যোগাড় হয়েছিল। তিন দিন বাঁকুড়ায় থেকে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে কবি কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতন ফিরলেন। দেহমন খুবই ক্লান্ত। ৮ই মার্চ সজনীকান্তকে লিখছেন :

"বাঁকুড়ায় যে রকম খাটতে হয়েছিল এমন কোথাও হয়নি। মাঝে মাঝে আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে ভয়ের কারণ ঘটেছিল। কাউকে বলিনি, কর্তব্য করে গিয়েছি।..."

এই নীরব সহনশীলতা রবীন্দ্র-চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

আট

১৯৪০ সনের এপ্রিলের শেষভাগে বাংলাদেশ ও বাংলার বাইরের বহু সংবাদ-পত্রে বাংলা-ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের একটি মর্মান্তিক ক্ষোভের কথা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে সম্ভবত তাই হল কবির সর্বশেষ বাণী—সর্বশেষ আবেদন। সুতরাং ঘটনাটি ঐতিহাসিক।

কলিকাতার ফুটপাথে পুরনো বই সংগ্রহ করা সজনীকান্তের একটা বড় বাতিক ছিল। এই পথেই একদিন তাঁর হাতে "ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডকেশন, বেঙ্গলে"র ১৯০৬-৮ সনের ক্যালেণ্ডারটি ধরা দেয়। ক্যালেণ্ডারের পরিশিষ্ট ভাগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রশ্নপত্র মুদ্রিত ছিল। কয়েকটি বাংলা প্রশ্নপত্রের উপর লেখা রয়েছে "Paper set by Babu Rabindra Nath Tagore"—অর্থাৎ প্রশ্নপত্র করেছেন বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির কৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি দেখে সজনীকান্তের চিত্ত যুগপৎ কৌতূহলী ও বিস্ময়াবিষ্ট হল। তিনি প্রশ্নপত্রগুলি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন কবির কাছে। কবি তখন ১লা বৈশাখের (১৪ এপ্রিল) উৎসব সেরে কালিম্পঙের পথে কলিকাতায় এসে উঠেছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের বরানগরের বাড়িতে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইতিহাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সম্পর্কে সজনীকান্তের নানারকম কৌতূহলী জিজ্ঞাসার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-যুগের স্মৃতির ঝাঁপি খুলে সেদিন যে-সব কথা বলেছিলেন তাই বিভিন্ন দৈনিকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবির সঙ্গে সজনীকান্তের মূল সাক্ষাৎকারের বিবরণ ১৩৪৭ সালের বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। সজনীকান্তের 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে "কর্মী রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে তা সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অংশ কবি স্বয়ং দেখে দিয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "যাঁরা শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী আর শ্রীনিকেতনকে কবি-খেলোয়াড়ের শুধু দুদিনেরই খেলা ভেবে এবং প্রচার করে মনে মনে আশ্বাস লাভ করে থাকেন, তোমার এই আবিষ্কারে তাঁরা ব্যথিত হবেন। এগুলি প্রমাণ করবে যে, আমি হঠাৎ আকাশকুসুম রচনা করতে বসি নি, আজীবন এ নিয়ে ভেবেছি এবং ভাবনাকে সাধ্যমত কাজে খাটাবার চেষ্টাও করেছি। নিষ্ফলতার দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু ফাঁকি দেওয়ার সান্ত্বনা পাই নি।"

সেই ঐতিহাসিক দলিলটি এখানে সমগ্র-ভাবেই উদ্ধারযোগ্য।—

"দেশের জন্যে আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করে ছিল, ছন্দোবদ্ধ রূপেই শুধু তা প্রকাশ পায় নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্বস্ব খুব বেশী ছিল না; যতটুকু ছিল, ততটুকুই নিঃশেষে উজাড় করে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। সমধর্মী ব্যক্তির সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হয় নি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা করে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। শুধু সভা আর পরামর্শ—পরামর্শ আর কাজ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে ইতিহাস কেউ লিখে রাখে নি। আজ চেষ্টা করলেও তোমরা সে নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করতে পারবে না; টুকরো টুকরো খবর পাবে, কিন্তু আমাদের সেই নিরলস সাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস কোনও দিনই আর লোকচক্ষুর গোচরে আসবে না। আসবে না, তার বড় কারণ এই যে, আমারই স্বহস্তরচিত সেই বিপুল উদ্যমের খসড়া যাঁদের হাতে ছিল, রাজার প্রহরীর ভয়ে তাঁরা একদিন তা নিঃশেষে অগ্নিসাৎ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আমার অনেক দিনের অনেক ভাবনা সেই সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আমাদের কাজ ছিল কি? কি ছিল না, তাই ভাবি। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টি ছিল আমাদের। দেশীয় বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে

দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার পর্যন্ত সব কিছুরই পত্তন করেছিলাম। শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার-চেষ্টা তো ছিলই, পল্লীমঙ্গল, পল্লীগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তার, কুটিরশিল্প ও কলকারখানার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় দ্রব্য নির্মাণ—আমরা করি নি কি? জ্যোতিদাদা সর্বস্ব খুইয়ে জাহাজের খোল কিনে এই অকৃতজ্ঞ দেশের খেয়াপারের কাণ্ডারী হবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন। বিদেশীদের সঙ্গে পাল্লায় উৎসাহী দেশপ্রেমিকের তিলে তিলে সর্বস্ব ত্যাগের আত্মঘাতী মহিমার প্রতি বিন্দুমাত্র দরদী না হয়ে তারা খাবারের ঠোঙা হাতে মজা দেখেছে, একজনও কেউ এগিয়ে গিয়ে বলে নি, বহুত আচ্ছা, আমিও আছি। আমারই কি কম লাঞ্ছনা ঘটেছে! বিজ্ঞতার ভান করে দেশের কল্যাণের কাজে যিনি যে উপদেশ দিয়েছেন, সরল বিশ্বাসে আমি তাই পালন করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। তাঁদের কর্তব্য বক্তৃতা এবং উপদেশ পর্যন্ত গিয়েই সমাপ্ত হত, আমি গাঁটের কড়ি খরচ করে শেষ পর্যন্ত দেখতে চাইতাম। কুষ্টিয়ায় প্রতিষ্ঠিত আমার তাঁতের কারখানার ইতিহাস যদি কোন দিন জানতে পাও তো দেখতে পাবে, ওই তাঁতের সুতো ধরে আমি সর্বনাশের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতেও ইতস্তত করি নি। সুতো সরবরাহ করে যাঁরা আমাকে ঠকিয়েছিলেন, তাঁরা আমারই দেশের লোক; স্বদেশীয়ানাকে মূলধন করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ঠকাটাকে গ্রাহ্য করি নি, পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়েছি, একদিন সত্য একটা কিছু পাব এই আশায়। আলুর চাষ, গুটিপোকার চাষেও নামজাদা এক্সপার্টদের পরামর্শে কম লোকসান দিই নি। দুঃখ সেই লোকসানের জন্যে নয়; যাঁরা আমাকে এই সব কাজে নামিয়েছিলেন, তাঁদের অসাধুতা আমাকে সবচেয়ে আঘাত দিয়েছে। যাঁদের অভিজ্ঞতার মূল্য সরকারী তহবিল থেকে মাসে মাসে দেওয়া হত, কাজের বেলায় বারবার দেখলাম, তাঁদের অনভিজ্ঞতার যূপকাষ্ঠে সরল বিশ্বাসে বলি হয়েছি আমরাই। সরকারী খেতাব এবং বেতন তাঁরা যথানিয়মেই পেয়ে গেছেন। দেশের প্রতি আমাদের স্বতঃ-উৎসারিত প্রেমকেই তাঁরা অপমান করেছিলেন সেদিন।

এই আমাদের দেশ, এ দেশের কোন্ সফল কীর্তি আমরা আশা করতে পারি? আদুরে ছেলের মত আমরা আব্দারের ঠোঁট ফুলিয়ে ভাঙবার কাজেই আছি। গড়ার কাজ ধৈর্যের—পুরুষের। আমাদের দিয়ে তার কোনটা হল না। শুধু মেয়েলি নালিশ—ওরা দিলে না এই অধিকার; সুতরাং

কান্না শুরু কর, অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়। নিজেরা করব না, কাউকেও কিছু করতে দেব না।

একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখছি এই বাংলা দেশে, যে সব পুরুষ এখানে দেশনেতার সম্মান লাভ করেন, নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মত ঘর-ভাঙাভাঙির খেলাকেই তাঁরা উচ্চ রাজনীতি ব'লে ঘোষণা করেন। তাঁদের পুরুষত্বে এতটুকু বাধে না। এখানকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গড়ে তোলবার জন্যে দল বাঁধে না, দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে। এ জিনিসকেও ক্ষমা করা যেত, যদি না দেখতাম, পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি তার দংষ্ট্রা বের করে আছে।

এই সর্বনাশা প্রবৃত্তি দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠেছে বাংলা দেশে; বুদ্ধির অভাববশতঃ নয়, এর মধ্যে দুর্বুদ্ধি আছে, আছে শয়তানী। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অসাধুতা তার জয়পতাকা তুলছে; স্বার্থবুদ্ধি এবং স্বেচ্ছাচার সকল কল্যাণকে করছে বিনষ্ট। অভিভাবকদের অন্নে পুষ্ট দায়িত্বহীন ছাত্রদের নীতি-অমান্যের সহজ প্রবৃত্তিকে স্বাধীনতার দাবি বলে ঘোষণা করে তাদের ক্ষেপিয়ে অপরের সংকীর্তি যারা ধ্বংস করতে চায়, তারা নামে এবং মহিমায় যেই হোক, আসলে দেশের প্রবল শত্রু। আজকের দিনে তারাই প্রবল হয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আমাদের বাঁচবার কোনও পথ নেই।

দেখ, আমার এই দীর্ঘজীবনের জন্যে এখন প্রায়ই মনে ধিক্কার জাগে। মনে এ আশাও নেই যে, কোন দিন এই ভাঙনের মধ্যে থেকেই সৃজনের দেবতার কাজ শুরু হবে। এখানে হবে না। মিথ্যার জঞ্জালস্তূপ ভেদ করে সত্যের অঙ্কুর উদ্গত হতে পারে না।

অথচ দেখ, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় যাঁরা আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, কত অসুবিধার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। তখন সেখানকার লোকের নৈতিক সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থা আমাদের চাইতেও হেয় ছিল। যে দুর্ভাগ্যের স্তরে তারা পৌঁছেছিল, আমরা তার কল্পনা করতে পারব না। কিন্তু জননায়করা মিথ্যার কারবার করেন নি বলে সেই ভয়াবহ পঙ্ককুণ্ড থেকে সমগ্র জাতিকে টেনে তুলতে বড় বেশী সময় লাগে নি। আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম, তখন এই বিপ্লবের বয়স দশ বছরও হয় নি। দেখলাম দেশের চেহারা বদলে গেছে, সাইবেরিয়ার নরক-স্নান সেরে নতুন স্বর্গ রচনায় তাদের সে কি উৎসাহ! যার যা সম্পদ—মানসিক অথবা দৈহিক, সে তাই খাটাচ্ছে

তার পাশের লোককে উন্নত করার কাজে। সর্বনাশা স্বার্থবুদ্ধি তাদের আত্মকেন্দ্রিক করে নি বলেই রাতারাতি দেশটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে কি বিপুল জাগরণ। এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার— শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের কাজ পাশাপাশি অগ্রসর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত। এই lateral movement সম্ভব হয়েছিল—যাঁরা এদের নেতৃত্ব করেছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের সত্যনিষ্ঠার জোরে। বাঙালীর মত মিথ্যাচারকেই তাঁরা আঁকড়ে পড়ে থাকেন নি।

বাঙালীও সুযোগ পেয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম তার পরিচয়; সে যুগের বাঙালীরা এই পরিচয়কে কাজে লাগিয়েছিল, ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশকে পিছনে ফেলে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙালী চলেছিল এগিয়ে। এই সাধনার পুরস্কার সে লাভ করেছিল তার শিল্প ও সাহিত্যের ফসলে। কিন্তু জাতিগঠনের কাজ তার একটুও এগোয় নি। কারণ, শিল্প ও সাহিত্য ব্যক্তির কাজ, একের কাজ, খোশখেয়ালের খুশিতে নিভৃত রাত্রির অবসরে তার সাধনা। কিন্তু জাতি গড়ার কাজ একলার নয়। এ কাজে মিলতে হবে সকলকে। এই মিলতে বাঙালী পারল না। দল বেঁধে দলাদলি করে গড়ে তোলার সব কিছু সম্ভাবনাকে সে ভেঙে ভেঙে চলেছে। আজ সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার এই অস্বাস্থ্য বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। সমস্ত ভারতবর্ষের গ্লানির কেন্দ্র আজ এই বাংলা দেশ। অথচ বাঙালীর আর্ত নালিশ অহরহ শোনা যাচ্ছে,—হিংসায় ও ঈর্ষায় তাকে নাকি চেপে মারছে অন্যান্য প্রদেশের সম্মিলিত চেষ্টা, বাঙালীর ভাল আজ কেউ দেখতে পারে না। এর চেয়ে মিথ্যে নালিশ আর কিছু হতে পারে না। বাঙালী যেখানে যতটুকু কৃতিত্ব দেখিয়েছে এবং আজও দেখাচ্ছে, অবাঙালীরা তা স্বীকার করে নিতে এতটুকু কার্পণ্য করে নি বা করে না। চোখ মেলে চাইলেই এর হাজার দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে। সামনেই একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে। আজ আমি যেখানে অতিথি হয়ে রয়েছি, আমার বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ক্ষেত্রেই দেখছি, দীর্ঘদিনের সাধনায় স্ট্যাটিস্‌টিক্সের কাজে যে দক্ষতা তিনি অর্জন করেছেন, তারই জোরে প্রতিদিন অজস্র সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন; তিনি বাঙালী ব'লে অবাঙালীরা তাঁর প্রাপ্য দিতে কার্পণ্য করছেন না। নিঃসঙ্কোচে সকলে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করছেন। বাঙালী-বিরোধের কথা সত্য হ'লে এমনটি সম্ভব হ'ত না।

ধ্বংস করবার কাজে কোন কৃতিত্বের প্রয়োজন নেই, বাঙালী আজ এতেই

পটু হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ চালাবে অথচ শৃঙ্খলা মানবে না, পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত সমরায়োজন আর কুত্রাপি দেখা যায় নি। বাঙালীর যুদ্ধ বাইরের কোনও শত্রুর সঙ্গে নয়, পরস্পর নিজের সঙ্গে। পরকে উপলক্ষ ক'রে ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে এরা অবিরত শান দিচ্ছে ছুরিতে; সে ছুরিও কোন ধাতুর তৈরি নয়—কুৎসা এবং কাদা দিয়ে তৈরি তার অস্ত্র। বড়কে, বৃহৎকে, নমস্যকে, মানব না, পরস্পরের কাঁধে চ'ড়ে তার ওপর কাদা ছুঁড়বে—এই মনোবৃত্তি থেকে কোনও কল্যাণ আসতে পারে না।

আমরা সব রকম চেষ্টা করেই দেখেছি। আমি নিজে হাতে-কলমে কাজ করেছি। ভাববিলাসীর স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ এ নয়। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে যে নূতন চেতনা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাকে কাজে লাগাবার জন্যে আমরা কজনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কর্মসাগরে। সব দিকে গোড়া বেঁধে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। আমরা আস্ফালন করি নি, কাজ করেছিলাম। আমাদের বাড়ির দোতলার বারান্দায় অনাহূতভাবে উচ্চ নীচ কতরকমের লোক যে এসে জুটতেন—তাঁদের সকলকে আমরা চিনতামও না। পথ খুঁজে বের করার সে কি ব্যাকুলতা! দেহচর্চার আখড়া হ'ল, দেশীয় শিল্প-প্রদর্শনী হ'ল; আগেই বলেছি, স্বায়ত্তশাসনের খসড়া পর্যন্ত আমি নিজের হাতে প্রস্তুত করেছিলাম। সেটা যদি পাওয়া যেত তো দেখতে পেতে, আজকের দিনে যে যে বিষয় নিয়ে আমাদের সমস্যা জাগছে, তার প্রত্যেকটির সমাধান চেষ্টা তার মধ্যে ছিল। নিজেরা পথে পথে বের হয়ে প্রচার করতাম। দেশও আশ্চর্য রকম সাড়া দিয়েছিল সেদিন। ন্যাশনাল ফাণ্ড গ'ড়ে তোলবার জন্য যে মুহূর্তে আমরা জনসাধারণের কাছে আবেদন করলাম, সেই মুহূর্তেই তারা দলে দলে এসে উপযাচক হয়ে আমাদের থলি ভর্তি ক'রে দিয়ে গেল। দেবার জন্যে এই ঠেলাঠেলি—সেদিন বাঙালীর মধ্যে এরও অপূর্ব মূর্তি দেখেছি; টাকা-আনা-পাইয়ের থলিতে গোপনে হাজার টাকার নোট এসেও পড়েছে। এই গেল এক দিক, অন্য দিকে চলেছিল আমাদের মিলনের সাধনা। যাকে পেতাম, তারই হাতে বাঁধতাম রাখি। সরকারী পুলিস এবং কনেস্টবলদেরও বাদ দিতাম না। মনে পড়ে, একবার একজন কনেস্টবল হাতজোড় ক'রে বলেছিল, মাফ করবেন হুজুর, আমি মুসলমান। সরকারের চরেরা ওত পেতে থাকত আনাচে-কানাচে, নির্যাতনলাভও অনেকের ভাগ্যে ঘটেছে। আমরা দমি নি, কারণ আমাদের আদর্শ ছিল বড়। এই সময়ে আমার সর্বাপেক্ষা বড় সহায় ছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই।

তাঁর সঙ্গে সব বিষয়েই আমার মতের মিল ছিল না। কিন্তু অকারণ বিদ্বেষবুদ্ধি কখনও আমাদের হৃদ্যতার সম্পর্কে ছেদ ঘটাতে পারে নি। এমন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি আমি আর দ্বিতীয় দেখি নি। আরও ছিলেন অনেকে; শিল্প সাহিত্য সমাজ রাষ্ট্র—একসঙ্গে চতুর্দিকে আমাদের জয়রথ ছুটিয়েছিলাম।

তারপর, একটা কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা যেমনই ঘটল, অমনই শুরু হল স্বার্থের সংঘাত। উচ্চতর আদর্শকে ঠেলে ফেলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বাঙালীর স্বভাব। অপঘাত ঘটতে বিলম্ব হল না। সেই মহৎ আদর্শকে আমরা আর ফিরে পাই নি। স্বার্থের পাঁকেই পড়াগড়ি দিয়ে মাতামাতি করেছি। সমগ্র দেশের সম্মিলিত চেষ্টায় যে কল্যাণ একবার চকিতে দেখা দিয়েছিল, মাটির অন্ধকারে কোথায় যে তা তলিয়ে গেল, আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় গেল সেই জাতীয় সমবায় ভাণ্ডার, কোথায় গেল স্বদেশের কল্যাণে উদ্যত সমবেত শক্তি!—সেই প্রচণ্ড স্বার্থবুদ্ধির সংঘাতে সে প্রশ্ন তোলবারও অবকাশ রইল না বাঙালীর।

এই আমাদের ললাটলিপি। নইলে সেদিন যে সুযোগ বাঙালী পেয়েছিল, তেমন সুযোগ জাতির জীবনে ক্বচিৎ আসে। না আসুক, কিন্তু সেদিনের শিক্ষা কি আমাদের কোনও কাছে লেগেছে? যে খোকামি প্রশ্রয় পেয়ে আজ বাংলা দেশের কপিধ্বজ রথের চূড়ায় চ'ড়ে বসেছে, সেই খোকামির স্বরূপ চেনবার শক্তি বাঙালীর এতদিনে অর্জন করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। বাংলা দেশের আধুনিক পলিটিক্স সেই নিষ্ফলতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দেখ, আমার দেহ আজ অপটু, কিন্তু মন ছুটে চলেছে সেই পুরাতন কল্যাণের আদর্শ ধ'রে। ইচ্ছে করছে, আবার সকলের সঙ্গে মিলে কাজে লেগে যাই। তা আর সম্ভব হবে না। এই অক্ষমতার বেদনা নিয়েই আমাকে যেতে হবে। যদি পার, আমাদের সেদিনের সেই বিলুপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করবার চেষ্টা কর। এই পুরাতন প্রশ্নপত্রগুলির মধ্যে সেই ইতিহাসেরই একটা ক্ষীণ সূত্র দেখতে পাচ্ছি। এর প্রয়োজন আজও মেটে নি। এগুলি প্রকাশ করতে পার।"

নয়

রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে যে "অবচেতনার অবদান" ছবিটি এঁকে দিয়েছিলেন তার উপর একটি কবিতাও লিখে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ছিল শর্তসাপেক্ষ। দুটি শর্ত ছিল। একটি অমিয় চক্রবর্তী হাতে কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে গৃহীত হন তার জন্যে তদবির করা। অন্যটি বিশ্বভারতীর জন্য ঝাড়গ্রামরাজের অর্থানুকূল্য সংগ্রহ করা। সজনীকান্ত দুটি শর্তের প্রথমটি পূরণ করে কবির কাছে কবিতাটি দাবি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে [২০।১।৪০] লিখেছিলেন, "অবচেতনার অবদান সম্বন্ধে তোমাকে মুখে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম তার কোনো আইনসঙ্গত দাম নেই। লেখনযোগে পাকা দলিলে দিতে পারি যদি এখানে ঝাড়গাঁর সংস্রব লাভ করি।"

এই চিঠি লেখার চারমাস পরে কবি কালিম্পং থেকে নিঃশর্ত ভাবেই "অবচেতনার অবদানে"র উপর তাঁর প্রতিশ্রুত ছড়াটি লিখে পাঠালেন। ছড়াটি কালিম্পঙে ১৫ মে, ১৯৪০-এ লেখা। 'ছড়া' গ্রন্থের প্রথম কবিতা হিসাবে ছড়াটি প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত কবিপ্রেরিত এই কবিতাটি দুর্লভ রত্নের মত নিজের সারস্বত-মঞ্জুষায় সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ১৩৪৮ সালের ভাদ্রের 'শনিবারের চিঠি'তে কবির হাতের লেখার প্রতিলিপিতে মুদ্রিত হয়। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত কবিতাটি এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধারযোগ্য।

ছড়া

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
মনিব মিঞা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য।
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগডুগি,
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট জল ওঠে বুগ্‌বুগি।

রামছাগলের মোটা গলায় ভ্যাভ্যা রবের ডাকে,
সুড়্‌সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে
বাতাস জুড়ে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে।
দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া
আঁতকে উঠে কাঁখের থেকে বউ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।

হাঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথ্যে—
এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধাঁধা। রাগল অপর পক্ষে ;
বললে, 'ফিজিক্‌স্ পড়ে কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয়, বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্ সে।'
এই নিয়ে দুই দলে মিলে ইটপাটকেল ছোঁড়া—
হায়রে কারও ভাঙল কপাল, কেউবা হল খোঁড়া।
গোলদিঘি লালদিঘি জুড়ে বীরপুরুষের বড়াই—
সমুদ্দুরের এ পারেতে এরেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুদূতের চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা আজগুবি হোক—আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
ছেলেরা সব হাততালি দেয়, বাজে রে ডুগ্‌ডুগি—
গভীর জলে কাৎলা খেলায়, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।

'শনিবারের চিঠি'র এই কবিতাটির সঙ্গে 'ছড়া' গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাটির কিছু কিছু অমিল আছে। তৃতীয় চরণের 'মনিব মিঞা' গ্রন্থে হয়েছে 'বাঁদরওয়ালা'। সতেরো-আঠারো পঙ্‌ক্তি হয়েছে—

অল্প কিছু লাগল ধোঁকা ; রাগল অপর পক্ষে—
বললে, পড়াশুনোয় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।

তেইশ পঙ্‌ক্তির 'গোলদিঘি লালদিঘি জুড়ে বীরপুরুষের বড়াই' হয়েছে 'পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই'। পঁচিশ পঙ্‌ক্তির 'সিন্ধুপারে মৃত্যুদূতে' হয়েছে 'সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে'। তা ছাড়া দশম পঙ্‌ক্তির পরে নতুন চার পঙ্‌ক্তি যুক্ত হয়েছে—

হাঁচির পরে সারি সারি হাঁচি নামার চোটে
তেঁতুল বনে ঝড়ের দমক যেন মাথা কোটে,
গাছের থেকে ইঁচড়গুলো খসে খসে পড়ে,
তালের পাতা ডাইনে বাঁয়ে পাখার মতো নড়ে।

চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির পরে [হরিমোহন সেন] দশ পঙ্‌ক্তি নতুন সংযোজিত হয়েছে—

টেবিলেতে তুফান ওঠে চা-পেয়ালার তলে,
বিষম লেগে শৌখিনদের চোখ ভেসে যায় জলে।
বিদ্যালয়ের মঞ্চ-'পরে টাক-পড়া শির টলে—
পিঠ পেতে দেয়, চড়ে বসে টেরিকাটার দলে।
গুঁতো মেরে চালায় তারে, সেলাম করে আদায়,
একটু এদিক-ওদিক হলে বিষম দাঙ্গা বাধায়।
লোকে বলে, কলঙ্কদল সূর্যলোকের আলো
দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো।
তাই তো সবাই উলট-পালট, উপর-নামন নীচে—
ভয়ে ভয়ে নীচু মাথায় সম্মুখটা যায় পিছে।

মূল কবিতাটির সঙ্গে এই নূতন চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির সযত্ন সংযোজন দেখে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, এর মধ্যে ব্যঙ্গচ্ছলে কবির একটি নিগূঢ় বক্তব্য আছে। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন, ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করা কঠিন হলেও ওতে 'সমসাময়িক দেশীয় রাজনীতির উপর কটাক্ষ' এসে পড়েছে বলে মনে হয়। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধ নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে যে হট্টগোল উঠেছিল এই ছড়ায় তারও ছায়া পড়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে "অবচেতনার অবদান' বলে যে রেখাচিত্র দিয়েছিলেন তা কিন্তু বহু পূর্বে, ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্রকৃত অন্য একটি ছড়ার সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল। এই কৌতুক-চিত্রটি অঙ্কিত হয় ১১।১১।৩৯ তারিখে। তাতে রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি" এই মন্তব্যটি লিখে দিয়েছিলেন। তার নীচে "অবচেতনার অবদান" নামে যে ছড়াটি প্রকাশিত হয় তা হল 'ছড়া' গ্রন্থের সপ্তম কবিতা। তার প্রথম আট পঙ্‌ক্তি হল :

গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর,
লেজখানা যায় ছিঁড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
ফুটছে নতুন চিঁড়ে।

ছড়াটির মুখবন্ধ হিসাবে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি বাক্য 'শনিবারের চিঠি'তে কবি লিখে দিয়েছিলেন :

"অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছু বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।"

বলাই বাহুল্য এই মন্তব্যটি আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা ও অর্থহীনতার প্রতি কবির বক্রকটাক্ষ। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে সজনীকান্তের যে অভিযোগ ছিল তার আংশিক সমর্থনই এখানে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া' ও 'একমুঠো' নামে দু খানি কাব্যগ্রন্থের যে সমালোচনা কবি ১৩৪৬-এর চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেন, তাতেও তিনি কাব্যে অবচেতন চিত্তের অবলীলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই নিবন্ধটি 'নবযুগের কাব্য' নামে 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাতে কবি বলছেন, "এখনকার কবিতা অবচেতন তত্ত্বে-পাওয়া কবিতা। অবচেতন মনের লীলা খাপছাড়া অসংলগ্ন। অর্থের সংগতি ঘটায় যে-মন সে সেখানে অনেকখানি ছুটি নিয়েছে।"

দশ

আধুনিক কবিতার আর একটি লক্ষণ হল রবীন্দ্র-বিরোধিতা। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সদম্ভ বিদ্রোহ ঘোষণাই ছিল কল্লোল-যুগের তরুণ কবিগণের একটি উল্লেখযোগ্য বিলাস। কল্লোল প্রকাশের ষোল বৎসর পরে ১৯৪০ সনে বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামে যে বাংলা কবিতার প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয় তার প্রথম সংস্করণে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েরও একটি 'ভূমিকা' ছিল। তাতে লেখকযুগল বলেছেন, "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।" রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এই সচেতন বিদ্রোহই কাব্যে আধুনিকতার মুখ্য লক্ষণ বলে গৃহীত হওয়ায় কেউ কেউ এই যুগের নামকরণ করেছেন রবীন্দ্রোত্তর যুগ।

বিভিন্ন সমালোচকের মুখে এই রবীন্দ্রোত্তর যুগের নান্দীপাঠ শুনে রবীন্দ্র-

নাথ খুব প্রীত হয়েছিলেন বলে মনে করবার কোনও কারণ নেই। 'পরিচয়' পত্রিকার নবম বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংখ্যায় অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এবং আধুনিক সাহিত্য" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ মহল এই প্রবন্ধপাঠে ক্ষুণ্ণ হবেন বলাই বাহুল্য। এই প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ লিখেছিলেন কবির অন্যতর একান্ত-সচিব সুধাকান্ত রায় চৌধুরী। সুধাকান্ত প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দেন 'শনিবারের চিঠি'তে। এই সংবাদ শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে লেখেন :

"ওঁ

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

সজনী, প্রতিশ্রুত ছিলাম তোমাকে একটা ছড়া দেব, সেটা রক্ষা করলুম।... শুনছি সুধাকান্ত ধূর্জটির মুখরতার বিরুদ্ধে তোমাকে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছে। এ নিয়ে আমার মনে দ্বিধা আছে। যদিও তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছি তবু লোকে বলবে আমি এই রচনার "পৃষ্ঠপোষক" এবং এই সূত্রে শনিগ্রহের সঙ্গে রবিগ্রহের দেনাপাওনা চলছে। তোমাদের সকলের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ নিষ্কাম হয় এই আমার কামনা। তুমি ভেবে দেখো, এবং যেখানে আমার কোনো সমর্থন আছে সেটা বর্জন করো। ধূর্জটির লেখায় আমার একমাত্র বিরক্তির কারণ...তার ইস্কুল মাস্টারি মুরুব্বিয়ানা।...কিন্তু রুচির ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা সহ্য করতেই হয়। যাই হোক আমাকে শান্তিতে থাকতে সাহায্য কোরো—বয়েস হয়ে গেছে। ইতি। ১৮।৫।৪০

রবীন্দ্রনাথ"

এই পত্রের প্রথম বাক্যটির বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। প্রেরিত ছড়াটিই হল "সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে"। ধূর্জটিপ্রসাদের প্রবন্ধ সম্পর্কে সুধাকান্তের প্রতিবাদ 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপা হতে দিতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কারণ অস্পষ্ট নয়। প্রথমতঃ লোকে মনে করবে, কবি নিজেই এর "পৃষ্ঠপোষক", দ্বিতীয়তঃ "এই সূত্রে শনিগ্রহের সঙ্গে রবিগ্রহের দেনাপাওনা চলছে" বলে আধুনিকদের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের "দ্বিধা"র কথা পত্রে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ধূর্জটি-প্রসাদের বক্তব্য যে তাঁর সমর্থন পায় নি, বরং ক্ষোভেরই কারণ হয়েছে, তার আভাসও রয়েছে পত্রখানিতে। "ধূর্জটির মুখরতা" এবং "তার ইস্কুল মাস্টারি

মুরুব্বিয়ানা”—এই দুটি মন্তব্য স্বভাব-সংযত-বাক্ রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে কম দুঃখে উচ্চারিত হয় নি।

তা ছাড়া প্রতিবাদ-প্রবন্ধটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করতে কবি সরাসরি আপত্তি করেন নি। বলেছেন, “যেখানে আমার কোনো সমর্থন আছে সেটা বর্জন কোরো।” সজনীকান্ত কবির এই দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলতার অর্থ ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নির্বিচারে প্রবন্ধটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করলেন। ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠের “প্রসঙ্গ কথা”য় সুধাকান্তের নামেই লেখাটি মুদ্রিত হল। সজনীকান্ত কবির পত্রের কোন উত্তরও দিলেন না। সম্পাদকীয় কর্তব্য নীরবে সম্পন্ন করে চুপ করেই রইলেন।

তা ছাড়া তখন সজনীকান্ত সরস্বতী পূজার বারোয়ারি পুরোহিতে পরিণত হয়েছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির সভা-সম্মেলনে পৌরোহিত্যের বায়না নিয়ে সারা বাংলাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন। দুর্দমনীয় ডায়বেটিসে শরীর জীর্ণ ও অবসন্ন। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি চিরদিনই ছিলেন বেপরোয়া। কাজেই অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং আহারাদি সম্পর্কে লোভজনিত অনিয়মে স্বাস্থ্য রীতিমত ভেঙে পড়ল। জ্যৈষ্ঠের 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশের দিন-কয় পরে ক্লান্ত পৌরোহিত্যের ফাঁকে পয়লা জুন কালিম্পঙের ঠিকানায় চিঠি লিখলেন কবিগুরুকে। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল :

“ॐ

কল্যাণীয়েষু

দীর্ঘকাল তোমার কাছ থেকে চিঠির উত্তর না পেয়ে উদ্বিগ্ন ছিলুম। উত্তর পেয়ে যে উদ্বেগ কমল তা বলতে পারিনে। মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে বাংলা-দেশের জেলায় জেলায় তুমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলে। নিজের প্রতি এই অত্যাচার কী করে তোমার দ্বারা সম্ভব হোলো ভেবে পাইনে। চুপ করে থাক এখন কিছুদিন, এডিটরি রাজদণ্ড দাও আর কারও হাতে। আমার চিঠির উত্তর দিতে হয় দিয়ো মনে মনে। সাব-এডিটরকে বলে দিয়ো রবীন্দ্র-নাথ সম্বন্ধে সহৃজ্জনের কোনো লেখা ছাপিয়ে বঙ্গ-সাহিত্য-সরোবরের তলার পাঁক ঘুলিয়ে দিয়ে ভারতীর পদ্মাসন যেন ডুবিয়ে না দেয়। শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর এই কামনা করি। ইতি ৩।৬।৪০।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ”

সজনীকান্তের শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের

যে আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্নেহের কোমল স্পর্শ রয়েছে অনেকখানি। "নিজের প্রতি অত্যাচার কী করে তোমার দ্বারা সম্ভব হোলো ভেবে পাইনে। চুপ করে থাক এখন কিছুদিন, এডিটরি রাজদণ্ড দাও আর কারও হাতে।"—এই বাক্যে কবির শাসনবাণী বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত।

এগারো

অন্তরঙ্গজনের অসুখ-বিসুখে রবীন্দ্রনাথ নীরব সাক্ষী হয়ে চুপ করে থাকতে পারতেন না। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বায়োকেমিক ঔষধ ব্যবহারে তাঁর বিশ্বাস যেমন ছিল গভীর, দক্ষতাও তেমনি ছিল অসাধারণ। শেষ বয়সে বায়োকেমিক ঔষধের ঝুড়ি ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন, সেবার চতুর্থবার [১৯৪০-এর ২১শে এপ্রিল] যখন কবি মংপুতে পৌঁছলেন, তখন ট্রেনের একটি ছোট্ট কামরায় প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে দেখা গেল "চারিদিকে জিনিষপত্র ছড়িয়ে বসে আছেন। কতকগুলো কাপড়ের ব্যাগ ছড়ান, তার কোনোটাতে কাগজপত্র, কোনোটাতে স্নানের সরঞ্জাম, একটা ঝুড়িতে কতকগুলি বায়োকেমিক ওষুধের শিশি।" [সং ১৩৬৪, পৃ° ২২১।]

অন্যের অসুখ-বিসুখে সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকতেন কবি। সেবাযত্নে ও চিকিৎসায় অসুস্থ প্রিয়জনের কষ্ট লাঘব করার জন্যে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ঘটত না। কিন্তু নিজের অসুস্থতায়, এমন কি পরিণত বার্ধক্যেও অন্যের সেবা গ্রহণে তাঁর ছিল সহজাত কুণ্ঠা। এই সম্পর্কে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :

"কারও কাছ থেকে সেবা নিতে চাইতেন না, শত প্রয়োজন হলেও, ডাকাডাকি করতেন না। ইদানীং শরীর স্থবির হয়ে পড়ছিল, স্নান করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, কিন্তু চাকরের দ্বারা স্নাত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। শত কষ্ট হ'লেও নিজেই করতেন। তাঁর গায়ের চামড়া এত সুকুমার ছিল যে কর্কশ হাতের স্পর্শ সহ্য করতে পারতেন না। কাজেই যে-সে পায়ে মালিস করতে এলে বা সেবা করতে এলে তাঁর পক্ষে মুশকিল হ'ত। কারণ ভদ্রতা ক'রে কিছু বলতেও পারতেন না আর সহ্য করাও বিপদ। কোনো শারীরিক প্রয়োজনের কথাই কখনো বলতেন না। বুঝে বুঝে করতে হত। যদি ঠিকমত হোতো—ভাল, খুশি হতেন, না হলেও কোনো অনুযোগ অভিযোগ নেই। সব চুপচাপ ধীরে সুস্থে হয়ে যাচ্ছে, এইটি তাঁর

ভাল লাগত। এটা চাই ওটা চাই ক'রে ব্যস্ত করা তাঁর একেবারেই স্বভাব-বিরুদ্ধ। রাত্রে শত প্রয়োজন হলেও কখনো কাউকে ডাকতেন না। চাকররা ঘুমিয়ে থাকলে পা টিপে টিপে চলতেন, পাছে তাদের ঘুম ভাঙ্গে। তাঁর এই অভ্যাসগুলো অন্য সকলের চাইতে এত পৃথক যে আমাদের ভারি আশ্চর্য লাগত, এবং কত যে ভাল লাগত বলা যায় না। সাধারণতঃ আমাদের দেশের বাড়ির কর্তারা বাড়ির আর পাঁচজনের উপর একটা প্রকাণ্ড বোঝা। পাছে তাঁদের পান থেকে চুণ খসে, এই জন্য সমস্ত সংসার তটস্থ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই জিনিসটি তিনি মোটে পছন্দ করতেন না। হুকুম করতে তিনি সংকোচ বোধ করতেন। কলমটা দাও বা চাদরটা চাই—এও যেন তাঁর বলতে ইতস্তত বোধ হ'ত! ইদানীং বাধ্য হয়েই তাঁকে পাঁচজনের সাহায্য নিতে হ'ত, কিন্তু তাতে অস্বস্তি বোধ করতেন। তাই যদি কেউ খুশি হ'য়ে সানন্দে তাঁর কাজ করত তবেই তার কাছ থেকে নিতেন,—বলতেন, চাকর-বাকরদের মাইনে দেওয়া হচ্ছে ব'লেই ওদের বাধ্য করে খাটানো কিংবা জোর করে সেবা আমি নিতে পারিনে। ক্রমশই পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে পড়ছেন, এটি তাঁর খারাপ লাগত, তাই শেষ এক বৎসর যখন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন তখন নিশ্চয় খুবই কষ্ট পেতেন। যাঁরা সেবা করতেন তাঁদের প্রতি যেন কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। এ কথা কখনো মনে করতেন না যে, কেন করবে না, বা এতো করবারই কথা,—এ দৃষ্টিতে দেখতেন না। তাঁর সেবা করতে পাওয়াই এক পরম সৌভাগ্য, যে সৌভাগ্যের স্মৃতি আজীবন সকলে মনে রাখবে। কিন্তু তিনি সেই সেবা যেন সহজপ্রাপ্য বলে অগ্রাহ্যের সঙ্গে গ্রহণ করেননি। তিনি তার মধ্যের স্নেহ-রসটুকু সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করে ভোগ করে, তাঁর সমস্ত সেবক-সেবিকাদের ধন্য করে,—তাঁর জন্য যতটুকু করা তার চতুর্গুণ দাম চুকিয়ে দিয়েছেন—'যে আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে, ফেলিয়া যে যায় নাই ঋণভার।' " [পৃ° ২৫২-২৫৪।]

আত্মপরিজনের দুঃখমোচনের প্রেরণাবশেই তিনি বায়োকেমিক চিকিৎসায় মনোনিবেশ করেন। স্নেহভাজন সজনীকান্তের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি নিজে কিছু করতে পারেন কিনা সে কথাই ভাবছিলেন। কবির এই ঐকান্তিক আগ্রহের কথা সুধাকান্ত সজনীকান্তকে জানালেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে সজনীকান্ত কবিকে তাঁর অসুখের বিস্তারিত ইতিহাস লিখে পাঠালেন। পরদিনই কালিম্পং থেকে ব্যবস্থাপত্র এল—

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

সকল বিষয়েই আমি আনাড়ি, অশিক্ষার উপর কাজ চালিয়ে দিই, সব সময়ে ধরা পড়িনে। আমার ডাক্তারির পক্ষে বলবার কথা এই যে, সাংঘাতিকতায় আমার ওষুধ ব্যামোকে ছাড়িয়ে যায় না। বায়োকেমিক বইটা ঘেঁটে দেখছিলুম যে ঐ চিকিৎসার মতে নেট্রাম সাল্‌ফ ডায়াবিটিসের প্রধান ওষুধ। তুমি এক কাজ করো। 'বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ি'র 'টুয়েল্‌ভ টিশু রেমেডিজ' আনিয়ে নিয়ো, বলাইয়ের সাহায্যে সেটা ঘাঁটিয়ে নিয়ো। বায়োকেমিক ওষুধের গুণ এই যে হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধের মতো এ শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। অন্য ওষুধের সঙ্গে এর ব্যবহার চলে, অন্তত আমি তো ব্যবহার করেছি। দিনে তিনবার খেলে আপত্তি করে না, অ্যাকিউট ব্যাধিতে সেইটেই ব্যবস্থা।

আমার মনের অবস্থা কর্মবিমুখ, আমার গ্রহ আমাকে খাটিয়ে নেয়, বাজে খাটুনিই বেশি। ইতি তারিখ পাঁজি দেখে ঠিক ক'রে নিয়ো।

রবীন্দ্রনাথ"

এই চিঠির তারিখ হল ৬ই জুন ১৯৪০। কবির নির্দেশে সজনীকান্ত বায়োকেমিক চিকিৎসার দিকে আকৃষ্ট হলেন। শুধু বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ি নয়, আরও শ' দুই টাকার বই কিনে পারিবারিক চিকিৎসায় বায়োকেমিক পদ্ধতিই অনুসরণ করতে লাগলেন। শিশুকন্যার সান্নিপাতিক জ্বরেও তিনি সুফল পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। তবে নিজের ডায়াবিটিসে বিশেষ ফলোদয় হয়েছিল বলে মনে হয় না। শুধু কবিকে খুশী করবার জন্যেই লিখলেন, ওষুধ ব্যবহার করে তিনি অনেকটা সুস্থ আছেন। শুনেছি কবির অন্তরঙ্গজনেরাও তাঁর বায়োকেমিক চিকিৎসা সম্পর্কে অনুরূপ মধুর মিথ্যারই আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সজনীকান্তের চিঠি পেয়ে কবি শিশুর মত খুশী হয়ে লিখলেন :

"ওঁ

[কালিম্পঙ, ২০ জুন, ১৯৪০]

কল্যাণীয়েষু

আমার ওষুধে ফল পেয়েছ। বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন। যে বয়সে স্বভাবতই অন্য খ্যাতির পথে বালিচাপা পড়ে, সেই বয়সে তিনি একটা নতুন পথ খুলে দিলেন। আমার জীবন-চরিতের শেষ অধ্যায়ে এই খবরটা দিয়ে

যেতে পারবে। এ বিদ্যেটা সরস্বতীর এলাকায় নয়, এটা ধন্বন্তরির মহলে—সেখানে রস নেই রসায়ন আছে। সাইকলজির নাড়ি যাঁরা টেপেন, এখানকার নাড়ির খবর তাঁদের হাতে নেই। (বলাইয়ের প্রতি কটাক্ষ করচিনে, পদ্মগন্ধে আয়োডোফর্মের গন্ধ বেমালুম মিশে গেছে তাঁর নাসারন্ধ্রে।) যাক তোমার মাথাটাকে চাঙ্গা করবার জন্যে আমার বায়োকেমিক বিধান হচ্ছে কেলিফস সিক্স এক্স। পূর্বের ওষুধের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে, দিনে পাঁচটা বড়ি, অন্তত তিনবার সেবনীয়।

রবীন্দ্রনাথ"

সজনীকান্তের বন্ধুস্থানীয় বীরেন রায় বায়োকেমিক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর ইংরেজিতে একখানি বড় গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্র সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হয়ে সজনীকান্ত কবিকে একখানি পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কালিম্পং থেকে শান্তিনিকেতনে নেমে এসেছেন। ১৯৪০-এর ২৮ জুলাই শান্তিনিকেতন থেকে লিখছেন :

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার বায়োকেমিক বন্ধুর উদ্দেশে একখানা প্রশস্তি পত্র লিখে পাঠালুম। এখানে তোমার যে বন্ধুটি আমার সিংহাসন আগলিয়ে থাকেন ইংরেজিতে লেখবার জন্যে তোমার হয়ে তিনি আমাকে তাগিদ জানালেন। গৌড়ীয় সাহিত্যমণ্ডলীর প্রতিনিধি আমি এমন দুর্নীতির কাজ পারতপক্ষে করিনে। আমার পক্ষে এর পরিণাম ভাল হবে না। আমার কলমের মুখে এ রকম বিধার্মিক কালী পড়াতে আমি লজ্জিত আছি। যদি এতে কারো কোনো উপকার হয় ভেবে এই অনাচার মেনে নিলুম।

তোমার কাজের মহলে একটা ডাক্তারি খিড়কির দরোজা হঠাৎ খুলে গেল—এর জন্যে দায়ী আমি। আশা করি কোনো পরিতাপের কারণ ঘটবে না। ভালো আছ বলে আন্দাজ করছি। চুপচাপ থাকাটা একটা খবর—ওটা আরো কিছুদিন বড় হেডলাইনে জাহির কোরো।

আমার দিন চলছে একঘেয়ে সুরে, অবন্ধুর পথে। ইতি ২৮।৭।৪০

রবীন্দ্রনাথ"

বারো

"আমার দিন চলছে একেঘেয়ে সুরে, অবক্কুর পথে"—মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার এক বৎসর পূর্বে পত্রালাপে কবির এই ক্লান্তির সুরটি লক্ষ্য করবার মত। সুদীর্ঘ জীবনের পথপরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথকে মাতা পিতা পত্নী পুত্রকন্যা সন্তানতুল্য নিকটাত্মীয় এবং বহু প্রিয় বন্ধুর বিয়োগবেদনা ভোগ করতে হয়েছে। বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিলেন দীনবন্ধু এণ্ডরুজ। তাঁর মৃত্যু হল ১৯৪০-এর ৫ এপ্রিল। ১৯১২ সনে দীনবন্ধুর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। তারপর আটাশ বৎসর ধরে তিনি গুরুদেবের আশ্রমের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন [১৯৩৬], "Twenty five years ago, my whole heart was given to the poet Rabindranath Tagore, and it has remained with him ever since. He has been my Gurudeva, teaching me to understand and love humanity in the East no less than I had learnt in earlier years, to love it in the West. * * * I can say with truth that this friendship has grown stronger as the years have passed and has remained steadfast throughout. It has been a supreme treasure in my life; the greatest gift God has given me in human ways." [রবীন্দ্র-জীবনীতে উদ্ধৃত ; দ্র° র-জী-৪, পৃ° ২০৭-৮]।

এণ্ডরুজের যখন মৃত্যু হল তখন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মৃত্যুশয্যায়। পুত্রপ্রতিম সুরেনের মৃত্যুর আশঙ্কায় বিচলিত কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন, "সুরেনের জন্যে মন কী রকম উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তা বলে উঠতে পারিনে।...আমার নিজের শরীর একটুও ভালো নেই—প্রায়ই জ্বর হয়। আর অহোরাত্র থাকে সেই জ্বরের দুর্বলতা। কাজ করবার শক্তি কমেছে, রুচিও নেই, অথচ এত কাজের আক্রমণ এর আগে আর কখনো মনে পড়ে না। বয়স যতই বাড়ছে মন যতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে জরায়, নিরবকাশ ততই নীরন্ধ্র হয়ে উঠেচে।...

"কিন্তু আমার তো যাবার সময় হয়ে এসেছে—কোনো কিছুর জন্যে পরিতাপ করবার সময় নেই জানি, তেমনি আর সময় নেই কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি নেবার।...এই জন্যে দুর্বল স্বাস্থ্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনের অস্বচ্ছ আলোয় ঝুঁকে পড়ে কাজ করে চলেছি।"...[রবীন্দ্র-জীবনী-৪, পৃ° ২০৯-১০]।

মংপুতে ২৫শে বৈশাখের জন্মোৎসবের পরদিন কবির কাছে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছল। এই মর্মান্তিক সংবাদে অভিভূত কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন, "তোরা বোধ হয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালোবেসেছিলুম। নানা উপলক্ষ্যে তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছা করেছি বারবার, বিরুদ্ধ ভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয় নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধ হয় কাছে আসবো, সেইদিন নিকটে এসেছে।"

মংপু থেকে কালিম্পঙে পৌঁছবার কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতন থেকে কালীমোহন ঘোষের মৃত্যুসংবাদ এল [মৃত্যুদিন ১২মে ১৯৪০]। কালী-মোহন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞে অন্তরঙ্গ সঙ্গী। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাজে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কর্মের সহযোগিতায় এবং ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে কবির আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। স্বভাবতঃই এই অকৃত্রিম সুহৃদের মৃত্যুসংবাদ কবিমনে গভীর ভাবে বেজেছিল।

একটি একটি করে এই সব আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর আঘাত বুকে নিয়ে কালিম্পং থেকে কবি কলিকাতায় ফিরলেন ১৯৪০-এর ২৯ জুন। দিন চারেক কলিকাতায় থেকে গ্রীষ্মাবকাশের পর বিশ্বভারতী খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরে গেলেন শান্তিনিকেতনে। এবং ফিরে গিয়েই দেহের জরা এবং মনের অবসাদকে দূরে ফেলে দিয়ে সারস্বত স্বপ্ন ও কর্মের মধ্যে ডুবে গেলেন। এবার যেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর প্রতি শেষকৃত্য পালনের জন্যেই তিনি বিদ্যাভবনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দিকে মন দিলেন। বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা পড়াতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলল নিজের লেখা কবিতা গান ও গল্প। আর চলল বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার জন্যে অন্যের রচনা সংশোধনের কাজ।

'সানাই' কাব্যগ্রন্থ বেরুল তাঁর আশি বৎসর বয়সের শেষ বসন্তের ফসল নিয়ে। জীবনের সর্বশেষ বৎসরে [ভাদ্র ১৩৪৭-শ্রাবণ ১৩৪৮] আরও তিন-খানি কাব্যগ্রন্থ বেরুল 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে'। তা ছাড়া লিখলেন নিজের ছেলেবেলার স্মৃতিকথা—অবিস্মরণীয় 'ছেলেবেলা'। আর লিখলেন 'তিনসঙ্গী', 'গল্পসল্প' এবং 'সভ্যতার সঙ্কট'। কী বিস্ময়কর প্রাণশক্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের, তা এই শেষ বৎসরের বিচিত্র সৃষ্টি থেকেই খানিকটা অনুমান করতে পারা যায়।

তবু মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার ঘণ্টা বাজতে লাগল। শেষ বিদায়ের ঘণ্টা। সজনীকান্ত তাঁর সদ্য প্রকাশিত হাসির কাব্য 'কেডস ও স্যাণ্ডাল' এবং হাসির গল্প 'কলিকাল' কবিকে পাঠিয়েছিলেন। প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কবি লিখলেন ঃ

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। তোমার বই দুটি পেয়েছি। চোখ সুস্থ হলে পড়ব। কিছুতে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হয়েছে। অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার ইচ্ছা করছি। যাবার মুখে কলকাতায় দেখা হতে পারবে। নইলে তুমি যদি এখানে এসো সেও একটা উপায় আছে। ইতি ১০।৯।৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

"অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার ইচ্ছা করছি।" যে শান্তিনিকেতনের প্রচণ্ডতম গ্রীষ্মেও কবি তাঁর প্রিয় আশ্রমকে কোনদিন পরিত্যাগ করে যান নি, সে শান্তিনিকেতন থেকে পালিয়ে তিনি নগাধিরাজের শীতল কোলে আশ্রয়ের জন্যে আকুল হয়েছেন। অক্টোবরের জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা থেকে কালিম্পং রওনা হলেন। কিন্তু শরীরের সেই অক্ষম অবস্থাতেও কবির নব নব সৃষ্টির প্রেরণা তাঁকে নব নব শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত করছে। কিছুদিন আগেই তিনি লিখেছেন "ল্যাবরেটরি" গল্প। এই গল্পের নায়িকা সোহিনী বোধ করি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের সবচেয়ে দুঃসাহসিক চরিত্র-কল্পনা।

রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল কোন নূতন সৃষ্টি হলেই অন্তরঙ্গ জনকে তা পড়ে শোনানো চাই। অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল তাঁর মন। কারও মুখে সামান্য বিরূপ মন্তব্য শুনলে তিনি অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত পীড়িত হতেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন "ল্যাবরেটরি" গল্প তাঁর অসামান্য সৃষ্টি। তাঁর ইচ্ছা হল তিনি গল্পটি সজনীকান্তকে পড়ে শোনান। সজনীকান্ত তখন ভাগলপুর কলেজের সাহিত্যসভায় পৌরোহিত্য করতে সেখানে গিয়েছেন। তাঁর কাছে জরুরি তারবার্তা প্রেরিত হল। হন্তদন্ত হয়ে সজনীকান্ত কলিকাতা ফিরলেন ১৭ই সেপ্টেম্বর। টেলিফোনে সংযোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জোড়াসাঁকোয় তাঁর ডাক পড়ল। সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আত্মস্মৃতিতে সজনীকান্ত লিখেছেন ঃ

"বেলা চারিটায় পৌঁছিলাম, তাঁহাকে সুস্থ দেখাইতে ছিল না, চোখ এবং কান খুবই খারাপ হইয়াছে, তবু দেখি প্রস্তুত হইয়া আছেন—সদ্য-লেখা 'ল্যাবরেটরি' গল্প আমাকে পড়িয়া শুনাইবেন। আমি শঙ্কিত হইলাম, তাঁহার পরিজনদের কাছে কেমন একটা সংকোচও বোধ হইতে লাগিল; তবু শুনিতে হইল। দেখিলাম এই বয়সে অসুস্থ শরীরে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন; বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এক নারীচরিত্র সোহিনীর আবির্ভাব হইয়াছে। আমার কথায় কবি ছেলেমানুষের মত খুশী হইয়া উঠিলেন।" ['শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩, পৃ. ১৭৪]।

রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী চরিত্রের প্রশংসায় সজনীকান্তের কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, এবং সে উচ্ছ্বাস অকৃত্রিম,—বিষয়টি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম যুগে এই গল্প লিখলে 'শনিবারের চিঠি'তে কবিপরিবাদ যে ভাষায় লিপিবদ্ধ হত তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু এখন সজনীকান্তের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। সাহিত্যবিচারক্ষেত্রে শ্রদ্ধার দৃষ্টি আর অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে কত পার্থক্য ঘটে, ঘটনাটি তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

তেরো

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বশেষ ভ্রমণ হিমালয়ে ১৯৪০ সনের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে মাত্র সাতদিন স্থায়ী হয়েছিল। কালিম্পঙের সেই সপ্তাহমাত্র ব্যাপী ভ্রমণকাহিনী কবিজীবনে মৃত্যুর পূর্বাভাস বহন করে এনেছে। রবীন্দ্রনাথ পাহাড়-পর্বতকে বিশেষ ভালবাসতেন না। নদীর ধারই ছিল তাঁর প্রিয়তর। বলতেন, নদীর একটি বিস্তীর্ণ গতিশীলতা আছে। পাহাড়ের আবদ্ধ সীমার মধ্যে মনকে সংকীর্ণ করে রাখে, তাই পাহাড়ে বেশিদিন থাকতে ভাল লাগে না। বহুকাল আগে কবি রামগড়ে 'হৈমন্তী' নামে একটি শৈলাবাস তৈরি করেছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে রামগড়ের পথ বহুদীর্ঘ। ঘনঘন যাতায়াত সম্ভব ছিল না। তাই সে বাড়ি শেষটায় বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শেষবয়সে কবি পুত্র ও পুত্রবধূর স্নেহবৃত্তে থাকতেই ভালবাসতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর শেষজীবনের সারথি। বৈষয়িক সংস্রব ছেড়ে দেবার পর কোনদিন কেউ তাঁকে টাকা হাতে রাখতে দেখেন নি।

নিজের সম্পর্কে অর্থ সম্বন্ধে কোন হিসাবনিকাশের ধার ধারতেন না। যা প্রয়োজন ছোট ছেলের মতো সেটি পেলেই খুশী হয়ে উঠতেন। শুধু টাকা-পয়সার দিক দিয়েই নয়, সব দিক দিয়েই পুত্র কিংবা পুত্রবধূ কাছে না থাকলে কবি ভারি বিচলিত হতেন।

সেপ্টেম্বরে রথীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে পাতিসরে গিয়েছেন। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী রয়েছেন কালিম্পঙে অসুস্থ অবস্থায়। কালিম্পঙে যাবার জন্যে জেদ করে কবি এলেন কলিকাতায়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র তাঁকে দেখতে এসে বললেন, শরীরের এই অবস্থায় তাঁর কিছুতেই পাহাড়ে যাওয়া উচিত হবে না। সবাই ডাক্তার রায়ের সঙ্গে সুর মেলালেন। কিন্তু কবির সেই এক কথা—যাব যখন স্থির করেছি তখন যাবই।

অতএব নগাধিরাজের শীতল কোলে কবির শেষযাত্রা শুরু হল। সঙ্গে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এবং দুজন ভৃত্য বনমালী ও মহাদেব। প্রথম কদিন কালিম্পঙের গৌরীপুর ভবনে ভালই কাটল। ২৫শে সেপ্টেম্বর কবি অমিয় চক্রবর্তীকে কালিম্পঙে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্ছে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে; পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপাণির বীণার গুঞ্জন।"

কিন্তু বিপদ এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের মত: ২৬ সেপ্টেম্বর ইউরিমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কবি জ্ঞান হারালেন। কালিম্পঙে তখন দুজন ভৃত্য ছাড়া পুরুষ সঙ্গী কেউ নেই। সুধাকান্ত পুত্রের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেছেন। কেবল অসুস্থ প্রতিমা দেবীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মংপু থেকে মৈত্রেয়ী দেবী। অসুস্থ কবিকে নিয়ে এই দুটি নারীর যে কী উৎকণ্ঠায় আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটেছে তার বিশদ বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতিকথায়। ['নির্বাণ'—প্রতিমা দেবী। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'—মৈত্রেয়ী দেবী]। সেই পাণ্ডববর্জিত দেশে তখন টেলিফোনেও যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। টেলিগ্রাম অফিস সাত মাইল দূরে রিয়াং স্টেশনে। যানবাহনও চলাচল করে না। ডাকের ব্যবস্থা প্রাগৈতিহাসিক। কালিম্পঙ থেকে মংপু পঁচিশ মাইল দূরে। চিকিৎসার ব্যবস্থা তথৈবচ। মৈত্রেয়ী দেবী লিখছেন, "চারদিকের চাবাগানে এমন কি মংপুর সরকারী কুইনাইন চাষ

ক্ষেত্রেও চিকিৎসার ব্যবস্থা একেবারেই আদিম অবস্থায় ছিল। এক একটি সাব এসিস্টেন্ট সার্জেনের উপর চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল এলাকার সব ভার— তাদের বিদ্যাতেও মর্চে পড়া, হাতেও হাতিয়ার নেই—খড়ো কুঁড়েতে দুটো খাটিয়া পেতে হাসপাতাল, সেখানে ভোঁতা সূচে ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা চলে।"

এই পরিবেশে আশি বছরের রবীন্দ্রনাথ পুরুষসঙ্গিহীন অবস্থায় অসুস্থ হয়ে রয়েছেন। বলাই বাহুল্য, ঘটনাটি তাঁর আত্মীয় পরিজনবর্গের পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় ছিল না। যাই হোক কালিম্পঙের একমেবাদ্বিতীয় বাঙালী ডাক্তার গোপালচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন একমাত্র আশ্রয়। বড় বিপদের আশঙ্কা করে দাশগুপ্ত ডাকলেন কালিম্পঙ মিশনারি হাসপাতালের মাইনে-করা ছোকরা সাহেব-ডাক্তারকে। কিন্তু সে নিজে কোন দায়িত্ব নিতে চাইল না। তখন ডাকা হল দার্জিলিঙের সিভিল সার্জনকে। উন্নাসিক ইংরেজ ডাক্তার। সে এসেই অনুযোগ করল রোগীকে এই অবস্থায় হাসপাতালে না পাঠিয়ে বাড়িতে কেন রাখা হয়েছে। রোগীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে বলল, 'পুট আউট ইওর টাং।' কোন সাড়া না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাজ হি স্পীক ইংলিশ ?' এই শ্রদ্ধালেশহীন দুর্বিনীত সার্জনটি যখন লাম্বার পাঙ্কচার করে ফ্লুইড বের করে দেওয়া কিংবা সুপ্রা পিউবিকের জন্যে অস্ত্রোপচার করবে বলে জেদ ধরল তখনকার অসহায় অবস্থার কথা বলেছেন প্রতিমা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবী। কোনক্রমে ইংরেজ ডাক্তারকে ঠেকিয়ে রেখে বহু চেষ্টার পর টেলিফোনে কলিকাতার সঙ্গে যোগ স্থাপন করা সম্ভব হল। ২৮শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা থেকে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ডাঃ সত্যসন্ধ মৈত্র, ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, ডাঃ অমিয়নাথ বসু এই তিনজন ডাক্তারকে নিয়ে কালিম্পঙ পৌঁছলেন। কবিকন্যা মীরা দেবীও সঙ্গে গেলেন। পরে পৌঁছলেন শান্তিনিকেতনের পরিকরগোষ্ঠী—সুরেন্দ্রনাথ কর, অনিলকুমার চন্দ এবং সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। সন্ধ্যার ট্রেনেই কলিকাতা যাত্রা সাব্যস্ত হল। একটা স্টেশন-ওয়াগনের সীট খুলে বিছানা পাতা হল। তার মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হল কবিকে। রাস্তায় ধস নেমেছিল। শ খানেক কুলি লাগিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে ঘণ্টা তিনেক সংগ্রামের পর গাড়ি পৌঁছল শিলিগুড়ি স্টেশনে। তখন রাত নটা। আগের দিন রেডিও স্টেশন বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে কবির অসুস্থতার খবর তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছয়। রথীন্দ্রনাথ খবর পেয়ে শিলিগুড়িতে উপস্থিত হলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর

ভোরবেলা কবি ট্রেনে করে পৌঁছলেন কলিকাতায়। শিয়ালদা থেকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হল জোড়াসাঁকোর বাসভবনে। দোতলায় পাথরের ঘরে থাকলেন একমাস কুড়ি দিন। কলিকাতায় আসার পর ডাক্তারদের পরামর্শ চলল কবির দেহে অস্ত্রোপচার করা হবে কি না। বিধানচন্দ্র তখন শিলঙে। বর্ষিষ্ঠ ডাক্তার নীলরতন সরকার অস্ত্রোপচার নিষেধ করে নির্দেশ দিলেন এম-বি সিকস-নাইন-থ্রি। পরের বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীমতী রাণী চন্দ তাঁর 'গুরুদেব' গ্রন্থে। কবি তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি। এরই মধ্যে এল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। রবীন্দ্রনাথের এক দিদিই তখন জীবিত —বর্ণকুমারী দেবী। পঁচাশি বছরের দিদি এলেন আশি বছরের ছোট ভাইটিকে ফোঁটা দিতে। শ্রীমতী চন্দের বর্ণনায় সেই দৃশ্যটি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। অন্তরঙ্গ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কবিকে দেখতে ও-বাড়ি থেকে এ-বাড়িতে আসতেন অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু তিনি ঘরে আর ঢুকতেন না। বলতেন, 'রুগ্নসিংহ বিছানায় পড়ে, ও আমি দেখতে পারব না।'

চোদ্দ

কবি জোড়াসাঁকো থেকে শেষ বারের মত শান্তিনিকেতনে গেলেন ১৮ নভেম্বর ১৯৪০। সোয়া আট মাস তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়ে তিনি তাঁর জন্মগৃহ জোড়াসাঁকোয় ফিরলেন ২৫শে জুলাই ১৯৪১। শান্তিনিকেতনে কবির স্বাস্থ্য স্বাভাবিক অবস্থায় আর ফিরে এল না। কিছুতেই রোগের উপশম নেই। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক—সব রকম চিকিৎসাই করে দেখা গেল। কোন ফলোদয় হল না। প্রত্যহ দেহের উত্তাপ হত ৯৯। এই অসুস্থতার মধ্যেই কিন্তু সাহিত্যকর্ম—কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ—চলছে অবিচ্ছিন্ন ধারায়। এমন সময় এল কবির জীবনের শেষ নববর্ষ—১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ। নববর্ষের দিনে আশ্রমবাসীদের উদ্দেশ্যে কবি তাঁর শেষ আশীর্বাদে মানুষের অপরিসীম প্রীতির উদ্দেশে তাঁর শেষ নমস্কার জানিয়ে বললেন :

"জন্মকালে আমরা যে আত্মীয় লাভ করি তার মধ্যে কোনো চেষ্টা নেই, জীবনলক্ষ্মীর যে অযাচিত দান, তার মধ্যে আমাদের কোনো গৌরব নেই। তারপর জীবনযাত্রার পথে পথে যদি আত্মীয় সংগ্রহ করতে পারি তবে সেই তো আশ্চর্য, সেই তো গৌরবের বিষয়, সেই আত্মীয়তা আরো গভীর, অকৃত্রিম,

মূল্য তার অনেক বেশী—আশীর্বাদ সেই তো বহন করে আনে। আজ যে তোমাদের সকলের হৃদয়ের দান বিধাতার আশীর্বাদরূপে আমার কাছে উপস্থিত এ এক আশ্চর্য ঘটনা। কোন্ দূরে পরিবারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমার বাল্যলীলা আরম্ভ, আমি কাউকে জানতুম না, দুচারজন আত্মীয়ের মধ্যে আমার পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল। আজ তোমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভাবি, বিধাতা আমার জীবনে কী খেলা খেললেন, সে দিন তো এ-কথা কল্পনাও করতে পারিনি। প্রচলিত ভাষায় যাকে আত্মীয় বলে তোমরা তা নও, তাই তোমাদের প্রীতি এত মূল্যবান। * * * আমার মতন সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই আছে, শুধু যে আমার স্বদেশীয়েরাই আমাকে ভালোবেসেছেন তা নয়, সুদূর দেশেরও অনেক মনস্বী তপস্বী রসিক আমাকে অজস্র আত্মীয়তা দ্বারা ধন্য করেছেন। * * * সকলের এই স্নেহমমতা সেবা আজ আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করি, প্রণাম করে যাই তাঁকে, যিনি আমাকে এই আশ্চর্য গৌরবের অধিকারী করেছেন।"

বৈশাখে বেরোল 'গল্পসল্প'। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একখণ্ড সজনীকান্তের কাছে পাঠিয়ে কবি তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। 'গল্পসল্প' সজনীকান্তের খুব ভাল লেগেছিল। দেশে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাঁর ভাল লেগেছে জেনে আনন্দিত হয়ে কবি তাঁকে লিখলেন:

"কল্যাণীয়েষু,

সজনী, গল্পসল্প তোমার ভালো লেগেছে শুনে আমি খুশী হলুম। ও রকম খুচরো গল্প সাধারণত কারো কানে পৌঁছয় না, কিছু পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তুমি যে তার ঠিক মর্মটি ধরতে পেরেছ এতে তোমাকে সাহিত্যের সমজদার বলে চেনা গেল।

তোমার শরীর অসুস্থ এর মধ্যে তুমি যে এই লেখায় মন দিতে পেরেছ এ খুব আশ্চর্যের বিষয়। তুমি রোগের হস্ত হতে নিষ্কৃতি লাভ কর, আমি এই কামনা করি। ইতি

শুভার্থী

২৮।৫।৪১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

● একাশি বৎসরে পদার্পণ করে গুরুদেব তাঁর অসুস্থ শয্যা থেকে একচল্লিশ বৎসর বয়সের শিষ্যের রোগমুক্তির কামনা করছেন। পত্রখানি এই বিশেষ পরিবেশে আরও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। তাঁর শেষ দিনগুলির চেহারা বর্ণনা করে তাঁর আদরের মামণি—প্রতিমা দেবী লিখছেন, "এই নয় মাসে

ধীরে-ধীরে চেহারা বদলে গিয়েছিল, তিনি শীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু তাতে তাঁকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখাত না, তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা একটি করুণায় পূর্ণ হয়েছিল, তাঁকে ইদানীং মনে হোত তপঃক্লিষ্ট ঋষি, আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্যে দিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে, মুখে ঠিকরে পড়ত একটি প্রীতি ও শান্তির ধারা।”

সজনীকান্তের ডায়াবিটিস তখন নিয়ন্ত্রণের সীমানা ছাড়িয়েছে। বাড়ি থেকে বেরনো ছিল ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু তিনি কবিগুরুর অসুস্থতার সংবাদে চুপ করে থাকতে পারলেন না। জরুরি প্রয়োজনে চন্দননগর যাচ্ছেন—গৃহিণীকে এই মিথ্যা কথা বলে রবীন্দ্রদর্শনকামী দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে—৩রা জুন সকালের ট্রেনে। গুরুদেবকে প্রণাম করে বিকেলের ট্রেনেই আবার কলিকাতা ফিরে এলেন। এই অপ্রত্যাশিত আগমনে কবি ভারি খুশী হয়ে উঠলেন। আদর-আপ্যায়নের যাতে কোন ত্রুটি না হয় এই নিয়ে পরিবারবর্গকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও সজনীকান্ত তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন— এতে কবি যে কত খুশী হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পরদিন লেখা তাঁর চিঠিতে। তাতে কবি লিখছেন ঃ

সজনী, তুমি ক্ষণকালের জন্য এসে আমাদের খুশী করে দিয়ে গেছ। তোমার যে রকম ভঙ্গুর অবস্থা তাতে আমি এ প্রত্যাশা করি নি। প্রতীক্ষা করে রইলুম সুস্থ অবস্থায় আবার সম্মিলন হতে পারবে। আমি আজ অপেক্ষাকৃত কিছু ভালো আছি। তোমার বন্ধুরা খুশী হয়ে গেছেন, এই বর্ষার দিনে তাতে সুধাকান্তর মনকে মুখরিত করে তুলেছে। আশা করি সদলবলে ঘরে সুস্থ অবস্থায় ফিরতে পেরেছ এবং গৃহিণীর ভর্ৎসনা দুঃসহ হয় নি। ইতি ৪।৬।৪১

শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ”

এই পত্রই সজনীকান্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ পত্র। এতে কবি লিখেছিলেন “প্রতীক্ষা করে রইলুম সুস্থ অবস্থায় আবার সম্মিলন হতে পারবে।” এক মাস তেইশ দিন পরে আবার গুরুশিষ্যের সম্মিলন হয়েছিল, কিন্তু কবির সুস্থ অবস্থায় নয়। মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার পূর্বে আশ্রম থেকে জন্মভিটায় কবির শেষযাত্রালগ্নে জোড়াসাঁকোয় যখন উভয়ের মিলন হল তখন কবিগুরুর বাহ্যচেতনা লুপ্ত হয়েছে।

পনেরো

১৯৪১ সনের পঁচিশে জুলাই শুক্রবার বেলা তিনটে পনেরো মিনিটে সময় রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মত প্রবেশ করলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পুরনো বাড়ির দোতলার সেই পাথরের ঘরেই তাঁর শেষশয্যা রচি হল।

অস্ত্রোপচারে তাঁর আপত্তি ছিল। বলতেন, শনি যদি একান্ত-কিছু ছি খোঁজে—সে যদি আমার মধ্যে রন্ধ্র পেয়েই থাকে—তাকে স্বীকার করে নাও মিথ্যে তার সঙ্গে যুঝে লাভ কি। মানুষকে তো মরতে হবেই একদিন মিথ্যে দেহটাকে কাটাকুটি ছেঁড়াছিঁড়ি করার প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁর ম যাই হোক না কেন, চিকিৎসকগণ সিদ্ধান্ত করলেন তাঁর দেহে অস্ত্রোপচা করার একান্তই প্রয়োজন। ত্রিশে জুলাই অপারেশন করলেন ডাক্তার ললি বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করা হয় নি। লোক্যা অ্যানাসথেশিয়া দেওয়া হয়েছিল। অপারেশনের সময় কবির খুবই লেগেছিল কিন্তু একটুও টের পেতে দেন নি তিনি, একটু নড়েন নি, একবারও আঃ উ করেন নি।

কিন্তু অস্ত্রোপচারের ফল ভাল হল না। কবির অবস্থা ক্রমশঃ মন্দে দিকে যেতে লাগল। তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহের মুক্তিযন্ত্রণার কা কড়চার আকারে লিখে রেখেছেন শ্রীমতী রাণী চন্দ তাঁর 'গুরুদেব' গ্রন্থে।

"৩১শে। আজ সকালে গুরুদেব একটা দুটো কথাই বললেন মাত্র—ব্যা করছে, জ্বালা করছে।"...

"১লা আগস্ট। আজ সকাল থেকে গুরুদেব কোন কথাই বলছেন না অসাড় হয়ে আছেন। কেবল যন্ত্রণাসূচক শব্দ করছেন থেকে থেকে।"...

"২রা। কাল রাতটা নানা রকম ভয়ভাবনাতে কাটল। গুরুদেব কেম যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন সারারাত।"...

"৩রা।...কাল রাত্রে গুরুদেবের অবস্থা সংকটজনকই ছিল। আজ যে একটু ভাল..."

"৪ঠা। ভোরবেলা অল্পক্ষণের জন্য গুরুদেব একটু-আধটু কা বললেন।"...

"৫ই। সারাদিন গুরুদেব সেই একই রকম অবস্থায়। সন্ধ্যের সা নীলরতনকে নিয়ে বিধানবাবু এলেন। আজ আর ডাকলেও গুরুদেবের কা থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।"...

"আজ ৬ই। সকাল হতে বাড়ি লোকে লোকারণ্য।"...

"গুরুদেব একবার সাড়া দিলেন এবং তাকালেন। কাল রাত থেকে অনেক সময়ে তাকিয়ে থাকেন, যেন কোথায় তাকিয়ে আছেন বোঝা যায় না। এক-একবার দু ভুরু কুঁচকে আসে, সেটা ব্যথায় বা আর-কিছুর—কি জানি।"...

"গুরুদেবের শিয়র বরাবর বাইরে পূবের আকাশে পূর্ণিমার ভরা চাঁদ। গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে দেখি পরিপূর্ণ ছবি একখানি। এই ছবিখানি যেন আজকের জন্যই দরকার ছিল।"

"৭ই আগস্ট ১৯৪১ সাল, শ্রাবণ মাসের বাইশে আজ। ভোর চারটে হতে মোটরের আনাগোনা জোড়াসাঁকোর সরু গলিতে। নিকট আত্মীয় বন্ধু পরিজন প্রিয়জন সব আসছেন দলে দলে।"...

"বেলা নয়টায় অক্সিজেন দেওয়া শুরু হল।"...

"বেলা দ্বিপ্রহরে বারোটা দশ মিনিটে গুরুদেবের শেষ নিঃশ্বাস পড়ল।"

"গুরুদেবকে সাদা বেনারসী-জোড় পরিয়ে সাজানো হল। কোঁচানো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, পাটকরা চাদর গলার নীচ থেকে পা পর্যন্ত ঝোলানো, কপালে চন্দন, গলায় গোড়ে মালা, দু পাশে রাশি রাশি শ্বেতকমল রজনীগন্ধা। বুকের উপরে রাখা হাতের মাঝে একটি পদ্মকোরক ধরিয়ে দিলাম; দেখে মনে হতে লাগল যেন রাজবেশে রাজা ঘুমচ্ছেন রাজশয্যার উপরে।"

শিল্পী নন্দলাল নক্‌শা কেটে শেষযাত্রার পালঙ্ক রচনা করে দিলেন। বিকেল তিনটেয় নিমতলার মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে জোড়াসাঁকো থেকে মর্ত্যকবির শেষযাত্রা শুরু হল। পথের পাশে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। "বাইশে শ্রাবণ" কবিতায় তিনি সেই অপরূপ সৌন্দর্যের অবিস্মরণীয় কাব্যরূপ দিলেন। অবনীন্দ্রনাথ সেই স্বপ্নকে ধরে রাখলেন রঙের তুলিতে। রাণী চন্দ লিখছেন, "জনসমুদ্রের উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকা নিমেষে দৃষ্টির বাইরে ভেসে চলে গেল।"

কবির শেষশয্যায় শেষের কদিন যাঁরা প্রায় অনুক্ষণ জোড়াসাঁকোর পাথরের ঘরে রুদ্ধশ্বাসে কাটিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সজনীকান্ত ছিলেন একজন। মর্ত্য থেকে বিদায়ের সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণা তাঁর কবিকণ্ঠে ভাষা পেল এক মাস পরে। গুরুদেবের উদ্দেশে তাঁর কবিশিষ্যের সেই উচ্ছ্বসিত শোকাঞ্জলি যে আশ্চর্য কবিতায় রূপলাভ করেছে তার নাম "মর্ত্য হইতে বিদায়।"

তারপরে সজনীকান্ত আরও একুশ বৎসর মর্ত্যলোকে বেঁচেছিলেন। এই একুশ বৎসর তিনি অক্লান্তভাবে তাঁর গুরুকৃত্য পালন করে গেছেন। সেই মহাতর্পণেরই উপযুক্ত ভূমিকা "মর্ত্য হইতে বিদায়"। ছন্দে অলংকারে রূপকল্পে বিশ্বকবিরই উপযুক্ত সেই অবিস্মরণীয় শোককাব্যটি উদ্ধার করে আমরা গ্রন্থের উপসংহার রচনা করলাম।—

মর্ত্য হইতে বিদায়

বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?
অরণ্যভূমি আঁধার করিয়া শতেক বর্ষ ধরি
শাখাপ্রশাখায় মেলি সহস্র বাহু
মৃত্তিকারস করিয়া শোষণ শিকড়ের পাকে পাকে
নিম্নে বিরচি বহুবিস্তৃত স্নেহছায়া-আশ্রয়—
অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?

সারা দেহ জুড়ি প্রদোষে উষায় নভচারী পাখীদের
কূজন ও কোলাহল—
স্তিমিত আলোয় উড়িয়া ক্লান্ত পক্ষের বিধূনন,
ভোরের আঁধারে দীপ্ত আশায় ডানা ঝাপটিয়া জাগা।
নীড়ে ও কুলায়ে প্রাণস্পন্দনে চকিত বিচঞ্চল—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?

অরণ্যশোভা বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?
পাদদেশে তার শতসহস্র পাদপ-সম্ভাবনা
খর্বায়তন লতাগুল্মের বিফল বিকারে হত।
রৌদ্রপুষ্ট সবুজ কোথায়? পাণ্ডুর বনতল—
বনস্পতির মৃত্যুতে তারা পেয়েছে মুক্তি সবে?
উদার আকাশে মেলিয়া অযুত বাহু
হয়েছে উতলা বিস্তার-কামনায়,
বনস্পতির বিহনে বনে কি ক্রমিছে এরণ্ডেরা?
লালসালোলুপ দৃষ্টি এখনি জাগিছে কাহারো চোখে,
কোনো বঞ্চিত, ওষ্ঠে তাহার ফুটিছে মলিন হাসি—
জীবনের লোভে মৃত্যুশীতল হাসি;
তবু আমি জানি, আশ্রয়হারা কাঁদিতেছে বনভূমি,

অভ্যাসবশে বনস্পতির নিবিড় চন্দ্রাতপ
কামনা করিছে সবে।
ধূসর রৌদ্র ভাল নাহি লাগে, আকাশের গাঢ় নীল;
বনস্পতির মহিমায় আজো কানন আত্মহারা।
একের মাঝারে সবার সার্থকতা,
অদ্বিতীয় সে একের বিয়োগে বহুর যে কাতরতা
পেতেছে প্রকাশ নয়নে বাষ্প হয়ে,
রৌদ্রদগ্ধ নভপ্রাঙ্গণ করিছে মেঘমেদুর—
রহি রহি আজো ধারাবর্ষণে ঝরিছে অবিশ্রাম;
লতাগুল্মের অরণ্যে হের ঝঞ্ঝার মাতামাতি,
মাথার উপরে আশ্রয় কারো নাই:
কাননভূমির চির-আশ্রয় একক বনস্পতি—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?

বিফল উপমা, কোথা অরণ্য, কোথায় বনস্পতি,
কোথা কালিদাস, উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে কবি—
কোথায় উজ্জয়িনী?
তবু মেঘদূত গগনে গগনে গুমরিছে গুরু গুরু,
পবনে করিয়া ভর
কালসমুদ্র পার হয়ে এল সহস্র বর্ষের।
শত-পারাবত-কূজন-মুখর ভবনবলভি যত
মিশেছে ধূলায়, শুনিতেছি মোরা আজো—
কপোতকাকলি এ কলিকাতায় অলস মধ্যদিনে।

হায় রে উপমা, বিফল উপমা যত!
সকল উপমা হারাইয়া গেছে কাল-তমসার নীরে
হায়, 'বলাকা'র কবি,
বাঁকা ঝিলমের দুই তীর ব্যাপি নেমেছে অন্ধকার,
জমেছে আঁধার নিরবধি-চলা "বিরাট নদী"র জলে!

তুষারমৌলি নগ-অধিরাজ দেখিয়াছি হিমালয়,
স্থিত পৃথিবীর মানদণ্ডের মত—
পূজিয়াছি হিমালয়ে।

যত দেখিয়াছি, তত করিয়াছি বিস্ময় অনুভব।
ভূমিকম্পের প্রবল তাড়নে সহসা কি একদিন
চৌচির হয়ে ফাটিয়া পড়িতে দেখিয়াছ হিমালয়ে?
সহস্রশির বিরাট নগাধিরাজে
গুঁড়া গুঁড়া হয়ে ভাঙিয়া পড়িতে তোমরা দেখেছ কেউ?
আকাশ-আড়াল-করা ব্যবধান একদা নিশীথশেষে
চকিতে দেখেছ বাতাসে উড়িয়া গেছে?
সহসা দেখেছ বিস্মিত আঁখি মেলে
হিমালয় নাই, ধূ ধূ করিতেছে সীমাহীন প্রান্তর,
ধূ-ধূ করিতেছে বালি-ঝলসানো সুবিশাল মরুভূমি—
মরীচিকাহীন ভয়াবহ মরুভূমি?
মহা-হিমালয়ে ভাঙিতে দেখেছ কেউ?
পাদমূল সহ দেবতা-আত্মা হিমচূড়া হিমালয়ে
মৃত্যুর মত কালো কুয়াশায় ঢাকিতে দেখেছ কেউ?
রবির উদয়ে যে কুয়াশা কভু শূন্যে মিলাবে নাকো,
যে কুয়াশা ছেদি হাসিবে না হিমালয়;
সুনীল আকাশপটে কোনদিন তুষারশীর্ষ গিরি
জাগিবে না আর—কারো মনে এই জেগেছে সম্ভাবনা,
কঠিন সম্ভাবনা?
ভাঙিতে কেহ কি দেখিয়াছ হিমালয়ে?

বিফল উপমা, কোথা হিমালয়-নদী-গুহা-আশ্রয়,
কোথা কালিদাস রঘুকুমারের কবি?
চিতার ভস্ম উড়িছে কি আজো রোদনমুখর
রেবামালিনীর কূলে,
স্মৃতিমন্দির উঠেছে কি কোনো, প্রভাতবেলায়
পুণ্যলোভীরা সবে
চন্দনমাখা শুভ্র কুসুম উদ্দেশে তাঁর দিতেছে শ্রদ্ধাভরে?
হরপার্বতী-মিলনকাহিনী সুরসিক জন পড়িতেছে যুগে যুগে,
কুতূহলী মোরা পড়ি অবকাশকালে—
ঘরে ঘরে সবে করি যে কামনা কুমার কার্তিকেয়ে;

বৈদেহী সাথে ফিরিছে রাঘব শূন্য বিমান-পথে,
আজো দেখি মনে সেই পুরাতন ছবি—
কলকোলাহল-মুখরিত এই নগর কলিকাতায়।
হায় রে উপমা, বিফল উপমা যত,
সকল উপমা হারাইয়া যায় ক্ষণিকের খেলাঘরে ;
হায়, 'ক্ষণিকা'র কবি,
আঁধার নেমেছে "কৃষ্ণকলি"র হরিণনয়ন ছেয়ে,
নেমেছে আঁধার "ময়নাপাড়ার মাঠে"।

*　　*　　*

পূর্ণিমাচাঁদ দেখি নি ডুবিতে, আঁধার শ্রাবণনিশি—
শুনিয়াছিলাম শঙ্খঘন্টারোল,
মেঘগর্জন-অবকাশে মোরা শুনেছিনু সকলেই
ঝুলন-পৌর্ণমাসী রজনীতে সঘন শঙ্খরব ;
বরষাবিদ্ধ তন্দ্রামগ্ন নগরী সে কলিকাতা,
চিৎপুর রোডে বন্ধ হয়েছে যানবাহনের চলা,
মেঘের আড়ালে দেখিনু সহসা হাসিল শারদশশী।

তীর্থযাত্রী একেলা পথিক বৈতরণীর তীরে
সম্বলহীন, তাই তো শঙ্কাহীন—
ওপারে চাহিয়া এপারের ছবি দেখিছে পথিক
ধ্যাননিমীলিত চোখে,
এপারের রবি ওপারে ডুবিতে চায়,
এপারে ওপারে আমাদের মাঝে দুস্তর পারাবার।

মহামানবের প্রাণ—
মানবের মাঝে চিরজীবী প্রাণ—সুন্দর ত্রিভুবন—
জীর্ণ খাঁচায় আজ পলাতক মরণোন্মুখ প্রাণ,
ভুবনের রূপ চির-অমলিন—তবুও বিবাগী প্রাণ,
শিয়রে তাঁহার জাগিছে কয়টি প্রাণী।
জাগে আর তারা প্রতীক্ষা করে নিশ্বাস শুনে শুনে,
প্রতীক্ষা করে নিশ্বাস রোধ করি,
প্রহর গনিয়া প্রতীক্ষা করে সবে।

শ্রাবণরজনী শিথিলচরণে প্রখর রৌদ্রে কখন আত্মহারা,
প্রভাত হইল রাখী-পূর্ণিমা-দিন,
মাটির ধরণী রাখিতে নারিল তবু
বিদায়প্রার্থী বিবাগী সন্তানেরে।
দূর হতে দেখি জীবনের বুকে মৃত্যুর নিশ্বাস
ওঠে আর ভেঙে পড়ে।
সুশুভ্রফেনশীর্ষ বারিধি মেলি তরঙ্গবাহু
অভ্যাসবশে তটেরে ধরিতে চায়—
মিথ্যা সে খেলা, আমি জানি তার গভীরেতে অনুরাগ।
বিদায়-বারতা শুধু নিশ্বাসে—শান্ত ললাট-পট,
পাণ্ডু ওষ্ঠে স্ফুরে না বিদায় গান ;
পিছু ফিরিবার নাহি কোনো ব্যাকুলতা,
যাবার বেলায় পিছু ডাকিবার ছিল না সেদিন কেউ।
সে মহাপ্রাণের শিয়রে জাগিয়া কটি অসহায় প্রাণী—
মূঢ় বিস্ময়ে সহসা দেখিল তারা—
দেখিল সহসা দ্বারে জনতার ভীড়।
মাটির পৃথিবী চঞ্চল হয়ে বাহু বুঝি মেলিয়াছে—
বিদায়প্রার্থী রাখিতে সন্তানেরে ;
তখন সময় নাই।
আকাশে বাতাসে শুধু শোনা যায় অস্ফুট কানাকানি,
প্রাণমৃত্যুর চিররহস্য-কথা—
নিগূঢ় গোপন কথা।
মৃত্যুর কথা কেহ বলিল না, "বারোটা তেরো মিনিট"—
কণ্ঠে কণ্ঠে অতি অসময়ে সময়ের পরিমাপ,
মহাকাল-গতি চকিতে থামিল যেন—
এপারে ওপারে ঘুচে গেল ব্যবধান,
প্রাণমৃত্যুর সব রহস্য শেষ।
আসিল পরম ক্ষণ—
সারা বনভূমি আলোড়ন করি মরিল বনস্পতি,
ভেঙে গেল হিমালয়।

মৃত্যুরে যেবা প্রলুব্ধ করি ডাক দিয়েছিল অর্ধ শতক ধরি
মৃত্যু তাহারে নিয়ে গেল শেষাশেষি ;
নিয়ে গেল ভালবেসে—
রক্ত-অধর নিবিড় চুমায় পাণ্ডুর হ'ল কি না,
হিসাব তাহার পারে নি রাখিতে কেউ।
গোধূলি-লগনে যায় নি পথিক স্তিমিত অন্ধকারে,
পাখীরা তখনো ফিরে আসে নাই নীড়ে।
দিনের রৌদ্র যখন প্রখরতম
মর্ত্য হইতে বিদায়-বারতা রটিল মর্ত্যভূমে,
মর্ত্য-মানব মোরা—
"স্বর্গ হইতে বিদায়ে"র কবি—নিমীল তাঁহার চোখে
বিদায়-অশ্রু কেহ কি দেখিয়াছিল ?
হায় কবি, হায়, সুন্দর ত্রিভুবন।

স্তম্ভিত ভয়ে শুনেছিনু সবে আর্ত ঘোষণা সেই,
আকাশের পানে তুলিয়া চকিতে শত উৎসুক আঁখি
দেখেছিনু সবে, খর-রবিকরে নিখিল পুড়িয়া যায়—
অকরুণ নীলাকাশ।

মৃত্যু, মরণ, সমাপ্তি, শেষ, বিদায় চিরন্তন—
কাব্যের ভাষা যাহাই বলুক, নিঃশেষে শেষ হওয়া
সকল দেহীর মত—
অমর কবির চরম সে পরিণাম ;
স্তব্ধ হইয়া শুনিলাম কানে শ্রাবণ-দ্বিপ্রহরে,
বিস্ময়ে দেখিলাম,
নিশ্চল দেহে সকল জ্বালার শেষ।

সুতীব্র কশাঘাতে—
অলক্ষ্য সেই অকরুণ কশাঘাতে
দেহে মনে যেন উঠিনু চকিত হয়ে,
চীৎকার করি বলিবারে চাহিলাম—

বলিতে চাহিনু চরম অবিশ্বাসে,
"মর্ত্য-মানব মোরা—
ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই অসহায়,
ধ্বংস-জরার ক্রূর হাত হতে নিস্তার কারো নাই।"
ক্ষণ-বিস্মৃতি—ক্রোধে বেদনায় চাহি অপলক চোখে—
পাগলের মত চাহি বিহ্বল চোখে
দেখিনু মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখখানি—
প্রশান্ত মুখে দুটি অপলক আঁখি,
আয়ত নয়নে দৃষ্টি কেবল নাই।
যে আঁখি একদা সূর্যের মত জ্বলিত দীপ্ত তেজে—
জ্বলিত তীক্ষ্ণ তেজে—
সন্ধানী আলো—চকিতে দেখিত গোপন মর্মতল,
বিশ্বের ব্যথা জমাট বাঁধিয়া কালো সে গভীর চোখে,
দৃষ্টির লেশ নাই।

কি যে হ'ল মনে, বিহ্বল ক্ষণে কল্পনা অদ্ভুত,
মৃতের বধির শ্রবণে চাহিনু শোনাতে আর্তস্বরে—
"চাও আঁখি মেলি, কথা কও কও মর্ত্যের সন্তান,
আমরা মর্ত্যবাসী
ডাকিতেছি সবে, নয়ন মেলিয়া চাও।"
মনে মনে ডাকিলাম—
ঘরের বাতাস ভারী হয়ে এল, কেহ শুনিল না কানে।
মর্ত্যের কবি, চিরজীবী কবি, কখন অকস্মাৎ
মলিন মর্ত্য হইতে বিদায় নিয়েছে অনিচ্ছায়।
সুন্দর এ ভুবন—
ভুবন ছাড়িয়া ভুবনের কবি গিয়াছে পরম ক্ষণে।

* * *

বিমূঢ় স্তব্ধ দেখিলাম চেয়ে নিবেছে দিনের আলো—
মেঘে মেঘে কালো গাঢ় আকাশের নীল।

মানুষের কাঁধে কাঁধে চ'লে গেল মৃত মানবের দেহ,
পাবক-অগ্নি জ্বলে জাহ্নবীতীরে,
জ্বলিছে রাত্রিদিন।

* * *

অন্ধকারেতে সভয় চরণ ফেলিয়া এলাম ঘরে—
আমার রুদ্ধ ঘরে ;
সম্বিৎহারা সম্বিৎ পেনু ফিরে—
প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলিতেছে ঘৃতদীপ ;
চিতার আগুন ঘরের প্রদীপে কখন ছুঁইয়া গেছে—
ছুঁয়েছে পরম স্নেহে।
দ্বিধা-কম্পিত দুই করতল এক হ'ল আশ্বাসে,
বলিতে পারি না কোন্ দেবতারে ঘৃতদীপ-মহিমায়
নিবেদিনু নতি চরম নমস্কারে।